সাধক কমলাকান্ত

(সাধক কমলাকান্তের বিস্তৃত জীবনী)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

শ্রীত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

(সঙ্গীতাবলি জীবনী মধ্যে ও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত)

কলিকাতা,

২ নং নিমুগোস্বামীর লেন হইতে

শঙ্কর প্রেসে

শ্রীঅন্নদাচরণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৪ — বৈশাখ।

মূল্য ১৷০ টাকা।

ভূমিকা।

মহাত্মা সাধক কমলাকান্তের সহিত আমার স্বর্গীয় পিতামহ কেনারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। কথিত আছে সাধক প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার পর তাঁহার বাটীতে আগমন করিতেন। আমার যখন পাঠ্যাবস্থা, বয়স ১৮।১৯ বৎসর, তখন অনেক বৃদ্ধ লোকের মুখে সাধকের সুখ্যাতি শুনিতে পাইতাম। তাঁহারা সাধকের সুমধুর কণ্ঠস্বর, সঙ্গীত দ্বারা লোক বিমোহনের অপূর্ব্ব ক্ষমতা, তপোবলে অলৌকিক কর্ম্ম সকলের সম্পাদন প্রভৃতি সাধকের সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সুখী হইতেন। তদবধি সাধকের জীবনী লিখিবার আমার বাসনা হয়। তাঁহার রচিত সঙ্গীত কিম্বা তৎ সম্বন্ধে যে কোন কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিতে পারিতাম তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতাম। কিন্তু এ সকল বিষয়ে সময়ের সাহায্য অতি মূল্যবান বিবেচনা করিয়া ও বাসনাসিদ্ধির ভার সর্ব্বমঙ্গলার উপর সমর্পণ করিয়া আজ প্রায় ৪০ বৎসর কাল তাঁহার জীবনী ও সঙ্গীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত ছিলাম। পরে সন ১৩২৭ সালে জন্মভূমি নামক মাসিক পত্রিকায় মল্লিখিত সাধকের জীবনী প্রথম প্রকাশিত হয় ও সন ১৩৩১ সালের পৌষ সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। তদবধি নানাবিধ সাংসারিক ঝঞ্ঝাট বশতঃ জীবনীখানি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করাইতে পারি নাই। জন্মভূমি মাসিক পত্রিকায় মল্লিখিত জীবনী প্রকাশের পর, সাধক কমলাকান্ত নামধেয় সাধকের জীবনী দুই একখানি প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ঐ সকল পুস্তক

আমার প্রণীত জীবনী প্রকাশের পরবর্ত্তী। এক্ষণে পুস্তকখানি সাদরে গৃহীত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর সাধকের লিখিত ৪ খানি অতি জীর্ণ পুস্তক হইতে তাঁহার সঙ্গীত সকল সংগ্রহ করাইয়া মুদ্রিত করান। পরে কলিকাতা হইতে সন ১২৯২ সালে আর একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। লোক প্রচলিত সঙ্গীতের সহিত উক্ত উভয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে দুই একটী শব্দের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মহারাজাধিরাজ প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখিত আছে পুস্তক ৪ খানির অতি জীর্ণতা বশতঃ গানের প্রকৃত ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনেক শব্দ পরিবর্ত্তিত ও কতিপয় শব্দ রূপান্তরিত হইল। বোধ হয় এই কারণেই লোক প্রচলিত সঙ্গীতের সহিত দুই একটী শব্দের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকিবে। লোক প্রচলিত সঙ্গীত সকলের শব্দ অধিক সমীচীন ও প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট বোধ হওয়াতে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যাহা হউক উক্ত গ্রন্থ হইতে সঙ্গীত সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর হস্তলিখিত পুস্তক সকলের সংগ্রহ করাইয়া মুদ্রিত না করাইলে সাধকের অনেক সঙ্গীত বোধ হয় অপ্রকাশিত থাকিত। সঙ্গীত সকলের গূঢ় অর্থ যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাধকের ভাবাপন্ন না হইলে সাধকের মনোভাব প্রকাশ করা কঠিন। সুধীগণ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। কিমধিকমিতি—

গ্রন্থকার।

পরিশিষ্টে সঙ্গীতাবলি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে প্রদত্ত, জীবনী মধ্যে সন্নিবেশিত সঙ্গীত সকলের সূচি পত্র।

সূচি পত্র সমাপ্ত।

সাধক কমলাকান্ত।

প্রথম অংশ।

মঙ্গলময় ভুবনেশ্বরের ইচ্ছায় কতই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎ পবিত্র করিয়াছেন। যাঁহাদের বাক্যাবলি, যাঁহাদের উপদেশ শোকের সময়, দুঃখের সময়, বিপদের সময় সন্তপ্ত-হৃদয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করে, মনকে প্রেমরসে পরিপূর্ণ করে, দুঃখের সংসার হইতে কি এক পরমানন্দ-পূর্ণ স্থানে লইয়া যায়,—সেই সকল মহাত্মা কণ্টক পূর্ণ সংসার কাননে প্রস্ফুটিত কুসুম। তাপিত-মন ভ্রমরের ন্যায় তাঁহাদের বাক্যমধু পান করিয়া কণ্টক জ্বালা কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হয়। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এক এক মহাত্মা পৃথিবীর এক এক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সেই প্রদেশকে চির [illegible] জড়ীভূত রাখিয়া অন্তর্হিত হন।

যে পুষ্পে সুগন্ধ নাই, সে পুষ্পই নহে, যে নদীতে স্রোত নাই, সে নদী নহে, যে বাক্যে প্রেম ও ভক্তি নাই, সে বাক্য নহে। সাধক কমলাকান্তের গীতাবলি প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ, সংসার-কাননে

প্রসূন। দুঃখের সময়. সন্তপ্ত-হৃদয়ে অমৃতধারা। বঙ্গের ভদ্র-সমাজে, বৈঠকমন্দিরে, যাঁহার রচিত গীত সমুদয় তাল মান সহকারে চারিদিকে ভক্তি ও প্রেমের ধারা নিক্ষেপ করিয়া নৃত্য করে, দেবদেবীর মন্দিরে উপাসনার স্থান অধিকার করে, মানব মনকে নিস্পন্দ করে, সংসার হইতে দূরে লইয়া যায়, নির্জ্জন প্রদেশে রাখাল-কণ্ঠে সুমধুর স্বরে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করে, পশু-পক্ষীকেও পর্য্যন্ত বিমোহিত করে, কে সে মহাত্মা কমলাকান্ত? বঙ্গের কোন্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎস্থান পবিত্র করেন? তাঁহার শৈশবের, যৌবনের, বার্দ্ধক্যের লীলাস্থান বা কোথায়? তাঁহার সমস্ত জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, ইত্যাদি সকলেরই জানিবার বাসনা হয়।

বঙ্গদেশে পুরাতন কবিদের এবং অনেক খ্যাতনামা মহাত্মার আদি পূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া যায় না। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, ইতিহাস লেখার পদ্ধতিও ছিল না। স্বভাবদত্ত ক্ষমতা দ্বারা ভক্তি ও প্রেম-পরিপূর্ণ কবিতা ও সঙ্গীতাবলি রচনা করিতেন। কল্পনার চাতুর্য্যে, রচনার মাধুর্য্যে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে তাঁহাদের বাক্যাবলি অমৃত তুল্য হইত, সাধারণ সাদরে গ্রহণ করিত, কণ্ঠস্থ করিত, বর্ত্তমানকালের যাত্রার ন্যায় সেই সকল কাব্য ও সঙ্গীতমালা স্থানে স্থানে অভিনীত, পঠিত, আলোচিত হইত, কবি ও গ্রন্থকার অমর হইতেন। কোন কোন স্থলে বিষয়ীগণ কবিরত্নদিগকে আশ্রয় দিয়া জগতের বিশেষ উপকার করিতেন। কবিকুলের সহিত তাঁহাদের নামও চিরস্মরণীয় হইত। তাঁহাদের কল্পনা ও

রচনা লোক-শিক্ষার জন্য। বর্ত্তমানের ন্যায় পরিণীতা রমণী ও বিগতযৌবন পুরুষের প্রথম দর্শনেই উৎকট প্রেমের প্রকটন তাঁহাদের গ্রন্থে স্থান পাইত না। দস্যু ও সমাজদ্রোহীগণের ভীষণ কর্ম্ম, কুলটাগণের কুটিলতা, নিশাচরদিগের কল্পনাতীত চতুরতা জগতে বিরল না হইলেও তাঁহাদের গ্রন্থে উপাদান হইতে পারিত না। লোকশিক্ষা, প্রেম ও ধর্ম্মের জয়, দুঃখের সময় সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি প্রদান তাঁহাদের গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল, স্বার্থের দিকে, নিজের যশের দিকে দৃষ্টি ছিল না, মনের আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে কর্ম্মক্ষেত্রে নৃত্য করিতেন, তাই তাঁহারা নিজের ইতিহাস নিজ হস্তে লিখিয়া যান নাই। যশের সৌরভ ও কীর্ত্তির স্তম্ভ কর্ম্মভূমিতে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে তাঁহাদের সমকালীন বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাদের ইতিহাস হইতেন, তাঁহাদের কৃত কর্ম্ম, তাঁহাদের অদ্ভুত-শক্তি লোকের নিকট কীর্ত্তন করিতেন। সেই সকল ঘটনাবলি লোকপরম্পরা শ্রুত হইয়া আজ তাঁহাদের ইতিহাসরূপে বর্ত্তমান। অনেকে বিবেচনা করেন, জনশ্রুতি সকল অতিরঞ্জিত, কিন্তু রঞ্জিত হইলেও [illegible] কিন্তু সত্যের উপর সংস্থাপিত, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে [illegible]। ইহাও স্বীকার্য্য, যাহার মূলে সত্য নাই, তাহা কখনও স্থা[illegible]। মিথ্যা সত্যের স্থান অধিকার করিতে পারে কিন্তু তাহা [illegible]র জন্য। এ জগতে সত্য ও মিথ্যা উভয়েই কর্ম্মক্ষেত্রে [illegible]বে। মিথ্যার অবস্থান সত্যের সারবত্তা প্রতিপন্ন ক[illegible] অসত্য স্থায়ী হয় না, মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় সত্যই সক[illegible]কর্ষণ করে, অতএব লোক-পরম্পরা শ্রুত

বিষয় কখনই একবারে অসত্য হয় না, বিশেষতঃ জনশ্রুতি ঘটনা বিশেষকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। বীরপুরুষদিগের অমানুষিক বীরত্ব, মহাত্মাদির অলৌকিক কর্ম্ম, সাধ্বী রমনীগণের অকল্পিতভাবে সতীধর্ম্ম রক্ষা লিখিত ইতিহাসের অভাবে জনশ্রুতিকে আশ্রয় করে ও কালক্রমে রঞ্জিত হইলেও কখনও অবিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অমানুষিক ও অসাধারণে অবিশ্বাস করা মানবের ভ্রম, কারণ আমাদিগের নিকট যাহা অসাধারণ ও বুদ্ধির অতীত, মহাত্মাদিগের নিকট তাহা অতি অনায়াসসাধ্য ও তাঁহাদের অনুকম্পার বশবর্ত্তী। এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে কতই আশ্চর্য্য, কতই অমানুষিক নয়নগোচর হয়, সমস্তই আমাদের বাক-মন-ও বুদ্ধির অতীত; বিশ্বরাজ্যে মানবই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মানবের জন্ম, মানবের ক্রিয়া, মানবের চিন্তা চেষ্টা, মানবের মৃত্যু, মানবের বুদ্ধি ও ধারণার অতীত; মহাশক্তি-সমন্বিত এক মহাপুরুষের কর্ম্ম। সেই মহাশক্তি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুসারে কিম্বা অচিন্ত্যনীয় কোন কারণে কাহাতে অল্প, কাহাতে বা অধিক পরিমাণে সন্নিবিষ্ট হয়, তাই এক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া ও একই প্রকৃতিতে পরিপুষ্ট হইয়া কেহ কেহ অদ্ভুতকর্ম্মা ও অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন হন। সমকালবর্ত্তী সাধারণে তাঁহাদের অসাধারণ কর্ম্মে অবিশ্বাস করে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না, পরবর্ত্তী লোকেরাও অনেক সময় নিজের ক্ষমতার বাহিরে যাইতে ইচ্ছা না করিয়া ভ্রমে পতিত হন ও অসাধারণে অবিশ্বাস করেন। তাই মহাকবি তুলসিদাস বলিয়াছেন, "অন্তর অঙ্গুল চারগে, আঁখ্‌সে কাণ হই, সব মানে দেখি কহি, শুনি

না মানে কই। চক্ষু ও কর্ণে, চার আঙ্গুলমাত্র ব্যবধান। লোকে শুনিয়া বিশ্বাস করে না, দেখিলেই বিশ্বাস করে, কিন্তু জানে না, উভয়ের ব্যবধান চার অঙ্গুলিমাত্র। তাই বলিতেছিলাম, জনশ্রুতি ইতিহাস সত্যমূলক, যতই অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ হক, অবশ্য সত্যের উপর সংস্থাপিত। মহাত্মা কমলাকান্তের জীবনের অনেক ঘটনা, বহু অমানুষিক কর্ম্ম জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া জীবিত আছে, সেই সকল জনশ্রুতি বর্দ্ধমান ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিশেষরূপে প্রচলিত। এ সকল জনশ্রুতিই তাঁহার ইতিহাসের উপাদান হইবে। তাহার জীবিত অবস্থায় সাধারণ সম্পর্কীয় কোন কোন ব্যাপার ।।পিবদ্ধও আছে, তাহা হইতেও তৎকালিক আচার ব্যবহার, সুখ সম্পত্তি ও সমাজের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার লীলা-ক্ষেত্রের ও অনুরাগীগণের চিত্রও অনুমিত হয়।

কমলাকান্তের জন্মস্থান অম্বিকা কালনা, বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সুবর্ণরেখাপীর তীরবর্ত্তী। এক সময় অম্বিকাকালনা বহু জনাকীর্ণ জনপদ ছিল। অভাব ও ব্যাধির অধিকার ছিল না, সুখ-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ থাকিত। হায় হায়! কালের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! মনোহর তরুলতাগণ মানবের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া গভীর জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে, অম্বিকার কিয়দংশ জঙ্গলে পরিণত, কিয়দংশ কালনার অন্তর্গত হইয়াছে। অম্বিকা কালনার গ্রাম সমূহের অবস্থাও শোচনীয়, কিন্তু তাহাদের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। কোন কোন গ্রামে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করিলে অনুমিত হয়, এক

সময় ঐ সকল গ্রাম বঙ্গের অলঙ্কার ছিল। পথ সকল প্রশস্ত কিন্তু স্থানে স্থানে এরূপ বনাকীর্ণ যে সূর্য্যরশ্মিও তাহাতে প্রবেশ করে না। সুন্দর দেব দেবীর মন্দির এখনও আকাশের কোলে মস্তক উন্নত করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, কিন্তু তাহার সে লাবণ্য নাই। সুধাসম শ্বেত কলেবরে শৈবালরাশির কালিমা তাহাকে শ্রীহীন করিয়াছে। অঙ্গ সংস্কার নাই, যত্ন নাই, অকালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন স্থান বিদীর্ণ, কোন স্থান ভগ্ন,। একদিন মন্দির মধ্যে সুস্থকায় সুন্দর সহাস্যবদন ব্রাহ্মণের মন্ত্রধ্বনি শ্রুত হইত, সকল সময়েই জনাকীর্ণ থাকিত, নানাবিধ পুষ্প-সৌরভে মন্দির মধ্য আমোদিত হইত। হায় হায়! আজ তাহা নিশাচর পশু পক্ষীর আবাস-ভূমি বীভৎস শব্দে ও গন্ধে পরিপূর্ণ। গ্রামে দ্বিতল অট্টালিকার অভাব নাই, কিন্তু পরিত্যক্ত, ভগ্ন, শ্রীহীন ধ্বংসকারী কালের কর্ম্মক্ষেত্র। অট্টালিকার [illegible] বৃহৎ বাপীর পূর্ব্ব সৌভাগ্যের পরিচয় দিতেছে। বহির্ভাগ বিস্তৃত। সম্মুখে কাষ্ঠগ্রথিত লৌহাবরণ, অন্তদিকে অট্টালিকার দ্বিতল প্রকোষ্ঠ সকল। বহির্ভাগে একদিন ভাগ্যবান সুস্থকায় পুরুষ সকল দলে গ্রীষ্মের সময় সমীর সেবন করিতেন। প্রকোষ্ঠ সকল হাস্য গীত মনোহর গন্ধে মুখরিত হইত, আজ তাহা নির্জ্জন। দূর হইতে দেখা যাইতেছে, প্রকোষ্ঠ মধ্যে শোভিত কাষ্ঠফলকে চিত্র সমূহ স্থানচ্যুত, যেন, তাহারা মানুষের সহবাস সুখে বঞ্চিত হইয়া বিবর্ণ, ছিন্ন ও নতশির হইয়াছে। প্রকোষ্ঠ সকলের কোনটীর রুদ্ধ দ্বার, কোনটীর বা দ্বার অর্দ্ধরুদ্ধ; কোনটীর বা একবারে দ্বারের আবরণ নাই।

মানুষের পদশব্দ ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া বন্য বিড়াল স্থিরনেত্রে পথের দিকে দৃষ্টি করিয়া এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে গমন করিতেছে। অন্দর মহলের অবস্থাও সেইরূপ। একাকী প্রবেশের সাহস হয় না। অট্টালিকার পশ্চাৎভাগে পুষ্করিণী, তাহার তিন-ধারে প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান। দেখিলেই বোধ হয়, পুষ্করিণী ও উদ্যান বড় আদরের ও বড় সাধের ছিল। আম্রবৃক্ষ সকল পূর্ব্ব যত্নে বঞ্চিত হইলেও উদ্যানস্বামীর সম্মান রক্ষার জন্যই যেন প্রফুল্ল-বদন, ফলভরে অবনত, পাদদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবিধ কণ্টক বৃক্ষকে আশ্রয় দিয়া নিজ উদারতার পরিচয় দিতেছে। স্থানে স্থানে কুসুম কানন, কাননটী শ্বেত-প্রস্তর-বেষ্টিত। কুসুম কানন লতাজাল-জড়িত, প্রস্তর সকল বিক্ষিপ্ত ও স্থানভ্রষ্ট। পুষ্করিণীর চারিধারে চারিটী প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘাট। শৈবাল মণ্ডিত, অনেক দিন কোন নরনারীর পদস্পর্শ হয় নাই। পুষ্করিণীর জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, কিন্তু প্রায় অর্দ্ধ অঙ্গ জলদামে আবৃত, বৃহৎ আম্রবৃক্ষ সকল প্রকাণ্ড শাখা বিস্তার করিয়া কোন কোন স্থানে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলের ভিতর সূর্য্যরশ্মিতে প্রতিভাত হইতেছে।

গ্রামের মাঝে দুই এক ঘর লোকের বাস। তাহাদের প্রায় সকলেরই অবস্থা শোচনীয়—সংক্রামক জ্বর রোগ-গ্রস্ত, পিঙ্গল চক্ষু, শীর্ণ কায়। মৃত্তিকানির্ম্মিত ভগ্ন ও পতিত গৃহও বিস্তর। অনুমান হয়, ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে এখানে অনেক লোকের বাস ছিল। ৩।৪টী দোকান ঘর একত্র দেখা যায়। দোকান ঘরগুলি ভগ্ন। একদিন তথায় অনেক লোকের সমাগম হইত, ক্রয় বিক্রয় হইত।

কত আহ্লাদ ও হাস্য পরিহাস হইত, আজ তাহারা সেই সব সম্পদে বঞ্চিত হইয়া মনস্তাপে যেন মাথা নামাইয়া বিকৃতভাবে ভূমিস্যাৎ হইতেছে। এখন লবণ কলাই প্রভৃতি রাখিবার স্থান সকল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় নাই। দুই একটী শালের খুঁটী বর্ত্তমান আছে। পণ্যদ্রব্য স্থাপনেব মৃত্তিকা-নির্ম্মিত উচ্চ বেদী বিদ্যমান রহিয়াছে। এক পার্শ্বে দোকান ও অন্য পার্শ্বে কাষ্ঠেব তক্তাপোষ থাকিত, তাহাব চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। আহারান্তে বিশ্রামেব পর সেই স্থানে স্থাপিত তক্তাপোষে বসিয়া মুদী পুণ্যশ্লোক কবিকুলচূডামণি কাশিরাম দাসের মহাভাবত পাঠ কবিত। মহাভাবতেব কথা অমৃত সমান" বলিতে বলিতে সম্মুখে শিকলী বাঁধা পক্ষিটীকে ছোলা দিয়া আসিত, পাখিটী নূন দাও, কলাই দাও, বলিয়া নাচিতে নাচিতে দাঁড়েব এধাব হইতে ওধাব কবিয়া বেডাইত, মাঝে মাঝে কঠোব শব্দ কবিযা ছোলা কাটিয়া ফেলিত। দুই একজন শ্রোতাও ধূমপান কবিতে কবিতে মুদীর মুখ-নিঃসৃত সুবনত উচ্চাবিত পায়াব মনোযোগেব সহিত শুনিত। মুদী "মহাভাবতের কথা অমৃত সমান" বলিয়া থামিলে শ্রোতা হয ত জিজ্ঞাসা কবিত, হ্যাঁ ভাই, "তের" কথাটা কি? মুদীও যথাজ্ঞান উত্তর দিত, বলিত, 'তেব' কথা কি জান, মহাভারত "তের" কথা লইয়া। যুধিষ্ঠির নকুল আদি পাঁচ সহোদব, দুর্য্যোধন আদি সপ্তরথী, আব দ্রৌপদী এই তেবটী লইয়া মহাভারত। শ্রোতা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া তাহাই যথার্থ বলিযা বিশ্বাস করিত হায় হায়, ধ্বংসমুখে অবস্থিত সেই সকল গ্রাম এক সময় কি সুখের

স্থান ছিল। অভাব ছিল না, সংক্রামক ব্যাধি ছিল না, অকাল-মৃত্যু এরূপ ভীষণ বেশে ঘরে ঘরে নৃত্য করিয়া বেড়াইত না। এক সময় ঐ সকল প্রদেশ বঙ্গের কণ্ঠহার স্বরূপ ছিল ও মহাত্মা কমলাকান্ত কণ্ঠহারের মণি স্বরূপ হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন।

মহাত্মা কমলাকান্ত প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ-জননীর অঙ্কে শোভিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মকাল নিরূপণ করা তাদৃশ কষ্টসাধ্য নহে। বর্দ্ধমানাধিপতি বিদ্যোৎসাহী মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর মহাত্মা কমলাকান্ত বিরচিত কতগুলি গীত সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করান। সেই পুস্তকের উপক্রমণিকায় দেখা যায়, বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর বঙ্গীয় ১২১৬ সালে মহাত্মা কমলাকান্তকে অম্বিকা হইতে বর্দ্ধমানে লইয়া আইসেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশের অধিক, অতএব সাধক প্রায় ১১৭০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন। জাল প্রতাপচাঁদ নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ১২২১ সালে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের পুত্র যুবরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরকে কালনায় গঙ্গাযাত্রা করা [illegible] কথিত আছে, মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের পুত্র বিয়োগের [illegible] সাধক জীবিত ছিলেন না, তাহার পূর্ব্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাও কথিত আছে, প্রায় ৫৫।৫৬ বৎসর বয়সে তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন। ইহা দ্বারা ঐ জন্ম সাল প্রতিপন্ন হয়। আজ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহারা কমলাকান্তকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ-

নিঃসৃত প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ ভুবন-বিমুগ্ধকারী সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন। তখন বৃদ্ধের বয়স প্রায় ১২।১৩ বৎসর। তিনি বলিতেন, তাঁহারা গান বুঝিতেন না, কিন্তু কি এক বিমুগ্ধভাবে তিনি ও তাঁহার সমবয়স্ক বালকগণ গান শুনিতেন। তাঁহার অনুমানে তখন সাধকের বয়স প্রায় চল্লিশের অধিক হইবে। লিখিত ঘটনা ও এই সকল জনশ্রুতি সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলে অনুমান হয়, প্রায় ১১৭০ সালে মহাকবি সাধক কমলাকান্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা চিরকালই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। বর্ত্তমান অবস্থায় স্থান বিশেষে উহা স্মৃতিমাত্র হইতে পারে, কিন্তু ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্ব যথার্থই বঙ্গজননী স্বচ্ছ সরিৎ সরোবর-শোভিতা ফলপুষ্প ভারাবনতা, পাদপ-রঞ্জিতা বিবিধ শস্যপূর্ণা ও শ্যামলাঙ্গী ছিলেন। তাঁহার শিরোদেশে ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি, বদনে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতার হাস্য, হৃদয়ে বল ও বাহুতে শক্তি বিদ্যমান ছিল। অভাব ও ব্যাধি-পিশাচের অভাবে সকল সংসারই বড় সুখের ছিল, আনন্দ ঘরে ঘরে বিরাজ করিত। বারমাসে তের পার্ব্বণ। প্রতি পার্ব্বণ মহোল্লাস ও সমারোহে অতিবাহিত হইত, প্রায় সকলেই গৃহবাসী ছিলেন। প্রবাসী কম ছিলেন। প্রবাসের সঙ্গে বিলাস আসিয়া পড়ে, বিলাসের সহচর অভাব ও দুঃখ। আজকাল বিলাস-প্রসূত যে সকল দুঃখ বঙ্গ সংসারকে দুঃখের আগার করিয়াছে, তখন তাহা ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বিলাস-বিহীন। জামাতা, বৈবাহিক, আত্মীয়-স্বজন ও কুটুম্ব লইয়া আমোদ আহ্লাদ, অতিথি-সৎকার ও সকল প্রকার ব্রতের আচরণে

পরম সুখভোগ করিতেন। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবালয় প্রতিষ্ঠাকে সংসারী জীবনের অতিকর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিতেন। পরিধান বস্ত্র, উত্তরীয় ও স্থলবিশেষে পাদুকামাত্র পুরুষগণ ব্যবহার করিতেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী রমণীগণের সাধারণ অলঙ্কার শঙ্খ দুই একখণ্ড রৌপ্য ও কদাচিৎ স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার দৃষ্ট হইত। সহাস্যবদনা ললনাগণ বিলাসের দিকে দৃষ্টি না করিয়া পতিসেবা, গুরুসেবা, সন্তান-প্রতিপালন, অভ্যাগত আত্মীয় ও কুটুম্বগণের সম্মান প্রদর্শন করিয়া সুখী হইতেন। এখন সে ভাব নাই। অতিথি-অভ্যাগতের কথা দূরে থাকুক, দূরস্থিত আত্মী-স্বজনের অবস্থান দুই একদিন বেশী হইলে, সংসারের তাদৃশ অভাব না থাকিলেও, পুরুষগণ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। মা লক্ষ্মীদিগেরও সেই ভাব। আজ কাল তাঁহাদের আর সেবা শুশ্রূষা বড় পোষায় না। অঙ্গ অলঙ্কার, ভোজন-পানের ব্যবস্থা ও শয্যাদির সংস্কার করিতেই সময়টুকু কাটিয়া যায়, অন্য পরিশ্রম বড় সহ্য হয় না। কোন কোন বিশেষ স্থলে এ ভাবের ব্যাতক্রম ও পূর্ব্ব ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংখ্যায় অতি অল্প। তখন প্রতিবেশীগণের মধ্যে হিংসা ও কলহের স্রোত এত প্রবল ছিল না। কথায় কথায় রাজদ্বারে বিচারালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত না। দেহ ধারণ করিলে ব্যাধির যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। সমাজভুক্ত থাকিলে কলহকে একেবারে সমাজচ্যুত করা কঠিন। তখন পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উত্থাপিত হইলে গ্রামস্থ জ্ঞান-বৃদ্ধগণই তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন, কদাচিৎ রাজদ্বারে আশ্রয় লইতে

হইত। গ্রাম, পল্লী ও নগরবাসিগণের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও আত্মীয়তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তখন জামাই, বেহাই, কি কুটুম্ব আসিলে আত্মপর বিবেচনা না করিয়া সকলেই সুখী হইতেন, পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। অভ্যাগতদিগকে সহজে ত্যাগ করিতেন না। রমণীগণও পরম আহ্লাদের সহিত চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য, পেয় প্রস্তুত করিয়া, উত্তম হইয়াছে বলিলেই, স্বর্গসুখ ভোগ করিতেন। আহারের পর বহির্গৃহে বিশ্রামের পর অনেকে সমাগত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুকে, হাস্য রসে সময় অতিবাহিত করিতেন। "ছ তিন নয়, কচে বার, এই বড়ের কিস্তিমাৎ" ইত্যাদি শব্দে বৈঠক-গৃহ, এমন কি পল্লী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইত। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত-চর্চ্চায় পরমানন্দ ভোগ করিতেন। ভদ্রলোকের পক্ষে মল্লবিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যার পরিচর্য্যা না করা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত। সাধারণের মধ্যে মল্লবিদ্যার অনুশীলন বিশেষরূপে চলিত, ভদ্রলোক মাত্রেই তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তখন সাধারণ মধ্যবিত্ত ও ধনাঢ্যদিগের সুখে সময় অতিবাহিত হইত। রাজ্যও নিরুপদ্রব। বঙ্গকাননে ব্রিটিস সিংহ পদার্পণ করিয়া শাসন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছেন। ভারতের অন্যান্য স্থলে যুদ্ধ হাঙ্গামা থাকিলেও বঙ্গে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস সমাজের নানাবিধ উপকারে মনোযোগী। একদিকে রাজস্বের দশশালা বন্দোবস্ত, অন্যদিকে ব্যবহারিক উপকারের স্রোত চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সুখকর সময়ে সাধক কমলাকান্তের আবির্ভাব হইয়াছিল।

সাধক কমলাকান্ত

মহাত্মা কমলাকান্ত অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এমন কি, কথিত আছে, তিনি উপনয়নের পর হইতে বিলাস ত্যাগ করেন। তাঁহার মাতার অনুরোধে কিছুদিন সংসার বাস করিলেও সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার এত অল্পবয়সে বৈরাগ্য অবলম্বনের কারণ আছে ও তদ্বিষয়ে জনশ্রুতিও আছে। মহাত্মার উপবীত ধারণের পর একদিন তাঁহার মাতা কোন কার্য্যের জন্য নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে পাঠান। একটী মাঠ ও ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া সেই গ্রামে যাইতে হয়। চৈত্রমাস, বসন্তদেব সৌরভে গৌরবে বন, উপবন পথ, ঘাট সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। অশ্বথ, বট প্রভৃতি বনস্পতিগণ নব কলেবর ধারণ করিয়াছেন। সুবর্ণময় কিসলয়গণ মৃদু পবনভরে নৃত্য করিয়া বসন্তবাসরে প্রকৃতির নাট্যমন্দিরে মহা-সমারোহ আরম্ভ করিয়াছে। একদিকে কিংশুক লোহিত বর্ণের ছবির অভিনয় করিতেছে; অন্যদিকে কোকিলগণের কুহু কুহু ধ্বনি। মলয়ানিল কুসুমরাশির সৌগন্ধে মণ্ডিত হইয়া মৃদুভাবে চলিতেছে। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, সূর্য্যদেব কিঞ্চিৎ প্রখর হইলেও অসহ্য নহেন। মুণ্ডিত মস্তক বালক কমলাকান্ত মাঠের পথে চলিতেছেন। হাস্যময় গণ্ডযুগ। বিদ্ধকর্ণ, হরিদ্রারঞ্জিত যজ্ঞসূত্র। পরিধান লোহিত বস্ত্র, তরুরাজির দিকে দৃষ্টি করিয়া চলিতেছেন। যাহারা তাঁহার মুখনিঃসৃত ভক্তিপূর্ণ পদাবলি শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর ছিল। প্রকৃতি-দত্ত না হইলে কোন শক্তিই সারবান হইয়া যৌবনে ও প্রৌঢ়ে সুফল প্রদান করিতে পারে না। চেষ্টা

ও মার্জ্জনাদ্বারা মানবের শক্তি সকল পরিপুষ্ট হইলেও অক্ষুণ্ণ সাফল্য লাভে কৃতকার্য্য হয় না। যাহা প্রকৃতিদত্ত, তাহা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। উপার্জ্জিত বিদ্যা, উপার্জ্জিত জ্ঞান, মার্জ্জিত আত্মায় নিহিত শক্তি ও ভক্তি বর্ষাকালের জলদ জালের ন্যায় সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। শৈশবকালেই তাহাদিগের আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাত্মা কমলাকান্ত প্রকৃতির সেই অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকভরে এই গান করিতে করিতে চলিতেছেন ;—

কে জানে মন কালী কেমন !
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন !
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন,
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।

এই গান মহাত্মা রামপ্রসাদের, তখন সাধক-শিরোমণি প্রকৃতির প্রিয়পুত্র রামপ্রসাদের গান দেশব্যাপ্ত হইয়াছিল, আবাল বৃদ্ধ বণিতার মুখে শোনা যাইত। ভাষার সারল্যে, ভাবের উচ্ছ্বাস ও ঔদার্য্যে, মানব-প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যে, মহাত্মা রামপ্রসাদের গীতাবলী চিরকালই বাঙ্গালার অমূল্য রত্ন বলিয়া গৃহীত হইবে। মহাত্মা কমলাকান্তের বয়স অল্প হইলেও তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, গীতের মর্ম্ম হৃদয়গত করিতে পারিয়াছিলেন। পাতায় পাতায়, পুষ্পে পুষ্পে, ফলে ফলে, প্রতি বর্ণে বর্ণে, প্রতি কোকিলকুজনে

প্রকৃতিময়ী বিশ্ববিমোহিনী মহামায়াব অবস্থান অবলোকন করিতেছিলেন। মহাত্মার স্মিত গণ্ডযুগে, চারুদন্তে, উজ্জ্বল নয়নে হাসির লহরী ছুটিতেছিল। কোকিল কূজনের সহিত যোগ দিয়া সেই গীত গাহিতে গাহিতে চলিলেন। দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া, অমিয় স্রোত ছড়াইয়া কেদার-বাহিনী একটী ক্ষুদ্র নদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। পারঘাটে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ, সম্মুখে নদী, রজতবর্ণ জলস্রোত স্বচ্ছ সুবর্ণবর্ণ বালুকার উপর সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। পার্শ্বে শ্মশান, অঙ্গার রাশি, অর্দ্ধদগ্ধ বংশখণ্ড ও কলসী সকল বিকৃতভাবে পতিত। শব-শয়নের ভূমি সকল চিহ্নিত, মায়া মোহ, আশা ভরসা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, ভক্তি, স্নেহ প্রভৃতির নিশ্চেষ্টভাবে চির শয়নের স্থান—ঘোর কলরবপূর্ণ বিকট ব্যাপার ব্যাপৃত লোক-সমাজের একমাত্র নীরব নিশ্চেষ্ট শান্তির শয্যা। বালক কখনও অশ্বথ বৃক্ষের দিকে, কখনও বা নদীর জলস্রোতের উপর, কখন শ্মশানের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, সুখস্পর্শ শীতল সমীরসেবিত নব কিসলয়ের নৃত্যে সৈকত সংলগ্ন নির্ম্মল সলিলরাশির গমন বৈচিত্র্যে, শান্তিময় শ্মশানের মাধুর্য্যে স্থিরচিত্ত হইলেন। প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ; নদীর ধার, শ্মশান; সাধারণ বালকের সহজেই ভূতের ভয় আসিত, কিন্তু সাধক বালকের হৃদয় অন্য উপাদানে গঠিত। যৌবনে, প্রৌঢ়ে যে শ্মশান তাঁহার সাধনার স্থল হইবে, সেই শ্মশান দর্শনে তাঁহার প্রীতির সঞ্চার হইল, তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া শ্মশানের দিকে দৃষ্টি করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, শ্মশান হইতে একজন লোক আসিতেছেন। তাঁহার পরিধান বল্কল, হস্তে ত্রিশূল, সর্ব্ব শরীর ভস্মে আবৃত, গলে হাড়মালা, কপালে রক্তবর্ণ ত্রিপুণ্ড্রক, শিরে জটাজুট। নির্জ্জন শ্মশান মধ্যে এরূপ বিকৃত বেশধারী পুরুষের দর্শনে সামান্য বালক হয়ত মূর্চ্ছিত হইত কিম্বা চীৎকার করিয়া পলায়ন করিত, কিন্তু কমলাকান্ত কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। যোগীপুরুষ ত্রিশূল হস্তে হাসিতে হাসিতে বালকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এখানে কি বচ্ছ? আমাকে দেখিয়া তোমার ভয় হয় নাই? বালক বলিলেন, আমি এই নদী পারে গ্রামে যাব, আপনাকে দেখে ভয় হবে কেন, আপনি কে? যোগী পুরুষ সন্তুষ্ট হইয়া বালকের হাস্যময় গণ্ডযুগ, দুই হস্ত ও মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক বলিলেন, আমি তোমার পিতা। বালক উত্তর করিলেন, আমার পিতা নাই। শুনেছি, আমি যখন পাঁচ বৎসরের, তখন তাঁহার মৃত্যু হয়েছে। সন্ন্যাসী বলিলেন, যিনি জন্ম দেন, তিনি ছাড়া এ সংসারে আরও অনেক পিতা আছেন, পরে জানতে পারবে। যোগী তাঁহার মুখ ও কপালের দিকে দৃষ্টি করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, বালক খণ্ডযোগী, জন্মান্তরের সুকৃতি প্রচুর, তাই নির্ভীক; ইহ জন্মে তপঃসিদ্ধ হইবেন; সংসারের অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন। ইনিই আমার তপঃসিদ্ধ মন্ত্রগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। বিদ্যা ও সিদ্ধমন্ত্র অর্পণ ভিন্ন কার্য্যকর হয় না। আমার বহুকষ্ট প্রসূত মন্ত্র এই বালককে প্রদান করিব। এই ভাবিয়া

তিনি বালককে কহিলেন, আমি তোমাকে কোন জিনিস দিতে ইচ্ছা করি। বালক কহিলেন, কি, হাড়ের মালাটী না ত্রিশূলটী, যোগী বলিলেন, মালা তুমি পর্ব্বে? বালক বলিলেন, কৈ, দেখি কি দেবেন, ঔষধ পত্র নয় ত, তাহ'লে আমি নেব না। মা বারণ করেছেন, কারো কাছে কোন জিনিস খেতে নাই। সন্ন্যাসী বলিলেন, আমি তোমাকে ও সব কিছুই দিব না, মন্ত্র দিব। বালক বলিলেন, আবার মন্ত্র, পৈতার দিন থেকে কাকা তিন বেলা সন্ধ্যাগায়ত্রী পড়াচ্ছেন। গোটাকত পুঁথির পাতাও দিয়েছেন, তবু আজ পর্য্যন্ত মুখস্থ হয় নাই। মন্ত্র বড় কট মট। আর মন্ত্রে কাজ নাই। ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "আমার মন্ত্র সেরূপ নয়, একটী কথা। বড় হলে দেখ্‌বে সন্ধ্যা গায়ত্রী সব ছেড়ে দিয়ে আমার দত্ত মন্ত্রই যপ কর্ব্বে।" বালক বলিলেন, "মন্ত্রটা কি বলুন দেখি, আমি খুব মুখস্থ কর্ত্তে পারি, তবে সন্ধ্যাটা বড় শক্ত বোধ হচ্ছে, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।" সন্ন্যাসী বালকের কানের নিকট মুখ রাখিয়া বলিলেন, "আমার মন্ত্র এই একটী কথা।" বালক বলিলেন, "এই মন্ত্র! এ খুব মনে থাকুবে।" যোগী বলিলেন, "মাঝে মাঝে যপ কর্ব্বে, পরে সর্ব্বদা যপ কল্লে দেখ্‌বে কি অমূল্য রত্ন লাভ কল্লে।" বালক সন্ন্যাসীর পদস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আপনার মন্ত্র যপ কর্ব্বো, এখন কোথায় যাচ্ছেন, চলুন আমাদের বাড়ী, মা আমার অতিথি ফকিরকে বড় ভালবাসেন, নিজে না খেয়ে খেতে দেন।" সন্ন্যাসী মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার মা তোমাকে আজ যে কাজে

পাঠায়েছেন সেই কাজ করে বাড়ী যাও। তোমার সঙ্গে আমি সময়ে দেখা কর্ব্বো” এই বলিয়া সন্ন্যাসী গ্রামের দিকে চলিলেন, বালক কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে নদী পার হইলেন ও নির্দ্দিষ্ট গ্রামে চলিলেন।

বালক মাতৃ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাগত হইতেছেন। আবার সেই নদীর ধার, জল অল্প। তিনি নদী পার হইয়া সেই অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন, ও শ্মশানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীর কথা মনে হইল, তাঁহার দত্ত মন্ত্রও মনে পড়িল, ভাবিলেন, যেরূপ ভাবে গায়ত্রী যপ করিতে হয় সেরূপ ভাবে যপ করিয়া দেখি। শ্মশানের দিকে দৃষ্টি করিয়া হরিদ্রারঞ্জিত পূত উপবীত করে ধারণ করিলেন। সিদ্ধ সন্ন্যাসী প্রদত্ত সিদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্র সরস ও উত্তম রূপে কর্ষিত হইলে সারগর্ভ বীজ অঙ্কুর উৎপাদন করে, অতি সুখময় ও সরস ফল উৎপাদন করে। বালকের হৃদয়ক্ষেত্র সরস। কলুষ, কপটতা মিথ্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি সংসারের আবর্জ্জনা বালকের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, মন্ত্র-সিদ্ধ-পুরুষ দত্ত, তেজস্কর। যপ ব্যর্থ হইবার নহে। বালক যপ করিতে করিতে কি এক আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্মশানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এক হাস্যময়ী প্রসন্ন মূর্ত্তি। বর্ণ নবজলধর সদৃশ, শিরে মুকুট, কেশকলাপ কাদম্বিনীর ন্যায় কটিদেশ পর্য্যন্ত বিন্যস্ত, গলে মুণ্ডমালা। বালক একদৃষ্টে নিরীক্ষণ ও যপ করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন শ্মশানে

কালী, বোধ হয় সেই যোগী পুরুষের। যোগী পুরুষ ঐ শ্মশানেই আছেন, নিশ্চয় দেখা পাইব, এই ভাবিয়া শ্মশানের দিকে চলিলেন। ধীর প্রবাহিনীর সলিলরাশির উপর দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র দেখিলেন, সেই ভুবনমোহিনী জলপ্রবাহের সহ নৃত্য করিয়া চলিতেছেন। বালক দাঁড়াইলেন, প্রাণ ভরিয়া আনন্দময়ীর নৃত্য দেখিয়া পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। অশ্বত্থ বৃক্ষের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সেই হাস্যময়ী মূর্ত্তি ধীরমলয় পবনসহ পল্লবে পল্লবে নৃত্য করিতেছেন, ভাবিলেন, সন্ন্যাসী শ্মশানে নাই, তাঁহার দত্ত মন্ত্র সর্ব্ব দুঃখহরা ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দৃষ্টি করাইতেছে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়-সরোজে শব-শিবমোহিনী স্মেরাননী শ্যামা। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে তাঁহার হৃদয় প্রেমরাগ পরিপূর্ণ ছিল, প্রেমের উচ্ছ্বাস বয়সের বশবর্ত্তী নহে, নবীনে প্রবীণে সকল সময়েই প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে পারে। নবীনের প্রেমের প্রবীণত্ব বড় মনোহর, দর্শনীয়, সুফল দায়ক, বহু পুণ্যের ফল। প্রেমবারি তাঁহার নবীন তরল-নয়নে সঞ্চারিত হইল, প্রভাত-বিকশিত সরোজদল-পতিত-বারিবিন্দুর ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিল। ভাবিলেন, মন্ত্র যথার্থ অমূল্য রত্ন, আহা! এই স্থানে বসিয়া এই মন্ত্র যপ ও অপার আনন্দ অনুভব করি। বালক নদীপ্রান্তে দাঁড়াইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার জনৈক প্রতিবাসী নদী পার হইয়া আসিতেছেন, কমলাকান্তকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমলাকান্ত তুমি এ সময় এখানে কি কচ্ছ, দেখ ছেলা, বেলা

নাই, একলা বাড়ী যেতে পার্ব্বে না, এস আমার সঙ্গে এস, এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছিলে? কমলাকান্ত কহিলেন, "মা ঐ গ্রামে কোন কাজের জন্য পাঠায়েছিলেন, নদীধারে দাঁড়ায়ে কত কি দেখ্‌ছিলাম। চলুন বাড়ী যাই। "এই বলিয়া কমলাকান্ত সন্ন্যাসীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীতে প্রত্যাগত হইলেন। নদীপ্রান্তের ঘটনা ও সন্ন্যাসীর কথা তৎকালে গোপনে রাখিলেন।

দ্বিতীয় অংশ।

মহাত্মা কমলাকান্ত শৈশবে পিতৃহীন। দুই সহোদর। তিনি জ্যেষ্ঠ। লক্ষ্মীস্বরূপিনী তাঁহার মাতা দুইটী শিশু পুত্রকে অবলম্বন করিয়া স্বামীর মৃত্যুর পরও কিছুদিন স্বামীর গৃহে বাস করিয়াছিলেন। কমলাকান্তের পিতার তাদৃশ ভূ-সম্পত্তি ছিল না, কেবল কয়েক ঘর যজমানকে অবলম্বন করিয়া অম্বিকায় বাস করিতেন। তখন বর্ত্তমানের ন্যায় সংসারের ব্যয়ভার ছিল না। টাকায় ১ মণ চাউল, স্থল বিশেষে ততোধিক পাওয়া যাইত। জীবন ধারণের উপযোগী অন্যান্য সামগ্রীও সুলভ ছিল। অনেক স্থলে ব্রাহ্মণগণ সামান্য বৃত্তির টাকা ও ২।৫ বিঘা নিষ্কর জমীর উপসত্ব হইতে সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। এখন সংসারের ব্যয়ভার তদপেক্ষা দশ গুণ বাড়িয়াছে। এখন উদরান্নের জন্য মধ্যবৃত্তি লোককে বিবিধ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সুখের গৃহ, সুখের গ্রাম, স্নেহময়ী জননী, চারুভাষিনী দুঃখের সঙ্গিনী প্রিয়তমা প্রেয়সী, সহোদর সুহৃদ সহবাসও পরিত্যাগ করিয়া প্রবাস বাস অবলম্বন করিয়া বহু দুঃখভাগী হইতে হইয়াছে, আজীবন দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। সমাজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সাগর পারে বিচরণ করিতে হইয়াছে। হায়! হায়! সময়ের কি ভীষণ বিপ্লব! কি অকল্পিত পরিবর্ত্তন। অভাব ও

ব্যাধি সমাজের মর্ম্মস্থান অধিকার করিতেছে। উদ্যম, সাহস, বিদ্যা, বুদ্ধি সমাজকে পরিত্যাগ করিতেছে। কেন! কারণ কি! এক দিকে দৈব বিড়ম্বনা, প্রতি বৎসরই অজন্মা, স্থল বিশেষে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বৃক্ষ সকল অপেক্ষাকৃত ফল পুষ্প বিহীন, অন্য দিকে সমাজের অকর্ম্মণ্যতাই অধোগতির কারণ। পুষ্করিণী সকল সংস্কার বিহীন, পানীয় জলের অভাব, সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি। গোচরভূমির অভাব, গবাদির হ্রাস, জলাভাবে মৎস্যের অভাব, নিজের জীবন ধারণের উপযুক্ত দ্রব্য সমূহের জন্য পরের মুখাপেক্ষা, সেই সকল বস্তু স্বহস্তে ও পরিশ্রমে উৎপাদনের নিশ্চেষ্টতা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে সমাজ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে! নিশ্চেষ্ট, ও অলসের প্রতি দৈবও প্রতিকুল হন! সক্ষম ও কর্ম্মীর সহায় দৈব ও প্রকৃতি। লোক সমাজ উদ্যমশীল হইলে দৈবের শুভদৃষ্টি হয়। সৌভাগ্য ক্রমে আজ কাল অনেকেরই সমাজের উন্নতির সোপান কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য, শিল্পের প্রতি আসক্তি দেখা যাইতেছে। সুশিক্ষিত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন ও সমাজের উন্নতির জন্য অনেকেরই আগ্রহাতিশয় দেখা যাইতেছে, সুখের বিষয়! আর এক কথা, অভাব, সদভিপ্রায়ের শত্রু, এ কথা সত্য, কিন্তু অভাব অনেক স্থলে বিলাস প্রসূত, অতএব বিলাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা প্রথম কর্ত্তব্য। তখন মধ্যবর্ত্তী লোকের কথা দূরে থাকুক ধনবানদিগের বিলাস কিছুমাত্র ছিল না। ধনবানদিগের অহঙ্কার সৎকর্ম্মের উপর ছিল, প্রজাপালন, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, গুণবান্ অনাথ ও

দরিদ্রের প্রতিপালনে ধনবানদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। মধ্যবর্ত্তী লোকেরাও ধনবানদিগের অনুকরণ করিতেন, তাই মহাত্মা কমলাকান্তের পিতা কয়েকঘর যজমান মাত্র অবলম্বন করিয়া অম্বিকায় সচ্ছন্দে বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার পত্নী শিশু পুত্রদ্বয় যজানকার্য্যে অসমর্থ হইলেও প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা কমলাকান্তের মাতুলালয় চান্না। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান খান্না জংসন রেল ষ্টেশনের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। তাঁহার মাতুল বিষয়ী না হইলেও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। ভগিনীপতিব মৃত্যুর কিছুদিন পরে ভগিনীকে চান্নায় আনিয়া পৃথক গৃহাদি ও কিছু ভূসম্পত্তি দেন। মহাত্মা কমলাকান্ত বিদ্যা শিক্ষার জন্য অম্বিকায় যজমানগৃহে অবস্থান করিতেন।

মহাত্মা কমলাকান্ত প্রথমে অম্বিকার একটী টোলে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ কেরেন। অম্বিকা গণ্ডগ্রাম, অর্দ্ধনগরী, সুরতরঙ্গিণীর তীরবর্ত্তী, বিবিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। টোল, সঙ্গীতালয় লোক প্রবাহ, বিপণী ব্যবসা সব ছিল। পুরাতনের উপর নূতনের উৎভব, আগ্রহ ও অবস্থান দৃষ্ট হইত, সাধারণ, ধনী, মূর্থ, বিদ্বান, ফকির, সন্ন্যাসী সকল প্রকার লোকের লীলাভূমি ছিল। কমলাকান্তের মানসবিহঙ্গ গোপনে সেই পুণ্যভূমি বিচরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কমলাকান্তের কণ্ঠস্বর অতিশয় সুমধুর ছিল, এমন কি বালক পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া নীরব হইত। টোলে অধ্যয়নকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর অন্যান্য বালকের কণ্ঠস্বরকে পরাস্ত করিত। তৎকালের টোল ও বর্ত্তমান টোলের বিশেষ

রূপান্তর ঘটিয়াছে। তৎকালের টোল গৃহ চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় সর্ব্বত্রই একভাবে নির্ম্মিত হইত। এখনও স্থানে স্থানে সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। টোলগৃহের দুইধারে দুইটী প্রকোষ্ঠ থাকিত, মধ্যস্থানে অধ্যাপকের আসন থাকিত। ক্ষুদ্র গৃহ দুইটীর দ্বার ভিতর দিকে, মধ্য স্থানের সম্মুখে থাকিত। গৃহ দুইটীর দুই তিনটী জানালা থাকিত। টোল সম্মুখদেশ অবলম্বন করিয়া পরচালা থাকিত। প্রকোষ্ঠ মধ্যে মঞ্চপরে কাষ্ঠ ফলক, বস্ত্র ও সূত্র বদ্ধ হরিদ্রারঞ্জিত কাগজে হস্ত লিখিত দীর্ঘতাড়া পুস্তক সকল সজ্জিত থাকিত, নিম্নে সামান্য শয্যা ও বিশ্রাম এবং শয়নের জন্য কতকগুলি কঠিন উপাধান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকিত। গৃহের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অধ্যাপক অধীত ব্যাকরণ বালকগণকে কাব্য, স্মৃতি ও ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। সম্মুখস্থ বহির্দ্দেশে (পরচালায়) তরলমতি বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে ব্যাকরণ পাঠ করিত। মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরের উচ্চ সীমায় উঠিলে অধ্যাপক বলিতেন, "ওরে এত-না" ওমনি সুর নামিয়া আসিত ও কিয়ৎক্ষণ অন্তরায় থাকিয়া আবার পঞ্চমে উঠিত। অধ্যয়ন দ্বারা শুধু মানসিক পরিশ্রম নহে, শারীরিক পরিশ্রমও বিলক্ষণ হইত। গুরু বায়ুভরে বিচলিত পাদপ-পল্লবের ন্যায় বালকগণের মস্তক আন্দোলিত হইত ও প্রত্যেক উচ্চারণের সহ নাসিকা পুস্তক স্পর্শ করিত। সকলের পরিধান গেরুয়া বসন, উপবীত রঞ্জিত ও মস্তকে শিখা। অধ্যয়নের ব্যয়ভার নাই। পুস্তকের মূল্য নাই। অধ্যাপক গৃহিণী সেই সকল বালকবৃন্দের জননী হইতেন, হাস্যমুখে রন্ধন ভোজন করাইতেন। আহারীয় ও

বসন যোগাইতেন, রাজা, জমিদারগণ, সচ্ছল গৃহস্থগণ। ছাত্রগণ নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে লঘু পুষ্টিকর আহারাদি দ্বারা সবল ও সুস্থকায় থাকিতেন, পরে এক এক বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া শাস্ত্র ও জ্ঞানের উন্নতি করিয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। বর্ত্তমান টোলের সে ভাব নাই। সময়ের সঙ্গে সবই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জীব, জন্তু, পশু পক্ষী মানবদেহ ও বৃক্ষাদির ন্যায় মনুষ্য সমাজের রীতি নীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ভাল আসিয়া মন্দের স্থান, মন্দ আসিয়া ভালর স্থান অধিকার করিতেছে। এখন বৈদেশিক শিক্ষার ভীষণ প্রাদুর্ভাব। পাঠের সময় পরিবর্ত্তন, পাঠের স্থান পরিবর্ত্তন, পাঠের সময় বালকের অঙ্গভঙ্গির পরিবর্ত্তন। পাঠ্যজীবনের সকলই অন্যভাব! পরিধান বিভিন্ন, ব্যয়ভার গৃহস্থের সাধ্যাতীত, শিক্ষনীয় বিষয়ও অন্যরূপ। তখন টোল প্রবেশের পূর্ব্বে পাঠশালে সামান্য শিক্ষা হইত, বুঝিতে না পারিলেও বালকগণকে চাণক্যের শ্লোক মুখস্থ করান হইত। শৈশবে পঠিত বিদ্যা যৌবনে, প্রৌঢ়ে ও বৃদ্ধে অমূল্যরত্ন প্রসব করে, সংসারে কর্ম্মক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক হয়, এখনও অনেক বৃদ্ধলোক চাণক্যের শ্লোক অনেক স্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। বর্ত্তমানের প্রথম শিক্ষায় তেঁতুল খেলে টক লাগে, লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে, লেখা পড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে, ইত্যাদি পাঠ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা হয় না, কারণ বালক বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এ সব সামান্য বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে। যে পাঠে যৌবনে চরিত্র গঠিত হইবে, বিচার ও বিবেচনাশক্তি

বর্দ্ধিত হইবে, অধীত বিদ্যা পথ প্রদর্শক হইবে, সেইরূপ শিক্ষা দেওয়াই উচিত। পুরাতনের সবই উৎকৃষ্ট ও নূতনের সবই অপকৃষ্ট তাহা বলিতে চাহি না; বর্ত্তমান টোল পুরাতন টোল অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত হইতে পারে, কিন্তু ব্যয়ভার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ায় সাধারণে শিক্ষালাভ করিতে পারেন না। অধ্যাপকগণ কোন কোন স্থলে নিজব্যয়ে ২।৩টী মাত্র ছাত্রের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন যজমানগণ পুরোহিত-পুত্রগণের শিক্ষার ভার লইতেন, কারণ শিক্ষিত পুরোহিতের দ্বারা ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন হইবে। সেইজন্য মহাত্মা কমলাকান্তকে তাঁহার শিষ্যগণ অম্বিকায় রাখিয়াছিলেন।

মহাত্মার অম্বিকা বাস বেশীদিন ঘটে নাই। অনুরাগের উপর বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অনুরাগের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। জন্মান্তরের সঞ্চিত বিদ্যা, সঞ্চিত প্রেম, সঞ্চিত ভক্তি, শত বাধা, শত উপদ্রব, সহস্র সহস্র সংসারের শোক দুঃখ অতিক্রম করিয়া উদিত হইবে, তাহা নষ্ট করিবার কাহারও শক্তি নাই। গিরিগহ্বর নিঃসৃত বারিধারা যথা নানা স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া, নানা স্থানকে উর্ব্বর ও ফলপুষ্প ভারে পরিশোভিত করিয়া মহাসমুদ্রে পতিত হয়, প্রেমও সেইরূপ, ভক্তির উচ্ছ্বাসে, সঙ্গীত দ্বারা সহস্র সহস্র মানব হৃদয়কে উর্ব্বরা, সহস্র সহস্র মানবের সংসারযন্ত্রণা দূর করিয়া প্রেমার্ণব পরমেশ্বরে লীন হয়।

কমলাকান্তের ভক্তি-কুসুম বিকাশ-উন্মুখ সংসারে বৈরাগ্য,

বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগ, পরমাবিদ্যার উপাসনায় বিভোর। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, কি যেন কি এক চিন্তায় রত, অথচ প্রসন্ন বদন! কালী নামানুকীর্ত্তনে পরমানন্দ, সন্ধ্যার পর সঙ্গীতালয়ে যান, ব্যক্তি বিচার, স্থান বিচার না করিয়া শ্যামা সঙ্গীতে ভক্তির উচ্ছ্বাস, প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখাইয়া ঘোর বিষয়ীরও ক্ষণেকের জন্য বিকার উপস্থিত করেন। নূতন নূতন গীত রচনা করিয়া গুণগ্রাহী লোকদিগকে আনন্দিত করেন। গঙ্গার ঘাটে, কালী-মন্দিরে, যেখানে বিরাগী ভক্তিমান লোকের সমাগম হয়, সেই স্থানেই অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করেন। শিষ্যগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার মানসিক বিকার জানিতে পারিয়া তাহাকে অম্বিকায় আর বেশী দিন রাখা নিরাপদ নয় বিবেচনা করিলেন। তাঁহার মাতার নিকট গুরুপুত্রের মানসিক অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে চান্নায় পাঠাইয়া দিলেন!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধকের মাতুলালয় চান্না। এই চান্না-গ্রাম বর্দ্ধমানের পশ্চিম। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের খানাজংসন নামক ষ্টেশনের এক ক্রোশ উত্তরে। মাতুলের নাম নারায়ণ চন্দ্র ভট্টা-চার্য্য। চান্না তৎকালে বিশেষ গণ্ডগ্রাম না থাকিলেও তথায় অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস ছিল। একটী টোল, সঙ্গীতের স্থান, বাজার হাট, দেবালয়, গণ্ডগ্রামের সব সৌষ্টব ছিল। বড় পুষ্করিণী, সুন্দর ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট, ঘাটের দুই পার্শ্বে শিব মন্দির তৎকালিক গণ্ডগ্রাম সকল পুণ্যবান ধার্ম্মিক সঙ্গতিশালী লোকের অবস্থানের পরিচয় দিত। এখনও অনেক পুরাতন গ্রামে ঐ সকল

সম্পত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণী পঙ্কিল, পঙ্কজজালে পরিপূর্ণ! ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট ভগ্ন বিচ্ছিন্ন, শৈবাল মণ্ডিত। মন্দির ইষ্টকের চূর্ণস্তূপ রূপে পরিণত। সাধারণ, মধ্যবৃত্ত, গৃহস্থ পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ পীড়িত, ধনাঢ্য গুণগ্রাহী ধার্ম্মিক লোকের অভাব, এই সকল কারণে অনেক গণ্ডগ্রাম শ্রীহীন হইয়াছে। বর্ত্তমান চান্নারও সেই অবস্থা। এই স্থানে মহাত্মা কমলাকান্তের একটী আসন আছে! বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি বিদ্বান, গুণগ্রাহী, ধার্ম্মিক, ভারত সম্রাট কর্ত্তৃক বিবিধরূপে সম্মানিত মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ বাহাদুর সেই স্থানটী বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

সকল রসের সার ভক্তিরস। ভক্তিরস অমৃত, স্বর্গে দেবলোক অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন, মর্ত্ত্যে মানবগণ ভক্তিরসে অমরত্ব লাভে সমর্থ হন। সেই ভক্তিরস মানবের হৃদয় প্রস্রবণ হইতে উৎপন্ন হইয়া জগৎ প্লাবিত করিয়া ফেলে। ভক্ত জগৎকে অমৃতময় দেখেন, রস সাগর সচ্চিদানন্দের পদপ্রান্ত ধরিয়া প্রেম সাগরে ভাসিতে থাকেন। সুকৃতি ফলে যিনি একবার সেই রসের আস্বাদন করিতে সমর্থ হন, তাঁহার আর সংসারে কোন বস্তুই স্পৃহনীয় হয় না। সংসারের কোন প্রলোভনই তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না। পিপীলিকাগণ যেমন মধুভাণ্ডে, ভক্তগণও তেমন পরম অমৃত সাগর সর্ব্ব শক্তিমানে দৃষ্টি রাখেন। ভক্তগণ সংসারের প্রলোভন সকলের বহুরূপী ভাব, তাহাদের কুটিলতা, অস্থিরতা ক্ষণস্থায়িতা দেখিয়া হাস্য করেন। সাধক-

কমলাকান্তের ও সেইভাব, বয়স অতি অল্প হইলেও জনকাদি মহর্ষির ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে থাকিবার তাঁহার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। কমলাকান্ত চান্নায় আসিলেন। জননীর সাক্ষাৎ হইল। জননী পুত্রমুখ দেখিয়া সুখী হইলেন, কিন্তু অম্বিকার শিষ্যগণের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইলেন। কমলাকান্ত স্নানাহার করিয়া সুস্থ হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে একান্তে ডাকিলেন, কাছে বসাইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া মাতার মর্ম্মভেদী নয়নধারা পতিত হইল। কমলাকান্ত মায়ের ভাবান্তর দৃষ্টি করিয়া চঞ্চল হইলেন, চক্ষের জল পড়িল, অতি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা কি হইয়াছে? জননী উত্তর করিলেন, কমলাকান্ত তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তোমার পিতার মৃত্যুর পর আমি তোমাদিগকে আশ্রয় করিয়া সংসারে আছি। তুমি বিদ্বান হইবে, ধনবান হইবে, লোকের নিকট মাননীয় হইবে, আমার স্বামী বিয়োগ দুঃখ দূর করিবে, আমি এই ইচ্ছা করি, কিন্তু শিষ্যগণের দ্বারা তোমার মনের অবস্থা জানিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছে। তুমি আসা অবধি আমি তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি। তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার গেরুয়াবাস, তোমার অন্যমনস্কভাব দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে! কমলাকান্ত কহিলেন, কেন মা! আমি ত কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই, আমাদের টোলে সকলেই গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। আমি মাঝে মাঝে সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকি তাহা কি মন্দ, জগদম্বার নাম করিয়া, গুণ গাহিয়া নিজে সুখী হই, দশজনকে

সুখী করিতে পারি, তাহা কি মন্দ? আমি পড়ায় অবহেলা করি নাই, প্রায় ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়াছি। পূজা পদ্ধতিও কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছি। মা আপনার নিকট কিছু অপলাপ করিব না, আমার বিষয় বৈভব অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়! ভুবনেশ্বরীর গুণানুকীর্ত্তন করিলে সব ভুলিয়া যাই। সেই হাস্যময় প্রসন্নমূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিতে পাই, জগতের প্রত্যেক বস্তুতে সেই প্রসন্নময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। মা তুমি সেই আনন্দময়ী। আমি তাঁহাকে ও তোমাকে ভিন্ন ভাবে দেখি না। আমি তোমারই চরণ ভিন্ন কিছু চিন্তা করি না। মা নামই আমার মহামন্ত্র, মা আমার উপাস্য দেবতা। মা নাম উচ্চারণ করিলেই আমার সকল সন্তাপ সকল যন্ত্রণা দূর হয়। আমি জানি, আমার মা আছেন, আমি রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও সম্পদশালী, সন্ন্যাসী অপেক্ষাও সুখী, বালক অপেক্ষাও চিন্তাহীন। জগৎ আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু মা আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। মা আমার মনেরবল, হৃদয়ের শক্তি। এ দুস্তর সংসার সাগরপারের মায়ের কৃপাই তরণী, একমাত্র উদ্ধারের উপায়। মা তুমি প্রসন্ন হও, কৃপানয়নে চাও, তোমার সন্তানের অভাব কিসের! তোমার চিন্তাই পরম বিদ্যা, তোমার অনুগ্রহই সংসারের সকল সম্পত্তি। যে ব্যক্তি মায়ের চরণ চিন্তা না করিয়া নয়ন মুদ্রিত করে, মায়ের চরণ চিন্তা না করিয়া শয্যাত্যাগ করে, সে ব্যক্তি ভ্রমে পতিত। মা শব্দই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। দারুণ শারীরিক ও মানসিক কষ্টে জীব মাত্রেই মা শব্দ উচ্চারণ

করিয়া থাকে। মা আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, অনুমতি কর, কিঙ্করের কর্ত্তব্য কি? মহাত্মার জননী কিয়ৎক্ষণ পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, ভাবিলেন, আমার সুসন্তান, অল্প বয়সে ভক্তি উপার্জ্জন করিয়াছে, শান্তির সাগরে ডুবিয়াছে, ইহার সৎকর্ম্মে বাধা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন, বাবা! তুমি এত অল্প বয়সে ভক্তি উপার্জ্জন করিয়াছ, আমি সুসন্তান পাইয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করিতেছি। তোমার ধর্ম্ম কর্ম্মে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। তোমার মনের উদ্বেগ দেখিয়া চিন্তা হইতেছে, পাছে তুমি গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী হও। তোমার মুখ না দেখিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব। তুমি সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম অর্থ উপার্জ্জন কর এই আমার ইচ্ছা। এই বলিয়া জননীর নয়নে জলকণা দৃষ্ট হইল। মহাত্মার হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল, তিনি জননীর মুখ পানে চাহিয়া পাদস্পর্শ পূর্ব্বক গদগদ স্বরে বলিলেন, কিঙ্করকে যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই করিব। "মা হওয়া কি মুখের কথা—শুধু প্রসব করে হয় না মাতা।" জননী বিশেষ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম কর। দেশত্যাগ, গৃহত্যাগ করিও না। তুমি জগন্মাতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নিত্য সেবা করিবে, বিবাহ করিবে। মহাত্মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, গৃহত্যাগ, দেশত্যাগ করিব না, যাহা অনুমতি করিতেছেন, তাহাই করিব। জননী কহিলেন, সংসারীর অর্থ প্রয়োজন। সংসারীর ধর্ম্ম কর্ম্ম অর্থ সাপেক্ষ। অতিথি সৎকার, পূজা

পার্ব্বণ, সকল কর্ম্মেই অর্থ প্রয়োজন। গৃহে থাকিলে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। তোমাকে অবশ্যই অর্থ চিন্তা করিতে হইবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সাধক কহিলেন, আপনার আশীর্ব্বাদই অমূল্য রত্ন, আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে কোন বস্তুরই অভাব থাকিবে না। সংসারে সুখ দুঃখে রাখিবার কর্ত্তা একজন। যদি আমরা তাঁর নিতান্ত শরণাপন্ন হই, তিনিই আমাদিগকে সকল সময়ে, সকল অবস্থায় রক্ষা করিবেন। আপনার কথা কখনও অবহেলা করিব না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। আমি অম্বিকার অর্থ চিন্তায় অবহেলা করি নাই। শিষ্যগণের মাঙ্গলিক সমুদয় কর্ম্মেই ব্রতী থাকিতাম। জননী গুণবান পুত্রের প্রিয়বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

মহাত্মার জননী পুত্রকে সংসারী করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মানবের সংসারে দুইটী বন্ধন। প্রথম স্নেহময়ী জননী, দ্বিতীয় চারুভাষিণী দুঃখের দুঃখিনী সহধর্ম্মিণী। মায়ের বন্ধন অদৃশ্য। বন্ধনে যন্ত্রণা নাই। পরম স্বর্গীয় স্নেহে ও যত্নে মানুষকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। ভাল না বাসিলেও ভালবাসা, যত্ন না করিলেও যত্ন করা, ভক্তি না করিলেও শ্রদ্ধা করা, এই সকল গুণ কেবল জননীতেই বর্ত্তমান। ভক্তি না করিলে দেবতারও কৃপাদৃষ্টি হয় না। জননী দেবতা অপেক্ষাও উচ্চ স্থানের। এমন দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য দেবতার অনুসন্ধানে মানব কি সহজে সংসার পরিত্যাগ করিতে পারেন? মাতৃস্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন, তাহা ছিন্ন করা অতি অসাধারণ। বৃদ্ধারে

মানব যত্ন ও ভালবাসার প্রয়াসী! সে যত্ন ও ভালবাসা পাইলে সব ভুলিয়া যায়, সংসারের গুরুভার মস্তকে করিয়া হাস্যমুখে বিচরণ করিতে পারে। সেরূপ যত্ন ও স্নেহ মানব কেবল জননীর নিকট প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বন্ধন সহধর্ম্মিণী। রোগ, শোক, ভয়, দুঃখ-কল্পিত সংসার একমাত্র চারুশীলা রমণীর বলে দণ্ডায়মান। প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক প্রাসাদ, প্রত্যেক কুটীর রমণীর প্রেম ও ভালবাসার কীর্ত্তিস্তম্ভ। চারুশীলা প্রিয়ভাষিণী রমণীই সংসার স্থাপনে বিধির যন্ত্র স্বরূপ। "বহুত যতনে বিধি করি অনুমানা—নাগর নাগরী কৈল নিরমানা।" এই রমণী রত্ন সৃষ্টি করিবার জন্য বিধিকে অনেক যত্ন করিতে হইয়াছিল। সংসার মরুভূমিতে উৎস। তাহার ভালবাসা, প্রেম, যত্ন, সংসারে অমৃত। যিনি এরূপ রমণী লাভ করিতে পারেন, তিনি কি সহজে সংসার পরিত্যাগ করিতে পারেন। একথা মহাত্মার জননী উত্তমরূপে বুঝিতেন। তিনি ভাবিলেন, আমি মায়ের মত মা হইব, সদ্বংশজাতা পুত্রের অনুগামিনী সহধর্ম্মিণী সন্ধান এখন অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে।

সংসারে কোন লোককেই সর্ব্ব প্রকারে সুখী, কোন বস্তুকেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বরাজ্যে উত্তম অধম, উচ্চ নীচের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার কানন চারুশীলা মধুর ভাষিণী, ভর্ত্তার অনুগামিনী রমণীগণ সৌরভ জাল জড়িতা কুসুমিতা লতা, তাহার সৌরভে বন আমোদিত হয়, কিন্তু সে বনে শিয়াকুল ও আলাকুষা কাঁটাও দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহাদের জ্বালা প্রখর। কর্কশ ভাষিণী, কলহপ্রিয়া, ভর্ত্তার বিরুদ্ধাচারিণী রমণীগণ সেই আলাকুষা ও শিয়াকুল কাঁটা। পুরুষ পথিক অনেক সময় তাহাদের ভয়ে সংসার কাননে প্রবেশ করিতে ভীত হয়। মহাত্মার জননী এই জন্য চিন্তা করিতেছেন, কিরূপে সদ্বংশজাতা, ভর্ত্তার অনুগামিনী বধূ পাইবেন। তিনি পুত্রের মনের অবস্থা উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, ইহাও বুঝিয়াছেন, সংসারের প্রলোভন ছিন্ন করিবার ক্ষমতা পুত্রের জন্মিয়াছে। যদি কুটিল, কলহপ্রিয়া বধূ দুর্ভাগ্য বশতঃ আসিয়া জোটে পুত্রের হৃদয় নিহিত বৈরাগ্যবীজ প্রকৃতির আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবে, সত্বরে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইবে, তাঁহাকে সংসারে রাখা কঠিন হইবে। তিনি ইহাও সুন্দররূপে জানিতেন, পুত্রের মনের মত পত্নীলাভ জন্মান্তরের সুকৃতি সাধ্য। এই জন্য তাঁহার মন আশা ভরসা ও নিরাশায় যুগপৎ বিচলিত হইতে লাগিল। তিনি নিজ ভ্রাতার নিকট গমন করিয়া, পুত্রের মনের অবস্থা জানাইয়া, পুত্রকে শীঘ্র সংসারী করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

পরিবর্ত্তন সংসারের নিয়ম। এ জগতে কিছুই একভাবে থাকিবে না। সকলই ক্ষয়, বৃদ্ধি ও ধ্বংশের বশীভূত। নূতন নব ঐশ্বর্য্যের সহ উদিত হয়, নয়নানন্দ বর্দ্ধন করে, ক্রমে পুরাতনের ভাবে পশ্চাৎ পথ অবলম্বন করিয়া অদৃশ্য হয়। মানব মন নূতন প্রয়াসী, নূতন প্রিয়, পুরাতন সারগর্ভ হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অবলম্বন করে। সেই জন্য মানব সমাজ উদ্ভিদ ও অন্য সমাজ হইতে অধিক পরিবর্ত্তন শীল। একশত

বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গ সমাজ ও বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজে বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে নর নারী নাই, সে ভাবের সুখ সম্পদ নাই, সে কর্ম্ম কল্পনা নাই, সকলই নূতন। নূতনের আতিশয্যে মানবের মনও নূতন হইয়াছে। সকল ভাবেরও ভাবান্তর ঘটিয়াছে। পুরাতন ভাল, কি নূতন ভাল, একথা বিচার করা বড় কঠিন। নূতন আস্বাদন করিয়া, পুরাতনকে নবরসে আপ্লুত বিবেচনা করিয়া পুরাতনের প্রশংসা করা মানবের স্বভাব, কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত, "পুরাণ মাত্রেব ন সাধু সর্ব্বং।" নূতনে কি ভাল নাই, অবশ্যই আছে, কিন্তু বঙ্গ সমাজে নূতনে অনেক নিন্দনীয় পদ্ধতির প্রকটন দেখিতে পাওয়া যায়। একান্নবর্ত্তী সংসারের সুখ প্রায় উঠিয়া গেল। ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন অনেকেই মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতেন, মাতুলই প্রধান অভিভাবক বলিয়া গণ্য হইতেন, ভ্রাতা ভগিনীর অভাব ও দুঃখের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, প্রয়োজন হইলে ভগিনীর অন্নসংস্থান স্বতি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এখন সে ভাবের বিলক্ষণ শৈথিল্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে মহাত্মা কমলাকান্তের মাতুল তাহার ভগিনীর যথাসাধ্য অন্নসংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন, এবং ভাগিনেয়গণের পিতৃস্থানীয় ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভগিনীর মুখে সমুদয় শ্রবণ করিয়া কহিলেন আমিও কমলাকান্ত সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতেছি, তাহাকে শীঘ্র সংসারী করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। কমলাকান্তের অতি অল্প বয়সে বৈরাগ্য

উপস্থিত হইয়াছে। কালী নামে উন্মত্ত, অনন্ত-সুখ-সংগ্রহ-পথের পথিক হইয়াছে। কাহারও সৎকর্ম্মে বাধা দেওয়া উচিত না হইলেও তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র সংসারী হইয়া তোমার দুঃখ দূর করিবে, আমি ইহাই ইচ্ছা করি। আমি ইতি পূর্ব্বেই পুত্র বধুর সন্ধান করিয়াছি, এখন তোমার মনোনীত হইলে, আমি কন্যার পিতার নিকট কমলাকান্তের বিবাহের কথা উত্থাপন করি।" ভগিনী ব্যস্ত হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "ভাই! তুমি যাহা করিবে, তাহাতে কি আমার অমত আছে। কমলাকান্তের মনের অবস্থা ভাবিয়া ভগবানের নিকট সৎবংশজাতা ভর্ত্তার মনোমত বধুর প্রার্থনা করিতেছি।" ভ্রাতা কহিলেন, "লাবুড্ডীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটী কন্যা আছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রামেই বিবাহ করেন, কন্যাটিকেও তুমি দেখিয়াছ, কন্যার মাকেও তুমি বেশ জান। লাকুড্ডী এখান হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ হইবে, বর্দ্ধমানের অতি সন্নিকট।" মাতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "লাকুড্ডীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা? অতি ভাল বংশ, বাপ মাটীর মানুষ, মা, লক্ষ্মী, মেয়েটীও সুন্দরী, হর গৌরীর মিলন হইবে, আমার কপালে কি তাহা ঘটিবে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি আমার পুত্রকে কন্যাদান করিতে স্বীকার করিবেন।" ভ্রাতা কহিলেন, স্বীকার না করিবার কারণ ত কিছু দেখি না, আমি ত পণ্ডিত নহি, আমার করণীয় ঘর। "পাত্র দেখে কন্যা দান।" কমলাকান্তের মধুর কণ্ঠরবে, কালীনাম-অমৃতরসে এই চান্নাগ্রাম ট[illegible]। এই গ্রামে কোন্ ঘরে দিনান্তে একবার কমলাকান্তের

নাম না হয় ? কমলাকান্ত রমণীগণের প্রিয়, কমলাকান্ত বৃদ্ধগণের প্রিয়, কমলাকান্ত সর্ব্বজন প্রিয়। আমাদের গ্রামের দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে অনেক ভক্ত ও সন্ন্যাসী সময়ে সময়ে উপস্থিত হন। আমি শুনিয়াছি, তাঁহারা কমলাকান্তের মুখে মধুর কালী সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হন, বলেন, বালক মহাপুরুষ, ইহা কি আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা। পাত্র সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। মতামতের জন্য তুমি চিন্তা করিও না। তুমি বলিতেছ, কমলাকান্ত তোমার পদস্পর্শ করিয়া বলিয়াছে, দেশত্যাগ করিবে না, গৃহে বাস করিবে, কিন্তু ভগিনী আসক্তি ও নদীর বেগ ধারণ করা বড় শক্ত, তাহারা লক্ষ বাধা অতিক্রম করিয়া ছুটিতে থাকে। কমলাকান্তের হৃদয় ভরাপ্রেম, অপার ভক্তি; পাছে জগৎ জননী কমলের সব বাধা ঘুচাইয়া দেন, তাহাই আমার ভাবনা। আমাদের বাধা ত বাহিরের, কালীনাম রসে তাহার বুক ভরা। সে রসের উচ্ছ্বাসে বাধা দিবার ক্ষমতা মহামায়া ভিন্ন আর কাহারও নাই। যাহা হউক, আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা করিব। জননী কহিলেন, "কমলাকান্ত আজ পর্য্যন্ত আমার কোন কথাই অবহেলা করে নাই, সে নিশ্চয়ই গৃহ ত্যাগ করিবে না, তুমি কালই লাকুড্ডীতে গিয়া বিবাহের প্রস্তাব কর।" ভ্রাতা কহিলেন, "আমার তথায় যাইবার প্রয়োজন নাই। লাকুড্ডীর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী কাল চান্নায় আসিবেন, আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিব, তুমিও তাহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের কথা উত্থাপন করিবে। বিবাহ কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগের

লওয়া কর্ত্তব্য। আমাকে কোন কথাই বলিতে হইবে না, আমি কমলাকান্তকে নিজ পুত্র অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিয়া থাকি।" ইহা বলিয়া ভ্রাতা কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

বিবাহ মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতম সংস্কার। সমাজের শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবস্রোত সঞ্চালন বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। জীবন সংগ্রামে পত্নীই শক্তি স্বরূপিণী, প্রধানা সহায়। মানব তাহার প্রথম শত্রু রিপুগণকে লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কাল প্রভাবে তাহারা প্রবল ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। জন্মান্তরের কর্ম্মফল বশতঃ মানবকে দেহ আশ্রয়ী রিপুগণ ব্যতীত আরও অনেক শত্রুজালে জড়ীভূত হইতে হয়। মনুষ্যকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বহুবিধ শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, ঘটনাচক্রে সংসারের আলোড়ন বিলোড়নে, ঘূর্ণবায়ুর মধ্যস্থিত তৃণ খণ্ডের ন্যায় তাড়িত, লাঞ্ছিত ও বিমর্দ্দিত হইতে হয়। দুঃখের দুঃখিনী, প্রিয়ভাষিণী, শক্তি সঞ্চারিণী, সহধর্ম্মিণী সহ মানব সেই সকল শত্রুগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াও দুর্গম সংসার ক্ষেত্রে হাস্যমুখে অবস্থান করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, বিবাহ না করিলে শত্রু-গণের পরাজয় সুখসাধ্য হয়, পরম পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু পরমেশ্বরের পদপ্রান্তে নিরন্তর দৃষ্টি রাখিয়া, সংসার ধর্ম্ম করিলে, পত্নী পরম পথের কণ্টক হইতে পারে না, অধিকন্তু পরম পথ পরিষ্কার করে। মনুষ্য প্রাণ অন্নগত, দেহ ব্যাধি মন্দির, অন্ন মুষ্টির জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয়, অতএব পত্নীগ্রহণ ও সংসার ধর্ম্ম উত্তম। কেবল-মাত্র মায়াকে অবলম্বন না করিয়া ধর্ম্মকে আশ্রয় ও ঈশ্বরের

নিতান্ত শরণাগত হইয়া চলিলে সংসার হইতেই স্বর্গ পথের দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়, তবে যাঁহার সুখে দুঃখে সম বোধ, হৃদয়ে অপার প্রেম, যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় অকাতর, তাঁহার পক্ষে অন্য ব্যবস্থা, তাঁহার নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মই কি, সংসার ধর্ম্মই কি, সকল ধর্ম্মই এক। পত্নী সংসারের ও জীবনের উচ্চস্থান অধিকার করে, বিবাহে কুটিলতা, শঠতা, ধৃষ্টতা থাকিলে ও পবিত্রতা না থাকিলে বড় দুঃখের হয়।

বিবাহ ব্যবসাবৃত্তির অন্তর্গত হওয়া বড় দূষণীয়, বিবাহে লোকবলবন্ধন অপেক্ষা ধর্ম্মবলবন্ধন প্রশস্ত, কারণ লোকবলবন্ধনসূত্র ক্রমে শিথিল হয়, কিন্তু ধর্ম্মবলবন্ধন জীবনে শিথিল হইবার নহে। ব্যভিচার দ্বারা সে বন্ধন শিথিল করিলে শান্তি অদৃশ্য, অনিশ্চিত, অতএব ভীষণ। বিবাহে পবিত্রতা থাকা প্রয়োজন, তাহাতে কোন প্রকার কুপ্রথা থাকিলে সমাজ দূষিত হয়, জাতীয় শক্তি নষ্ট হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালার উচ্চ জাতিগণের মধ্যে অর্থগ্রহণ অতি কুপ্রথা। তৎকালে বিবাহে অর্থগ্রহণ প্রথা ছিল না। কন্যা বিক্রয়, পুত্র বিক্রয়, উভয়ই শুক্র বিক্রয় বলিয়া পরিগণিত হইত। শুক্র বিক্রয়ীর গৃহে জল গ্রহণ ঘৃণিত ও অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত, একারণ নিতান্ত অর্থ লোভীও বিবাহে অযথা অর্থগ্রহণে সাহসী হইত না। বিবাহের ব্যয় তাদৃশ কিছুই ছিল না। অবস্থা বিশেষে যৎসামান্য রৌপ্য কি স্বর্ণ অলঙ্কার, আত্মীয় স্বজনের অভ্যর্থনা, ইহাতেই যাহা কিছু ব্যয় হইত, তাহাও কন্যাকর্ত্তার ইচ্ছানুযায়ী, অবস্থানুযায়ী, পীড়ন কিছু ছিল না। আত্মীয় স্বজনের শয়ন, ভোজন

ও অভ্যর্থনার জন্য কন্যাকর্ত্তাকে বর্ত্তমানের ন্যায় চিন্তিত ও কুণ্ঠিত হইতে হইত না, প্রতিবেশীরা তৎবিষয়ে সাহায্য করিতেন। হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, কপটতা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যৌতুক গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল না। বরকর্ত্তা কুলমর্য্যাদা স্বরূপ সামান্য দান গ্রহণ করিতেন। কন্যাকর্ত্তার অবস্থানুসারে কেহবা ভূমিখণ্ড, কেহবা স্বর্ণখণ্ড, কেহবা গুটীকতক রৌপ্য মুদ্রা মাত্র প্রদান করিতেন। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার নিকট অর্থ ও অলঙ্কার প্রদানের প্রস্তাব করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। করণীয় ঘর হইলে বিবাহের জল্পনা ছিল না। কন্যা কুৎসিতা হইলেও গ্রহিত হইত। বিবাহের পূর্ব্বে আড়ম্বর বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ভয়াবহ ছিল না। তখন হাস্যমুখে বর ও কন্যাকর্ত্তা সম্মিলিত হইতেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায় কন্যাকর্ত্তা একদিকে পরম যত্নে লালিতা পালিতা কন্যার মুখ, অন্যদিকে বরকর্ত্তার ভীষণ বেগে প্রবাহিত, হৃদয় নিহিত অর্থ লালসা স্মরণ করিয়া দুঃখিত, বিবর্ণ, মৃতপ্রায় হইতেন না। কন্যা কাল, কি তাদৃশ সুন্দরী না হইলেও বরকর্ত্তা হাস্যমুখে বলিতেন, "আমাদের গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, পরমা সুন্দরীর প্রয়োজন নাই। অন্ন জল গ্রহণের উপযুক্ত ও কর্ম্মিষ্ঠা হইলেই হইবে।" বধূ দর্শন কালে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, কি মা আমাদের অন্নজল দিতে পার্ব্বে ত? তোমার ঘরকন্না দেখেশুনিতে পার্ব্বে ত? বর্ত্তমান সময়ের মত অলঙ্কার অবতারের সহস্র নাম তখন সৃষ্টি হয় নাই। বিবাহের সময়ে অলঙ্কারের কথার উল্লেখই হইত না। বরকর্ত্তা জানিতেন, কন্যাকর্ত্তা সালঙ্কারা কন্যা দান করিবেন,

তাঁহার যাহা জুটিবে তাহাই দিবেন, আমার বলা ধৃষ্টতা মাত্র, অলঙ্কার প্রার্থনা করিলে আত্মীয় স্বজনের নিকট অপদস্থ হইতে হইবে, আমার বধূ, আমি তাঁহার নিকট অলঙ্কার চাহিব কেন, আমার ক্ষমতা থাকে আমি দিব। ঘটকগণ কুল নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। তৎকালের রমণী মণ্ডলও সেইরূপ ছিলেন, পেড়ে কাপড়, মাথায় সিঁদুর, মুখে পান, কোলে ছেলে পাইলেই পরম সুখী হইতেন। হায়! হায়! কি ভীষণ পরিবর্ত্তন, এখন কন্যা প্রসব হইবামাত্র গৃহস্থের মধ্যে দুঃখ স্রোত পড়িয়া যায়। জননী দুঃসহ যন্ত্রণায় প্রসব করিয়া সুখী হইতে পাবেন না। পিতা দুশ্চিন্তায় কেবলমাত্র বিবাহের বিষয় চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ হন। কন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার চিন্তাস্রোত ভীষণ ভাব ধারণ করিতে থাকে। সমাজের ঘৃণিত প্রথার মুখপানে চাহিয়া কন্যার বিবাহের জন্য সংসারের অনেক সুখ ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হয়। একদিকে বহুকষ্টে লালিতা পালিতা কন্যার মুখ, অন্যদিকে অর্থ প্রয়াসী পুত্রবানের ব্যবহার চিন্তা করিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইতে হয়। বহুকষ্টে পাত্রের অনুসন্ধান পাইলেও, নিজের অবস্থা ও পুত্রবানের লালসা ও সমাজের কুপ্রথা, চিন্তা করিয়া পুত্রবানের নিকট কন্যার পিতা বিবাহের প্রস্তাব করিতেও ভীত হয়েন। কন্যাকর্ত্তাকে পুত্রবানের গৃহে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিতে হয়। পুত্রের পিতা কিরূপ প্রস্তাব করিবেন, এই চিন্তাতেই জড়ীভূত। আদর সম্ভাষণে অর্থ লালসার দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। বিবাহের কথার উত্থাপনের প্রারম্ভেই অর্থ ও অলঙ্কারের স্তব স্তুতি ও মঙ্গলা-

চরণ আরম্ভ হয়। পুত্রবান সমাজের উচ্চ, মন, সকল শ্রেণীর বিবাহ প্রদত্ত অর্থালঙ্কারের উল্লেখ করেন, পরিশেষে আপনার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বিস্তর অর্থ ও অলঙ্কার চাহিয়া বসেন। ছিছি এই কুপ্রথার নিবারণ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহা সমাজকে দূষিত করে। পূর্ব্বে বিবাহের তাদৃশ ব্যয়ভার ছিল না, সেই জন্য কমলাকান্ত পিতৃহীন হইলেও তাঁহার বিবাহ সহজেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

লাকুড্ডার ভট্টাচার্য্য মহাশয় চান্নায় আসিলে বিবাহের প্রস্তাব হইল, তিনি যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া, কমলাকান্তকে কন্যাদানে স্বীকৃত হইলেন, আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন! কন্যা সৎপাত্রে সমর্পিত হইবে ভাবিয়া ভট্টাচার্য্য ঠাকুরাণীর সুখের সীমা রহিল না। কমলাকান্তের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদস্পর্শ পূর্ব্বক বেহান বলিয়া সম্বোধন করিলেন। উভয়ের হৃদয়ের আনন্দ প্রবাহ, বদনে মৃদু-হাস্য রূপে নয়ন নদীতে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। খাদ্যদ্রব্যের আদান প্রদান চলিতে লাগিল। ক্রমে বিবাহের দিন স্থির হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ নিবাস লাকুড্ডীতে গিয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা কমলাকান্ত সময়ের সৌন্দর্য্য অবলম্বন করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। অঙ্গের সৌষ্ঠব অতসী কুসুমের ন্যায় দর্শনীয় হইয়াছে। বদন স্বভাবতই হাস্যময়, আঁখি যুগল প্রফুল্ল। হস্ত, পদ, বক্ষ, উরু সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের শুভদৃষ্টি পরিলক্ষিত হইতেছে।

বিবাহের পাত্র কন্যা সকলের দর্শনীয় হয়, তাহাতে কমলাকান্ত সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন, যাঁহার তাঁহার সহিত দেখা হয়, সেই তাঁহার বিবাহের কথা উল্লেখ করে। এত অল্প বয়সে সাধারণ লোক বিবাহের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু কমলা-কান্তের বয়স অল্প হইলেও তিনি জ্ঞান বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কিরূপ সময় উপস্থিত, তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। একদিকে সংসারের মায়াজাল তাঁহাকে বদ্ধ করিতে উদ্যত, অন্য দিকে মহামায়ার প্রসন্নময়ী মূর্তি, পরমানন্দ, প্রেম, তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। একদিকে সংসারের শোক, দুঃখ, অভাব, ব্যাধি তাঁহার দিকে কুৎসিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, অন্যদিকে তিনি দেখিতেছেন মুক্ত পুরুষগণ কালী নামামৃত পানে অনিত্য ধরা মণ্ডলে নিত্যের আবির্ভাব করিয়া নৃত্য করিতেছেন। কমলা-কান্তের মনপ্রাণ শেষোক্ত দিকে! সংসার কানন কণ্টকময় জানিয়াও প্রবেশ করিতে হইবে, না করিলে অধর্ম্ম আছে। মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বৈরাগ্য আনন্দ-কাননে প্রবেশ করিয়াও সুখী হইতে পারিবেন না, ইহাই বিশ্বাস। তিনি ভাবিলেন,—"মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরিয়া, হৃদয়ে অভয়া বরদাকে সর্ব্বদা রাখিয়া, সংসার কাননে প্রবেশ করিব, অভয়ার নিতান্ত শরণাপন্ন হইব, দেহ মন একেবারে তাঁহাকে সমর্পণ করিব, তথাপি যদি সংসার কাননের কণ্টকজাল দেহ স্পর্শ করিতে উদ্যত হয়, দয়াময়ীই তাহার ব্যবস্থা করিবেন।" আবার ভাবিলেন, "সংসার কি এতই কুৎসিত স্থল, কেবল মাত্র পাপের আবাস, কখনই নয়। সংসার দয়া দাক্ষিণ্য

প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণ সকলের প্রদর্শনী স্থল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রম, কর্ম্মকাণ্ড সেই আশ্রমের পুষ্প লতিকা, পুরুষ আশ্রমের রক্ষক, রমণী সেই আশ্রমের রস ও সলিল, পুণ্যই তাহার ফলপুষ্প। পত্নীর নাম সহধর্ম্মিণী। অর্থ ব্যতীত সংসার ধর্ম্ম হয় না, এ কথা সত্য, অর্থ ই দোষাকর তাহাও সত্য, অযথা অর্থের জন্য লালায়িত না হইয়া, সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন, সেই অর্থের উপযুক্ত ব্যয় করিয়া কি সংসার ধর্ম্ম হয় না?" আবার ভাবিলেন, "আমি মনের মত মন লইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে পারিব না। আমাকে অন্যের সহিত মন মিশাইয়া থাকিতে হইবে, আমার আমিত্ব থাকিবে কি!" আবার ভাবিলেন, "মাতৃ আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপাল্য। জগদম্বার মনে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে, আমাকে অবশ্য বিবাহ করিতে হইবে।" কমলাকান্তের বিবাহে সকলেই আনন্দিত, কেবল মাত্র বিষাদের ছায়া কমলাকান্তের বদনে মধ্যে মধ্যে পড়িতে লাগিল, তাহা তিনি অতি সাবধানে গোপন করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার জননী তাঁহার মুখের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন।

তাঁহার হৃদয়ের দুঃখের ছায়া মায়ের হৃদয় স্পর্শ করিলে তাঁহার প্রত্যবায় আছে। মাতৃ বাক্য অবশ্য প্রতিপাল্য। স্থির করিলেন তিনি সংসারী হইবেন। ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। আজ গাত্র-হরিদ্রা ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধান্ন। আনন্দ উৎসবের সীমা নাই। রজনী প্রভাত হইবা মাত্র ... গণের উলুধ্বনি, পক্ষীগণের কলধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া প্রতিবেশীদিগকে

সানন্দে জাগরিত করিল। গ্রামস্থ গণ্যমান্য সকলেই বিবাহের গৃহে আগমন করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদর ও আপ্যায়িত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহের ভার দিতে লাগিলেন। বিবাহে রমণীগণের আনন্দ উৎসাহ অধিক। অনেক স্ত্রীলোকের সমাগম হইল। কমলাকান্তের মাতা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত আহ্বান করিয়া "দেখ মা, কর মা" ইত্যাদি বাক্যে এ ঘর ও ঘর করিয়া গাত্র হরিদ্রার তত্ত্ব লাকুড্ডীতে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। লাকুড্ডী চান্না হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ। চান্না হইতে গাত্র হরিদ্রা লইয়া বধূর গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটীতে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ওগো মা লক্ষ্মীরা, তোমরা গোলমাল করিয়া আর সময় নষ্ট করিও না। শীঘ্র কমলের গাত্রে হরিদ্রা স্পর্শ করাইয়া হরিদ্রা দাও, আমি লাকুড্ডীতে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।" সাত জন এয়ো সাধকের অঙ্গে হরিদ্রা লেপন করিতে বসিলেন। সম্বন্ধ অনুসারে কেহ কপালে, কেহ মুখে, কেহ বক্ষ দেশে হরিদ্রা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন; মানুষ মাত্রেরই পরিহাস প্রিয়। বিশেষতঃ সময় ও সম্বন্ধ অনুকূল হইলে রমণীগণ পরিহাস পরিত্যাগ করিতে পারেন না। হরিদ্রা মর্দ্দন করিতে করিতে একজন রমণী বলিলেন,—"ঠাকুর পো, বাসরঘর বড় জম্‌কালো কর্ব্বে।" দ্বিতীয় কহিলেন,—"পার্ব্বেত, না তখন বোবা হয়ে থাক্‌বে।" তৃতীয় কহিলেন,—"আমার ঠাকুর পো মুখ খুল্লে আর কাওকেও গাম

কর্ত্তে হবে না, বিয়ের বাড়ী নাট মন্দির করে তুল্‌বে, পাড়ার মেয়েরা গান শুনতে দৌড়ে আস্‌বে।।" উঁহাদের মধ্যে বয়স্কা জনৈকা বলিলেন,—"দেখো ভাই গাঁয়ের নাম রেখো, কেবল মা মা! করে হবে না, টপ্পা গাইতে হবে, কই তোমার মুখে কখনও ত টপ্পা শুনি নাই, টপ্পা শিখেছ ত?" আর একজন কহিলেন,—"টপ্পা কি তোমাদের কাছে গাইবে, সময় পেলেই গাইবে। যে এত গান জানে, নিজে গান কর্ত্তে পারে সে কি টপ্পা জানে না, টপ্পা বেঁধে গাইবে, ওই দেখ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছে। বাসর ঘরে বউ দিদি পাশে বস্‌লে ঠাকুর পোর দিল খুলে যাবে, তখন ফুর্ত্তি দেখ্‌বে।" অন্য একজন কহিলেন,—"তোমরা ত দেখ্‌তে পাবে না।" সাধক রমণীগণের মনস্তুষ্টির জন্য একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কেন তোমরা ফুল সজ্জা দেখ্‌বে।" বামাগণ সকলে হাস্য করিয়া কহিলেন,—"দেখ্‌লে তোমাদের কাছেই এই, সেখানে না জানি কি কর্ব্বে।" বর্ষীয়সী কহিলেন,—"বেশ বলেছ দাদা, বেঁচে থাক।" এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"কি গো মাঁয়ারা! হ'ল, গায়ে হলুদ দেওয়া হ'ল, আমায় একটু হলুদ দাও, বেলা হয়ে গেল, লোক পাঠায়ে দি।" একজন স্ত্রীলোক একটু হলুদ আনিয়া দিলেন। সাধকের গাত্র হরিদ্রা শেষ হইল, তিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, যজ্ঞোপবীত, বস্ত্রাদির দিকে দৃষ্টি করিয়া ভাবিলেন, "রং না মাখিলে সং সাজা হয় না। সংসারে থাকিতে হইলে কত সং সাজিতে হইবে। পুত্র পরিবার, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, বন্ধু-বান্ধব, শত্রু মিত্র, প্রতিবেশীগণ

কত সং সাজিবে ও সাজাইবে। হাস্য, চিৎকার, ছুটাছুটি কত অভিনয়ের বশবর্ত্তী হইতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মায়ার পর্দ্দা দ্বারা চারিদিক বন্ধ করিয়া মা আমার পুরুষত্ব অভিমান ও অহঙ্কারের আলো জ্বালিয়া দিবেন। লীলাময়ী লীলা দেখিবেন, এ জীবনটা গোলমালেই কাটিয়া যাইবে। মায়ার পর্দ্দা কাটিয়া বাহিরে দাঁড়াইতে পারিব না। জ্ঞানের আলো আমার অন্তর্দৃষ্টিকে আহ্লাদিত করিবে না। নির্জ্জনে বসিয়া কৃপাময়ীর অনুপম রূপ ও পরমানন্দ ভোগ করিতে পারিব না। প্রলাপ গ্রস্ত রোগীর ন্যায় চারি দিকে বিচিত্র বর্ণের বীভৎস মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। হায়, হায়! মা? তাই কি আমাকে সংসারের প্রথম রং মাখাইলে, দেখি তোমার ইচ্ছা কি? নিতান্ত শরণাপন্ন কিঙ্করকে চরণে স্থান কি দিবে না! যদি না দাও, তবে কেন তোমাকে ভালবাসাইতে শিখাইলে?” ইহা ভাবিয়া সাধক বাহিরে আসিলেন বাস্তবিক সং সাজা। সর্বাঙ্গে গাত্র হরিদ্রা, যাতিগ্রহণ, দক্ষিণ হস্তে দূর্ব্বাসহ সূত্র-বন্ধন সংসারের বন্ধন সূচক, যাতিটী বিলাসের পরিচয়। বর্ত্তমান অপেক্ষা পূর্ব্বে পান সুপারি চর্ব্বণের প্রথা অধিক ছিল। শুভ্র দন্ত দরিদ্রের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহা ”শালুক খেয়ে দাঁত কাল, লোকে বলে আছে ভাল।” এই সাধারণ বচনে প্রতিপন্ন হয়। পান চিরকালই বিলাসের দ্রব্য মহাকবি তুলসীদাস পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন,—“হে শিবশঙ্কর, তুমি যদি আমাকে সংসারী কর, তাহা হইলে আমাকে “পান পুরাণ সোহাগিনী সঙ্গ, গোদ খেলায়ত সুন্দর বালা” দাও, যদি

না দাও, আমি চাহি না "দেহিমৃগছালা।" যদি আমাকে সংসারী কর, তবে আমাকে পুরাণ পান, সুন্দরী রমণী দাও, না দাও, আমাকে সন্ন্যাসী কর। এখনও উড়িষ্যা দেশে পুরুষ মাত্রেই পানের থলি কোমরে রাখিয়া থাকে। পান সুপারি চিরকালই বিলাসের দ্রব্য, বধুকে স্বামীগৃহে আসিয়া প্রথমে সুপারি কাটিয়া দিতে হয়, এ প্রথাও অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়।

সাধক বহির্দ্দেশে আসিবামাত্র সমবয়স্কগণ নবভাবে প্রিয় সম্ভাষণ করিল। কেহ বলিল,—বেশ সাজিয়াছ। তোমার মুখে সংসার পরিত্যাগের প্রশংসা সর্ব্বদা শুনিতে পাই। সন্ন্যাস বেশ, বড় ভাল। টোল পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন গেরুয়া বাস পরিত্যাগ কর নাই। এ তোমার উত্তম সন্ন্যাস বেশ। হরিদ্রাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—একি! ভস্ম লেপন বুঝি? যাঁতিটীকে ধরিয়া বলিল,—"এটী বুঝি ত্রিশূল?" দুর্ব্বাবন্ধনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, —"দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা বুঝি!" দ্বিতীয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বালাই, সন্ন্যাসী বেশ কেন, দেখ্‌ছনা, নটবর বেশ। সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন, যাঁতি নহে, মদন বাণ, অক্ষমালা নহে, ফুলশর। কাল মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হবে, পুরুষ প্রকৃতির মিলন হবে। সাধক হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"প্রকৃতিই পুরুষের বল। প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষের অস্তিত্ব অসম্ভব। পুরুষ প্রকৃতির বিকাশ মাত্র। প্রকৃতি হইতেই পুরুষের উৎপত্তি। সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে মহাশক্তি সম্পন্না যোগমায়া-রূপিণী প্রকৃতির সাকার রূপের নাম পুরুষ। তৃতীয় কহিলেন,—ভাই তোমার

কাল থেকে আর এ সকল বুজ্‌রুকী চল্‌বে না। এর পর তোমার মুখে নিশ্চয়ই অন্য কথা শুনতে পাবে। বিষয়, ব্যবসায়, জমী, জায়গা, অন্নবস্ত্র এই নিয়ে কত তর্ক বিতর্ক কত চিন্তা, কত কল্পনা কর্ত্তে হবে, তার জন্য প্রস্তুত হও! চতুর্থ বলিলেন,—"বিবাহ করলেই কি ইষ্ট চিন্তা পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে? এ কথা আমি স্বীকার করি না। সংসার প্রতিপালন করেও ইষ্ট চিন্তার সময় যথেষ্ট থাকে। সংসার চিন্তায় মনোসরোবরকে একবারে মলিন ও আবর্জ্জনা পূর্ণ না কর্লে, আমার বিশ্বাস, তাহাতে পরকালের সম্বল পুণ্য-শতদল জন্মিতে পারে, সৌরভে গৌরবে প্রস্ফুটিত কয় লোক সমাজকে সুখী কর্ত্তে পারে এবং পুণ্য-মার্জ্জিত আত্মা পরিণামে শ্রীহরিপাদ পদ্মে স্থান পেতে পারে।" প্রথম কহিলেন,—"পুণ্য কি সংসার ছাড়া, সৎকর্ম্মে মন থাক্‌লে সব হয়। সাধকের কাণের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—একি কাণের ভিতর হলুদের ঢেলা কেন?" তৃতীয় কহিলেন,—দাঁড়াও, এখনি কি, ছাল্‌না তলা পার হতে দাও, তবে বুঝ্‌তে পার্ব্বে বিবাহ কি শক্ত ব্যাপার। বড় বড় চাপড়, কাণ মলাতে বেদম করে ফেল্‌বে। সাধক হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বিবাহ কর্‌লেই নানা ঝঞ্ঝাটে পড়্‌তে হবে, কতই লাঞ্ছনা সইতে হবে, মেয়েরা ছাল্‌না তলাতেই তার নমুনা দেখিয়ে দেয়।

এদিকে অন্তঃপুর মধ্যে রমণীগণের গাত্রহরিদ্রা মর্দ্দনের হুলা-হুলি পড়িয়া গেল। তেল দাও, হলুদ দাও, মাখ মা, ভাল

করিয়া মাথ, ইত্যাদি বামাকণ্ঠস্বরে অন্তঃপুর মুখরিত হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে উলুধ্বনিতে অন্তঃপুর, বহির্মহল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎকালে হরিদ্রা মর্দ্দনের বিশেষ প্রচলন ছিল, এমন কি স্ত্রীলোকেরা যে ঘাটে স্নান করিতেন, সে ঘাটের জল ঘোর হরিদ্রাবর্ণ হইত। কাল বিশেষে রুচিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন আর নিত্য হরিদ্রা মর্দ্দনের প্রথা নাই। নৈমিত্তিক প্রথাও অতি সংক্ষেপে সম্পাদিত হয়, বিবাহাদি কর্ম্মে হরিদ্রা স্পর্শ করেন মাত্র। সধবার লক্ষণ সিন্দুর, তাহারও উপর বীতস্পৃহা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সধবাগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত সীমন্তে সিন্দুর গ্রহণ করিতেন। ললাট-গগনে সিন্দুর রেখা জবাকুসুম সন্নিভ প্রদোষ-কালিন সূর্য্যরশ্মির ন্যায় শোভা ধারণ করিত। এখন বামাগণ অনেকে সূচিকার অগ্রে সূক্ষ্ম ভাবে কপালে সিন্দুর গ্রহণ করেন। হরিদ্রা মর্দ্দনে ও সিন্দুর গ্রহণে অপ্রবৃত্তি কেন? আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। বামাগণকে সর্ব্বদা অন্তঃপুর মধ্যে থাকিতে হয় ও শরীর ঘর্ম্মাক্ত থাকে। হরিদ্রা দুর্গন্ধ নাশক ও চর্ম্মরোগ নিবারক, তাই হরিদ্রা মর্দ্দন প্রথা সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। সমাজ ও কাল পরিবর্ত্তন প্রিয়। অনেক স্থলে উত্তমের স্থান অধম ও অধমের স্থান উত্তম অধিকার করে। এখন যেমন স্ত্রীলোকেরা নিমন্ত্রণে কি অন্য কোন স্থানে যাইতে হইলে কেশ কলাপে আতর গোলাপ সুগন্ধ তৈলাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন তখন রমণীগণ স্থানান্তরে গমনের দিনে বেশী করিয়া হরিদ্রা মর্দ্দন করিতেন। সাধারণের মধ্যে

এই প্রথা অতি প্রবল ছিল, তাহা নিম্নলিখিত সাধারণ মধ্যে চলিত শ্লোকে অনুমিত হয়,—"তোদের হলুদ মাখা গা, তোরা রথ দেখ্‌তে যা। আমরা হলুদ কোথা পাব, আমরা উল্‌টা রথে যাব।" তখন মধ্যবর্ত্তী লোকের মধ্যে বিবাহে জলপান বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। জলপান বলিলে মুড়ী, মুড়কী, খই, লাড়ু, লুচি পর্য্যন্ত বোঝায়। এখনও অনেক স্থলে বিবাহে জলপান বিতরণের প্রথা আছে, কিন্তু খাদ্যের অভাবে ক্রমে এই প্রথা সমাজচ্যুত হইতে চলিয়াছে। কমলাকান্তের জননী মনের আহ্লাদে তৈল হরিদ্রা ও জলপান বিতরণ করিতে লাগিলেন, এইরূপ মহানন্দে গাত্র হরিদ্রা ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধান্নের দিন কাটিয়া গেল।

বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। সধবাগণ অতি প্রত্যূষে মাঙ্গলিক কলসী জলপূর্ণ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। সুখ-চিপিটক ভক্ষণের হুলাহুলি পড়িয়া গেল। রমণীগণ প্রতি গ্রাসে উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঊষা দেবী সুহাস্যে তাহাদের হাস্য উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গমগণ প্রত্যূষে তাহাদের উলুধ্বনির সহিত যোগ দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বাসা পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ চলিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরযাত্রীদিগের আহারের ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের সত্বর ব্যবস্থা করিতে ব্রতী হইলেন।

পল্লীগ্রামে মধ্যবর্ত্তী লোকের বিবাহে বরযাত্রীদিগের জন্য হস্তিযান, অশ্বযান, ও নরযানের ব্যবহার এখনও নাই, পূর্ব্বেও ছিল না। গোযানের প্রচলন ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানের মত নহে। এক্ষণে অনেকে পদব্রজে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হওয়া

অপমানের বিষয় বিবেচনা করেন। কাজেই বরকর্ত্তাকে বিস্তর গো-যানের সংগ্রহ করিতে হয়। তখন বালক, বৃদ্ধ, স্থবীর ও ও স্ত্রীলোক ব্যতীত কেহই গোযানে আরোহণ করিতেন না। গোযানে গমন কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। অনেকেই বলিষ্ঠ ও শ্রমসহিষ্ণু ছিলেন। খাদ্যের অভাব ছিল না, সকলেই পুষ্টিকর খাদ্য ও তৎপ্রসূত সংসারের সুখ শান্তি ভোগ করিতে পারিতেন। গ্রামান্তরে যাইতে হইলে অনেকে প্রবল রৌদ্রের সময় তাল পত্রের ছত্র পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতেন না, পথের সম্বল গাত্র মার্জ্জনী, পরিধান বস্ত্র ও কোন স্থলে একটী হুঁকা মাত্র লইতেন, ধূমপানের প্রচলন বর্ত্তমানের মতই ছিল, পথি মধ্যে গ্রাম পাইলে তামাক সেবন করিতেন। গ্রামবাসীরা যথেষ্ট সম্মানের সহিত ধূম পান করাইতেন এবং আগুন্তুকের সমুদয় পরিচয় লইতেন, স্নান ও আহারের সময় হইলে, অভ্যাগতকে স্নান আহার না করাইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিতে দিতেন না প্রায় সকল গ্রামেই ব্রাহ্মণের বাস ছিল। যে গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস না থাকিত, অন্য গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাস করান গ্রামবাসীরা আপন কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। যে গ্রামে কেবল মাত্র মুসলমানের বাস সেখানেও হিন্দুর জলগ্রহণ উপযুক্ত জাতির বাস থাকিত। সঙ্গতিশালী মুসলমান হিন্দু ভাইদিগের আহারাদির ব্যবস্থা ও সম্মান করিতে পারিবেন বলিয়া, উপযুক্ত বৃত্তি দিয়া হিন্দুদিগকে তাঁহাদের নিকট বাস করাইতেন। তখন দূরবর্ত্তী গ্রামে যাইতে হইলে কাহারেও অর্থ সম্বল লইয়া যাইতে

হইত না। হায়, হায় আজ বাঙ্গালায় সে ভাব নাই। গ্রামের মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তি দেখিলে "মহাশয় আপনার বাড়ী কোথায়, কোথায় যাইবেন" আর কেহই জিজ্ঞাসা করেন না, এমন কি স্থল বিশেষে কেহ কেহ তৃষ্ণাতুর জলপ্রার্থী পথিককে ইঙ্গিত দ্বারা পুষ্করিণী দেখাইয়া দেন, পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ দোষাবহ বিবেচনা করেন। সমাজের সহৃদয় ভাব যেন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিতেছে। হায়! বাঙ্গলা! কি জন্য তুমি তোমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের সরলতা ও উদারতা পরিত্যাগ করিতেছ। তুমি উদারতাকে আশ্রয় কর, উদারতা সুখ ও স্বাস্থ্যের মূল। তুমি উচ্চ, নীচ, দোষী, নির্দ্দোষী, নিঃস্ব, ধনাঢ্য, পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে প্রিয় সম্ভাষণ, অভিবাদন, সহাস্য বদনে আলাপ পরিচয় ও সহানুভূতি শিক্ষা দাও।

লাকুড্ডীতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী বিবাহের আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ। বহির্গৃহ সজ্জিত। গ্রামস্থ অনেক ভদ্রলোক ও সাধারণ সমাগত। বাহিরে কুমারীগণ "ওই বর আসছে" বলিয়া হুলাহুলি করিতেছে। অন্তর্হলে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সাধক কালীনাম ধ্যান করিতে করিতে নরযানে উপস্থিত হইলেন। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও কোলাহলের সীমা রহিল না। ছোট ছোট কুমারীগণ আসিয়া বলিল,—"তোমার জাঁতিখানি দিয়ে এই সুপারিটী কেটে দাও।" কেহ বলিল,—"একেবারে কাটতে হবে," কেহ বলিল,—"দেখ্‌বো কেমন জোর," কেহ বলিল,—"দেখো যেন হাত কাটে না।" সাধক

হয় না। শুদ্ধ মানব রাজত্বের এই নিয়ম নহে, বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-রাজত্বেরও এই নিয়ম। বিবাহে অঙ্গীকৃত বিষয়ের অন্যথা করিলে সাক্ষীর প্রয়োজন। বিষ্ণু, গঙ্গাজল, তুলসী, দর্ভময় ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে পরকালে সাক্ষী দিতে সক্ষম? তাই বিবাহে ইহাদের সম্মুখে অঙ্গীকার করান হয়। পবিত্রতার বিঘ্ন হইলে হিন্দুর কোন কর্ম্মই শাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন হয় না, সেই জন্যই বক্তগাংসময় ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি স্বরূপ কুশময় ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করা হয়। সাধক বয়সে যুবা হইলেও জ্ঞান বৃদ্ধ। বিষ্ণু, তুলসী, গঙ্গাজলের সম্মুখে অঙ্গীকার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন,—কি ঘোরতর বন্ধন! সমস্ত জীবনের ও পরকালের শক্তি সঞ্চারিণী রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে বসিয়াছি। যদি কামিনী আমার মনের অনুগামিনী না হয়, হায়! হায়! তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে। সন্ন্যাসীদত্ত মন্ত্র স্মরণ করিয়া দেখিলেন, সর্ব্ব কর্ম্ম বিধায়িনী প্রসন্নময়ী সর্ব্বমঙ্গলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। সাধক মনে মনে বলিলেন, —"মা তোমার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হক। অবগুণ্ঠনবতী হরিদ্রা রঞ্জিত নববস্ত্র পরিধানা কন্যা সমানীতা হইয়া বর পার্শ্বে স্থাপিতা হইল। কন্যাকর্ত্তা বরের জানু ধরিয়া সম্প্রদান মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থানান্তরিত হইলেন। পুরোহিত ব্রাহ্মণ "উৎবহস্ব, উৎবহামি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইয়া বিবাহ শেষ করিলেন। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের শক্তি অসীম, ব্রাহ্মণের সেই শক্তি ঋষি প্রণীত বাক্যের উপর। ঋষি প্রণীত ব্রাহ্মণ মুখ নিঃসৃত বাক্য সকল হিন্দু জীবনে অসীম

বল সম্পন্ন। জাত কর্ম্ম, অন্নপ্রাশন হইতে হিন্দুর ঊর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ সকল কর্ম্মের বিধান কর্ত্তা। ব্রাহ্মণের উচ্চারিত বাক্য সকল ভ্রম পূর্ণ ও দুর্ব্বোধ্য হইলেও কর্ম্ম সুসম্পাদিত হইয়াছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সে কর্ম্ম অসম্পাদিত আছে, ইহা কাহারও বলিবার ক্ষমতা নাই। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে কথিত আছে, ব্রাহ্মণ কুটিল, কদাচারী ও লোভী হইলেও তাহার অবমাননা করিওনা, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সম্মান করিবে, সেই অন্ত র্নিহিত শক্তি পুরুষ পরম্পরা প্রাপ্ত ও সমাজ প্রদত্ত।

বিবাহ শেষ হইল, শঙ্খধ্বনী ও স্ত্রী-আচার আরম্ভ হইল। বিবাহে স্ত্রী-আচার শীর্ষ স্থানীয়, বরের পক্ষে শঙ্কট স্থল। চড়টা চাপড়টা, কাণ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ হইল। সাধকের মুখে কথা নাই। মৌড় মস্তকে অবনত বদনে রমণী শাসন সুখে সহ্য করিতে লাগিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, রমণীর সহিত যুদ্ধে পুরুষ চিরকালই পরাস্ত, বলপ্রয়োগ করিলে কোন ফল হইবে না বরং উপদ্রব বাড়িবে, মশা কামড়াইলে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে হয়, হাত দিয়া তাড়াতাড়ি করিলে ঝাঁকে ঝাকে গায়ে আসিয়া বসে, এই ভাবিয়া গো মেষাদির গাত্র মর্দ্দনে যেরূপ তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়ায়, সাধকও তদ্রূপ ভাব অবলম্বন করিলেন। বরকন্যা বাসর গৃহে প্রবেশ করিল এবং তথায় তাহাদের জলযোগের ব্যবস্থা হইল। সাধক আজ রমণীগণ পরিবেষ্টিত। সকলেই সহাস্য বদন। প্রকৃতি মণ্ডলীর মুখাবরণ শিথিল, কাহারও বা অর্দ্ধাবগুণ্ঠন, তাহাও আনন্দে স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে। রমণীগণের হৃদয় নিঃসৃত

মধুর হাস্য, সুন্দর দশন রাজিব বিমল সৌন্দর্য্য, প্রভাত পদ্মের ন্যায় অধর ওষ্ঠের সুন্দর কান্তি, কুবলয়-নয়নের তরল জ্যোতি, বাসর গৃহের দীপালোককে ক্ষীণদীপ্তি করিয়া তুলিল। দাম্পত্য প্রেমই রমণী জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ধন। দাম্পত্য প্রেমে রমণী-জীবনের সমস্ত লীলাই স্থাপিত। দাম্পত্য প্রেমের সুগন্ধ পাইলে রমণী তাহা আঘ্রাণ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই বাসর গৃহে সম্বন্ধ অবিচারে অনেকেই সমাগত একজন প্রবীণা বাসরগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"একি বাসব যে চুপ, কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেই বরকন্যার দিকে চেয়ে আছে। বরকন্যা দেখে বুঝি সুখে বিভোর হয়েছে, আহা বেশ সেজেছে। একুশ বাইশ বৎসরের ছেলে, দশ এগার বৎসরের মেয়ে, দুইটী দেখ্‌তে ভাল—সমান মিলন, রাম সীতার মিলন হয়েছে। সাধককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"কি হে নাগর! মুচ্‌কী মুচ্‌কী হাস্‌ছ যে, শুধু হাস্‌লে হবে না, এই দিন চিরকাল মনে রাখ্‌তে হবে। আজ যাকে পাশে বসিয়েছ, ওকে চিরকাল প্রাণের অধিক ভাল বাস্‌তে হবে, তবেই সংসারে থেকে সুখ পাবে।" পার্শ্ববর্ত্তিনী কয়েকটী সোহাগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, —"ফিক্ ফিক্ করে হাস্‌ছিস কেন, রসিকতা জানিস না, ভবিষ্যুক্ত হয়ে বোসনা, রসের কথায় বাসর ভিজেয়ে দেনা, গান করে নাগরের মন দ্রব করে দে, তবে ত জানি বাসর জাগালি, কই বাসর রাখ্‌তে পারে এমন ত কারেও দেখ্‌ছি না। এখনও বুঝি অনেকের খাওয়া হয় নাই।" নবীনাদিগের মধ্যে একজন বলিলেন,

—"মূল গায়েন নইলে কি গান হয়, তুমি আগে আরম্ভ কর, বাসর জমকে নাও, তার পর আমাদিগকে ছেড়ে দেবে।" সাধক, সহাস্য বদনে ভাবিলেন, "মাতৃ-আজ্ঞায় আজ প্রকৃতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট। প্রকৃতির সম্মান রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জীবমাত্রেরই পরমাপ্রকৃতির ইচ্ছার বশীভূত, তাহার কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। করুণাময়ী সকলি তোমার ইচ্ছা, "বাজী-করের মেয়ে শ্যামা যেমনি নাচাও তেমনি নাচে" মা যেমনি নাচাবে তেমনি নাচ্‌বো।" এমন সময় কয়েকজন স্ত্রীলোক বাসরে প্রবেশ করিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া প্রবীণা কহিলেন, এই বাসরের লোক এসেছে। এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহারান্তে বাহিরে যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে বাসরের স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওগো মা লক্ষীরা, ছেলে মানুষ, অনেক দূর থেকে এসেছেন, সমস্ত রাত্রি জাগাইও না, বাবাজীকে একটু ঘুমুতে দিও।" প্রবীণা কহিলেন, 'মায়া বসেছে, কাল পরের ছেলে ছিল, আজ আপনার," রমণীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কিলো ছবির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বি নাকি, মুখ খোলনা।" একজন ঝি ছিল সে পারুক না পারুক সকল কাজেই অগ্রসর হইত, তারি উপর বাসরের মুখ খুলিবার ভার হইল। ঝি বলিবা-মাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিল।—

"সুখের দিনে, সুখের মেলন, দেখ্‌না তোরা নয়ন ভরে,
ফুটলো পদ্ম এলো ভ্রমর, "ভেঁা ভেঁা করে বসলো ধায়ে

সাধক কমলাকান্ত

মধু খেতে বড় সাধ—লোকের বাতাস সাধ্লে বান,

চাবি থারে ঘুরে বেড়ায় সবে খেতে মন না সরে ॥

ঝির স্বরটা তেমন মিষ্ট ছিল না, কিন্তু সে জানিত সে বেশ গাইতে পারে। তাহার গান শুনিয়া সকলেই হাসিল, সাধকও হাসিলেন কিন্তু অদৃশ্যভাবে। তিনি উপহাস ও কৌতুক ছলেও কাহারও মনে কষ্ট দিতেন না কারণ তিনি জানিতেন জীবমাত্রেই বিশ্বজননীর প্রতিকৃতি। ঝি সকলের হাস্য দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "এ গান আমি বড় বাসবে ভাল লোকের মুখে শুনেছি, তোমরা গাওনা, কে কত গাইয়ে, হা কল্লেই টের পাওয়া যাবে।" পার্শ্ববর্ত্তিনী জনৈক স্ত্রীলোকের পানে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তোমার হাসিটা বড় চট্‌চটে, যেমন তপ্ত খোলায় খই। গাও না দেখি বাহাদুরী। যারা কর্ম্মে কুড়ে, তারাই কাজের লোকের কাজে ছন্দ ধরে।" প্রবীণা বলিলেন, "ঝি রাগ করো না, এ হাসি খুসীর জায়গা, তুমিত বাসরের মুখ খুলেছ, তোমারি বাহাদুরী।" রমণীরা এ উহাকে প্রথম গান করিতে উপরোধ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে একে একে গান আরম্ভ করিলেন। বামাকণ্ঠ বীণাধ্বনিকে পরাজয় পূর্ব্বক গৃহদ্বার দিয়া বাহির হইয়া অধিকতর সুমিষ্টভাবে অন্দর মহল সংলগ্ন রাত্রি জাগরণ ক্লান্ত লোকদিগের কর্ণকুহর শীতল করিতে লাগিল। সাধক ভাবিলেন, প্রকৃতি মণ্ডলীর স্বর এত সুমধুর কেন। তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোমল, অন্তর সরল, তাই কি কারণ। মা ত আমার পরমা-প্রকৃতি, নাজানি তাঁহার অন্তর কতই সরল, কতই স্নেহের আধার,

মা না হলে ব্রহ্মাণ্ডের লোকের কি মা হতে পারেন! মা হওয়া কি মুখের কথা, মায়ের মত মা না হ'লে লোকে মা বলে ডাকবে কেন? আমার বিশ্বজননীর যদি এত গুণ না থাকিত তাহা হইলে লোকে শোকের সময়, দুঃখের সময়, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়াও, তাহাকে ভাবিয়া কাতর নয়নে তাঁহার দিকে চাহিত না। মা দেখা সহজে দেন না সত্য, কিন্তু যে সন্তান মুখে কাপড় দিয়া মায়ের জন্য কাঁদে, গোপনে চক্ষের জল ফেলে, প্রাণের যন্ত্রণা জানায়, মা তার সকল জ্বালা নিবারণ করেন, সে যা চায় তাই দেন, তাহাতেও যদি না ভোলে শেষে দেখা দিয়া সব জ্বালা নিবারণ করিয়া দেন। সাধকের উপর সঙ্গীতের উপরোধ চলিতে লাগিল, সাধক গাহিলেন,—

তোমারি কারণে স'পিলাম যৌবন জীবন প্রাণ।
রমণী রতন তুমি প্রেমিকা সুজন॥
কঠিন হৃদয় যার, সদাই চাতুরী তার,
চিরদিন নাহি রয় কুজনে মিলন।
প্রেমিকার এই গুণ নব রস প্রতিদিন,
কখনও না রস হইবে পুরাতন॥

সকলে গান শুনিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। অমিয় তুল্য সুমিষ্ট স্বর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়া সকলের হৃদয়কে কি এক অপূর্ব্ব রসে আপ্লুত করিল, সুখ স্রোত শরীরের প্রত্যেক ধমনী ও শিরাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সঙ্গীত শেষে কেহ কেহ তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া আহ্লাদের সহিত কি ভাবিতে লাগিলেন,

কেহ কেহ সাধক পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "গান শুনে পেট ভরে যাবে, সুখ যে কেমন, তা জান্‌বি না।" প্রবীণা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাক দাদা, বেশ গেয়েছ।" পুনশ্চ গান করিবার জন্য উপরোধ চলিতে লাগিল, সাধক গাহিলেন,—

সাধ করে পীরিতি করিতে,
যদি মিলন হয় সুজন সহিতে সই॥
আমার যেমন মন সে যদি হয় তেমন
কি আর অধিক সুখ সে সুখ হইতে।
কি ক্ষণে হেরিলাম রূপ, সুধাময় রস কূপ,
সেই হইতে প্রাণ কাঁদে তাহারে দেখিতে॥
কমলাকান্তের যদি আনিয়া মিলায় বিধি
সেরূপ লাবণ্য নিধি হৃদয়ে রাখিতে॥

সকলে বলিলেন, "বেশ গান।" বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি তোমার বাঁধা।" সাধক বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, "প্রবীণা বলিলেন, "এরূপ কত গান বাঁধ্‌তে পার, "সাধক বলিলেন, "যত গুলি চান।" বৃদ্ধা রমণীদিগকে বলিলেন, "ওলো! তোরা পার্ব্বিনে, তোরা গান করিস না, গান শোন।" সাধকের উপর পুনশ্চ গান করিবার উপরোধ চলিতে লাগিল, এইরূপে বাসর-রাত্রি জাগরণে কাটিয়া গেল।

অনেকেরই জাগরণেই বিবাহরাত্রি অতিবাহিত হইল। চান্নাকুড়ীর ভট্টাচার্য্য মহাশয় শয্যাগ্রহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে

বিহগগণের কলধ্বনি সহ শয্যাত্যাগ করিলেন। জাগরণ বশতঃ শরীর সন্তপ্ত, সুখস্পর্শ প্রভাত বায়ু অতি বড় মনোহর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কন্যাদায় হইতে মুক্ত, মন প্রসন্ন, কাককলরবও তাঁহার কর্ণে কঠোর বলিয়া অনুমিত হইল না। যেমন জীবন-রাজ্যে বাল্যকাল সুশোভিত কুসুম উদ্যান, যৌবন জনাকীর্ণ জনপদ, বার্দ্ধক্য বিজন প্রান্তর কিম্বা শ্মশান, দিন-জীবনের প্রভাত ও সেইরূপ। আত্মা ও মনের প্রসন্নতা, পবিত্রতা, মনমন্দির দেহের স্বচ্ছন্দতা প্রভাবেই অনুভব হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিশির শয়নে দুর্ব্বাদলের বিমল ভাব, কুসুম কলাপের বিকাশ ও বিশুদ্ধ ভাব সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশে অরুণের ছটা ভুবন আলোকিত করিয়া উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া বৈঠকগৃহে আগমন পূর্ব্বক বরযাত্রীদিগের প্রভাত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালে চা পানের প্রচলন ছিলনা, সময়ের গুণে কন্যাকর্ত্তাকে সে উপদ্রব সহ্য করিতে হইল না, প্রথা অনুসারে বিবাহের পরদিন বরযাত্রী-গণ কন্যাকর্ত্তার গৃহে অবস্থান করিতেন। যে স্থলে কন্যা কর্ত্তা বরযাত্রীদিগকে বিবাহের পরদিন দিবসে অন্ন ও রাত্রে ঘৃতপক্কান্ন ভোজন করাইতে না পারিতেন, তিনি সমাজে দীন বা কৃপণ বলিয়া ঘৃণ্য হইতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিবাহের পরদিন বর-যাত্রীদিগের উপদ্রব সহ্য করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের উপদ্রব অসংখ্য ছিল, সেই জন্য পূর্ব্ব প্রচলিত কথা আছে, "বরের বালাই

বরযাত্রী" যাহা হউক, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগের তাম্রকূট, পান ও জলযোগাদির ব্যবস্থা করিয়া কুশণ্ডিকা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ বিবাহে কুশণ্ডিকা এক বিরাট ব্যাপার। অগ্নিহোত্র স্থাপন, বহ্নির উপাসনা, সহধর্ম্মিণীর আজীবন অগ্নিহোত্র রক্ষার অঙ্গীকার ইত্যাদি কুশণ্ডিকার অঙ্গ। সহধর্ম্মিণীকে আজীবন সমুদয় ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যে কর্ম্মে নিরন্তর ব্রতী হইতে হইবে, তাহারি প্রথম অভিনয়। ত্যাগশীল না হইলে কেহই জগতের উপকার করিতে পারেন না ও লোক সমাজে পূজনীয় হইতে পারেন না। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বলোক হিতার্থে অধ্যয়ন, যজন, যাজন প্রভৃতি ক্রিয়ায় ব্রতী থাকিতেন, সেই জন্য তাঁহারা শীর্ষস্থানীয় ও পূজনীয়। তাঁহারা সকল বর্ণের হিতাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিশীল ছিলেন, তাই তাঁহারা দেবতার ন্যায় পূজনীয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা অরণ্যবাস পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম ও নগর মধ্যে বাস করিলেও ভূসম্পত্তি রাখিতেন না, দুগ্ধ ও হবির জন্য ধেনু, বৎস প্রতিপালন করিতেন, যাজন ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, ধন সঞ্চয়ে বীতভৃষ্ণ ছিলেন, স্বার্থ প্রসূত লোক সমাজের ঈর্ষা তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইত না, সে কারণে কেহই তাঁহাদিগের হিংসা কি ঈর্ষা করিতেন না, পরন্তু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া সকল বর্ণই তাঁহাদিগের পদানত থাকিতেন। ব্রাহ্মণগণ বহুগুণশালী ছিলেন বলিয়া সমাজ-বন্ধনের প্রথম হইতে আপনাদের ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম মহাবৃক্ষের উপর কতই কুঠারাঘাত, কতই বজ্রাঘাত চলিয়াছে,

কিন্তু উহার অন্তর্নিনিবদ্ধ পবিত্র রস মহাশক্তিসম্পন্ন, মূল সকল সত্যরূপ, সরস ও দৃঢ় ভূমিবদ্ধ অতএব উহা সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। কাল কাহাকেও সমান ভাবে থাকিতে দেয় না, রূপান্তর কালের অনিবার্য্য নিয়ম। কালের প্রভাবে প্রকৃত ব্রাহ্মণধর্ম্মে রূপান্তর ঘটিতেছে, ব্রাহ্মণদিগের শৈথিল্য বশতঃ কালে ইহার কি অবস্থা ঘটিবে কে বলিতে পারে। যতদিন বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রচলন থাকিবে, ততদিন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ হইবে না। হোম ও যজ্ঞ বৈদিক ক্রিয়ার অঙ্গ, কেবলমাত্র অগ্নির উপাসনা হোমের উদ্দেশ্য নহে। আহুতি প্রদানে বায়ু নির্দ্দোষ হয়, বায়ু নির্দ্দোষে সলিল প্রসন্ন ও নির্দ্দোষ হয়, ভেষজ সকল দূষিত হয় না, সংক্রামক ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয় যায়। যেস্থানে হোমাগ্নি প্রজ্জলিত হয় সে স্থান বিষদোষ দুষ্ট হইলেও বিশুদ্ধ হয়। ঋষিগণ বলিয়াছেন, হবির্গন্ধ ও গোময় সর্ব্ববিষ নাশক, হিন্দুর গৃহে কোন স্থান কলুষিত হইলে গোময় উপলিপ্ত হয়। কোন কোন স্থলে গোবর দেওয়ার প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা দেখা যায় না, বড় দুঃখের বিষয়। পূর্ব্বে অনেক গৃহেই প্রায়ই হোমক্রিয়া হইত, এখন সে প্রথাও শিথিল হইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণের হোমাগ্নি আর সহ্য হয় না। পূর্ব্বে হোমাগ্নি বেষ্টন পূর্ব্বক বসিয়া কর্ম্মকর্ত্তা আত্মীয় স্বজন সহ হবিগন্ধ গ্রহণ করিতেন, এখন সে হোমাগ্নও নাই, হবির্ধূমও সহ্য হয় না। কৃতদার ব্রাহ্মণ মাত্রেরই বোধ হয় স্মরণ আছে, বিবাহের সময় কুশণ্ডিকায় কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়। আজ সাধক সহ-

"জগন্মাত-শিবাভির্ঘোরাবার্ত্তি চতুর্দ্দিক্ষুসমন্বিতা" মা প্রকৃতিময়ী তোমার অনুপমরূপ রজনী, দিবস তোমার প্রচণ্ড রূপ। এই রজনীতে কি অপূর্ব্ব কৌশলে, কি বশীকরণ মন্ত্রে দিবসের প্রচণ্ড, উন্মাদগ্রস্ত অবনীকে শবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে শায়িত করিয়াছ, দিবসের উজ্জ্বল রূপের পরিবর্ত্তে তোমার নবজলধর রূপ ঢালিয়া দিয়াছ। এই অন্ধকারকে সাজাইতে তোমার ত্রুটী দেখিতেছি না। নক্ষত্র মণ্ডিত নীল কলেবর নভোমণ্ডলের জ্যোতি অতি মৃদুভাবে অবনী মণ্ডলের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর ন্যায় প্রদর্শন করাইতেছ। যামিনী কুসুম সকল তাহাদের শরীরের সুগন্ধ চারিদিকে বিস্তার করিতেছে। নিশাচর পশু পক্ষিগণের শব্দ তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, খদ্যোতকুল কণ্ঠাভরণ, কর্ণভূষণ। মা! তোমার খেলা নিশি দিনে সমান। আজ কোথায় আমাকে শ্মশান কোলে নির্জ্জনে তোমার চিন্তায় বসাইবে, না প্রকৃতি কোলে নরযানে বসাইয়া শিবাগণের মুখ নিঃসৃত অগ্নিরূপ অট্টহাস্য দেখাইতেছ, একি পরীক্ষা, পরীক্ষা কি মা! তুমি ত আমার মন, তবে আর পরীক্ষা কি? তোমার পরীক্ষা তুমিই কর। এমন সময় দেখিলেন, বধুর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, মৃদুস্বরে কাঁদিতেছেন, সাধক কহিলেন, "কাঁদছ কেন? আপনার লোককে দেখতে পাও নাই! মা বাপকে দেখতে পাও নাই! পরে জানবে আমি তোমার বড় একটা পর নই। ওই দেখ তোমাদের গ্রামের বেহারারা তোমার সঙ্গে যাচ্ছে।" সাধক ভাবিলেন, সুখের গৃহ, সুখের পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা একজন

অপরিচিত পুরুষের পার্শ্বে, বধূর উদ্‌বেগের প্রচুর কারণ আছে। সাধক মনে মনে হাস্য করিয়া কহিলেন, "জগন্মাত! অপরিচিত পুরুষের সহিত অপরিচিতা কুমারীর মিলন ও ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় প্রেমের আবির্ভাব, দ্বন্দ্বরূপে বিরাজ, সংসারময় তাহাদের বিচিত্র লীলা, সংসার প্রদর্শনী ক্ষেত্রে তোমার এই চিত্রটী অতি দর্শনীয়।

এখানে চান্নায় সাধকগৃহে আজ পাকস্পর্শ। মাতুল মহাশয় আত্মীয় স্বজন, গ্রামবাসী দিগের মধ্যাহ্ন ভোজনের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। গৃহ লোকাকীর্ণ। প্রাঙ্গণে চুল্লীতে বড় বড় রন্ধন পাত্র, অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইতেছে। সূপকার্য্যে দক্ষ ব্রাহ্মণগণ হুঁকা হস্তে ধূম পান করিতে করিতে রন্ধন পাত্রে জল লবণাদি দিতেছেন। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে প্রচুর পরিমাণে ব্যঞ্জন সামগ্রী, প্রৌঢ়া রমণীগণ সে সকল রন্ধনের উপযোগী করিতেছেন। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে বড় বড় মৎস্য। রন্ধনের জন্য সে সকলের সংস্কার চলিতেছে। সাধক জননী নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্নের সংবাদ পাইয়াছেন, এখন তাঁহার মন চান্না ও লাকুড্ডার পথে থাকিলেও সকলের সম্ভাষণে ও দ্রব্যাদির নির্দ্দেশে অপরিসীম পরিশ্রম করিতেছেন, কুমারীগণ সুসজ্জিত হইয়া বর কন্যার আগমন প্রতীক্ষায় হাস্যমুখে একবার বহির্দ্দেশে একবার অন্দর মহলে আসিতেছেন। ক্রমে বর কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাঙ্গলিক উলুধ্বনিতে সমগ্র গ্রাম উল্লাসিত হইয়া উঠিল। লাজ বর্ষণ ও হুলাহুলির সীমা রহিল না। সাধক সস্ত্রীক এক বন্ধনে গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহের অসংখ্য বন্ধন। দাম্পত্য বন্ধন

ছিন্ন হইলে প্রায় সকল বন্ধন শিথিল হইয়া আইসে, তবে রিপুদড়ী গুলা সহজে আল্‌গা হয় না, সে গুলার আঁশ পাতলা নয়, বহু দিন ধরিয়া টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়ী করিতে হয়। গ্রীষ্মকালের প্রবল ঝড়ের মত মনের উন্মত্ত ভাব হওয়া চাই তবে যদি একটা আধটা দড়ী ছিড়িতে পারে, "লক্ষে দুটো একটা কাটে হেসে দেন মা হাত চাপুড়ী" পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ও কৃপাময়ীর কৃপা ব্যতীত সে দড়ী কাটা অসম্ভব। সাধক জননী পুত্র ও বধূকে একাসনে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। দীর্ঘজীবি, পুত্রবান ও সংসারী হও বলিয়া নয়ন জলে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন. সাধকও জননীর পাদস্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার ইচ্ছার অন্যথাচরণ করিতে না হয়।" সে দিন মহানন্দে ও কোলাহলে অতি বাহিত হইল। ফুলসজ্জা, অন্যান্য বিষয়ও আনন্দে শেষ হইল।

বিবাহের পর সাধক মাতৃ আজ্ঞায় সমস্ত দিন গৃহকর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করেন। "হাতে কর গৃহ কর্ম্ম, মুখে বল রাম," পরমার্থ চিন্তা তাঁহাকে মুহূর্ত্তকাল ত্যাগ করিল না। সেই বয়সেই তিনি শরীর মন চিন্ময়ীকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কৃত কর্ম্মের কর্ত্তা আমি, একথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

তৃতীয় অংশ।

সাধকের দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে সঙ্গীত ও কালনায় তাঁহার ধনাঢ্য শিষ্যের সংসারিক ব্যয়ভার গ্রহণের অঙ্গীকার।

সাধব সন্ধ্যার পর গ্রামস্থ একটী সঙ্গীত সমাজে যান। তথায় তাল মান লয় বিবিধ যন্ত্রের সহিত সা, রে, গা, মার ছড়াছড়ি চলে। কত হাস্য পরিহাস কৌতুক চলে। সকলেই বিদ্বান্ হইব, প্রতিপত্তি লাভ করিব, আপনার সুখ্যাতি শুনিয়া প্রাণ জুড়াইব ইত্যাদি বাসনায় উৎসাহিত, কিন্তু সাধকের মনের অবস্থা অন্যরূপ। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার গরীব মন তাঁহার কাছেই থাকিবে, হৃদয় ছাড়িয়া কোথায়ও যাইবে না, হৃদপদ্মালয়া পরমা প্রকৃতির উপাসনায়, সংসারের মঙ্গল চিন্তায় রত হইবে, তাঁহার নাম জপিবে, নামে রূপে এক করিয়া পরমানন্দময়ীর পরমানন্দের ভাগী হইবে। পরমানন্দের বিঘ্ন হইলে মাতৃস্তন্য পিপাসু শিশুর ন্যায় কাঁদিবে। কাজেই তত্রস্থ অন্যান্য গায়কগণের সহিত তাঁহার মন মিশিল না। "অনেক মানুষ মিলে মন মিলে না," মনের মানুষ পাওয়া বড় কঠিন। আমি বড় বক্তা; আমি বড় বিদ্বান, আমি বড় ধনী, আমি বড়

কর্ম্মী, আমি বড় গায়ক ইত্যাদি শব্দে সংসারকে কোলাহল পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ধ্যান, ধারণা ও শান্তি সেইরূপ অভিমান পূর্ণ মানবের সহবাসে অসম্ভব। তাহাদের সহবাসে সংসারের বিবিধ পিপাসা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে, ক্রমে ঘোর পিপাসা যুক্ত বিকারগ্রস্ত মানবের ন্যায় জিহ্বা বিস্তার করিয়া স্থির নেত্রে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইবে। কাজেই তিনি সাধু সহবাস সন্ধান করিতে লাগিলেন। যাহারা সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, যশ, অপযশ, এক বস্তুতে সমর্পণ করিয়া মনের আনন্দে বসিয়া আছেন, এরূপ সহবাস সন্ধান করিতে লাগিলেন। "যস্ত ভাবনা যাদৃশী, সিদ্ধির্ভবতু তাদৃশী।" চান্না গ্রামের প্রান্তস্থিত খড়ী নদীর তীরবর্ত্তী দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির মনে পড়িল, সেখানে অনেক সাধু অতিথির সমাগম হয়, সন্ধ্যার পর নিত্যই পরমার্থ সঙ্গীত হইয়া থাকে। খড়ী একটী উপনদী। সাধক বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে এই খড়ী নদীর তীরে বহুস্থানে, বহুভাবে বাস ও ক্রীড়া করিয়া ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার কোটা মানকর প্রভৃতি গ্রামের উত্তর দিকস্থিত বনভূমির জল প্রবাহ লইয়া খড়ী নদীর অবয়ব পুষ্ট হইয়াছে। খড়ী নদী প্রশস্ত শস্যক্ষেত্রের সলিল রাশি গ্রহণ করিয়া বিবিধ বক্রগতিতে কাটোয়ার নিকট পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। খড়ী নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি মূলক ইতিহাস আছে। কথিত আছে মাড়ো নামক গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাড়োগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মানকরের সন্নিকট। মাড়ো পুণ্যক্ষেত্র, তথায় কীর্ত্তন পদাবলি রচয়িতা বৈষ্ণব কবি

শশীশেখর ও রাম রসায়ন প্রণেতা পণ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা শশীশেখরের কীর্ত্তন পদ সকল বঙ্গবাসীর কর্ণ কুহর চিরকালই পরিতৃপ্ত করিবে। পণ্ডিত রঘুনন্দনের রাম রসায়ন অমৃত তুল্য। মাড়ো গ্রামস্থ ঐ ব্রাহ্মণের দুই পত্নীছিল। প্রথমা গৃহিণী গুণসম্পন্না হইলেও রূপ যৌবন অভাবে তমোগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের প্রণয় ভাজন হইতে পারেন নাই, অতএব সপত্নী দ্বারা অনেক সময় লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হইতেন। পতি প্রতিকূল থাকায় সপত্নীর সহিত একত্র অবস্থানের উপায় না দেখিয়া প্রথমার সংসারে ঔদাস্য ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের পৈতৃক শ্যামা পূজাছিল ও পূজার জন্য একটী ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। ঐ শ্যামাগৃহের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী; বর্ষার সময় গ্রামের উত্তর প্রান্তস্থিত বনভূমির জলরাশি সেই পুষ্করিণী প্লাবিত করিয়া মাঠে পড়িত। প্রথমাপত্নী মনোকষ্টে সেই শ্যামাগৃহে অবস্থান করিতেন, ক্রমে তাঁহার বৈরাগ্য ও ভক্তি গভীর হইল, তিনি ভৈরবী বেশ ধারণ করিলেন, এবং একটী শ্যামা প্রতিমা সেই গৃহে সংস্থাপন করিয়া দেবীর ধ্যান ও পূজায় নিরত হইলেন। প্রতিবেশীগণের মধ্যে তাঁহার সুখ্যাতি ও ভক্তির নানা প্রসঙ্গ উঠিতে লাগিল, সপত্নী ও পতির নির্য্যাতনও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তাহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য কঠোর বাক্যে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও সপত্নীর অত্যাচার ও তিরস্কার ক্রমে উচ্চ ও অসহ্য সীমায় উঠিল। একদিন সাধ্বী রমণী কয়েকজন প্রতিবাসীর সমক্ষে লাঞ্ছিত হইয়া

"এই আমি চলিলাম", বলিয়া দেবীর হস্তস্থিত খড়্গ খুলিয়া লইয়া নিজের জিহ্বা ছেদন করিলেন, পূজাপাত্রে রক্তধারণ করিয়া তদ্বারা দেবীর উপাসনা পূর্ব্বক খড়্গ হস্তে উন্মাদিনীর ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে দ্রুতবেগে গৃহের বাহির হইয়া সেই ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। সতী অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র পুষ্করিণীর জল ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরম সৌভাগ্যশালিনী ভক্তির মূর্ত্তিমতী ব্রাহ্মণ পত্নী দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও বামহস্তে ত্রিশূল উত্তোলন পূর্ব্বক জলে ভাসিতে লাগিলেন। পুষ্করিণীর জল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গ্রামবাসীগণ এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ত্বরিৎ বেগে পুষ্করিণীর নিকট আসিয়া অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিতে লাগিল। ক্রমে পুষ্করিণীর জল বৃদ্ধি পাইয়া তীব্র বেগে মাঠে পতিত হইল, তত্রস্থ ক্ষুদ্র জলনালীকে দশগুণ প্রশস্ত করিয়া খরতর বেগে চলিতে লাগিল। পুণ্য স্বরূপা ব্রাহ্মণ পত্নী সেই খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক ভাসিতে ভাসিতে স্রোতের সহিত চলিতে লাগিলেন। যে স্থান দিয়া সেই স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল সেই স্থান নদীরূপে পরিণত হইল। প্রবাদ আছে এই কারণে এই নদীর নাম খড়্গেশ্বরী বা খড়ী।

খড়্গেশ্বরী স্থানে স্থানে অতি গভীর। অশ্বত্থ, বট, অর্জ্জুন প্রভৃতি বনস্পতি ও বিশাল বৃক্ষ সকল তাহার উভয় কূলে বর্ত্তমান। সেই সকল বৃক্ষের হরিৎবর্ণ পত্র সকল পবন হিল্লোলে আকাশের কোলে নৃত্য করিয়া দূর হইতে খড়্গেশ্বরীর অবস্থানের পরিচয় দেয়। তাহার স্থানে স্থানে বেতসীকুঞ্জ বন কুসুম মণ্ডিত, মধুপ-

গুঞ্জার ও সৌরভ সংযুক্ত। তাহার কূলে শীতল সলিল সেবিত সৌরভ-সংযুক্ত ধীর সমীর-সেবন, পরিশ্রম পীড়িত কৃষক ও রাখালের ভাগ্যেই অনেক সময় ঘটিয়া থাকে। কৃষকগণ বসন্তে ও গ্রীষ্মে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম পূর্ব্বক সেই সকল স্থানে আসিয়া শ্রম লাঘব করে, অঞ্জলি অঞ্জলি খড়্গেশ্বরীর জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়।

দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির খড়ী নদীর কূলে সংস্থাপিত। স্থানটী অতি মনোরম, বনস্পতিগণ পরিশোভিত। স্থানে স্থানে স্বভাবজাত ব্রততী পুঞ্জ, প্রকৃতির গৌরবে খড়্গেশ্বরীর জলরাশি চুম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে! মন্দিরের অনতিদূরে গ্রামের শ্মশান। দেবীর মন্দিরে একজন ত্যাগী পুরুষ অবস্থান করেন। মধ্যে মধ্যে অতিথি ও সন্ন্যাসীগণ আসেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অনেক লোক সমাগত হয়। সকলে দেবীর গুণানুকীর্ত্তনে দিন সার্থক করেন। সকল পার্ব্বণে দেবীর মন্দিরে সমারোহ হইত, নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের ভক্ত ও প্রবীণ অনেক লোক সমাগত হইতেন। সাধক গ্রামের বিবিধ বাদ্য প্রতিধ্বনিত, বিলাস বিজড়িত, আশা ও অহঙ্কারের অট্টহাস্য পরিপূর্ণ সঙ্গীতগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীণ-বাদ্য সংযুক্ত প্রেম ও ভক্তি পরিপূর্ণ, হৃদয় উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত, সুমধুর কণ্ঠনিনাদিত দেবীর মন্দির সংলগ্ন ক্ষুদ্র সঙ্গীতালয়ে যোগ দিলেন। সাধকের কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর, কৃতিত্বও বিস্তর, কাজেই তাঁহার বয়স নবীন হইলেও তত্রস্থ গায়কগণের অধিকারী হইলেন। সাধক যাঁহার ধ্যানে সর্ব্বদা বিভোর, শব্দে ও বর্ণে যাঁহার শক্তি

ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাননা, তাঁহার সমক্ষে তাঁহার গুণানু-কীর্ত্তনে সাধকের আনন্দ উচ্ছাস দশগুণ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। নূতন ভাবে, নূতন ভাষায়, অহংকার শূন্য হৃদয় নিঃসৃত স্বরচিত সঙ্গীতে সমাগত জনসমূহকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর দেবীর মন্দিরে গ্রামবাসীগণের সমাগম সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রবীণ ও ধার্ম্মিক লোক সকলও ভক্তিরসপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ পিপাসায় পথক্লেশ ভুলিয়া পুণ্যাহ বিশেষে ও পার্ব্বণে দেবীর মন্দিরে সমাগত হইতে লাগিলেন। কমলাকান্ত গায়ক ও সাধক, তাঁহার রচিত পদ সকল বিমল ও ভক্তি পূর্ণ, তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ ইত্যাদি তাঁহার সুনাম সত্বর প্রচারিত হইতে লাগিল।

সংসার কি একটা বিচিত্র জিনিস: টানাটানি, হাঁচড়া হেঁচড়ী, মারামারী, কাঁদাকাঁদী কেমন একটা তাহার স্বভাব। কাহারও নিশ্চিন্তে নির্ব্বিঘ্নে, নির্ব্বিবাদে থাকিবার অধিকার নাই। যদি ভাগ্যক্রমে কখন উদারতা ও ঔদাস্য প্রযুক্ত একটু মনের আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি একটা বীভৎস ব্যাপার আসিয়া মনের চক্ষে নৃত্য করিতে থাকে, তাহাতেও যদি মেধাবী মানব দৃষ্টিপাত না করে, মায়া আসিয়া তাহার মনকে টানাটানি করিতে থাকে। সে কখন পত্নী, কখন পিতা মাতা,—কখন পুত্র কন্যা হইয়া কত ভঙ্গি করিয়া তাহার কাছে আসিয়া তাহার চক্ষু উন্মিলিত করায়, তাহাদের দিকে নিরীক্ষণ করায় ও সুখ শান্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। শুধু সংযম ব্যতীত তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া

বড় সুকঠিন। তাই দেখা যায়, শ্যাম ও কুল দুই রাখা বড় কঠিন। সংসারের ঐশ্বর্য্য সম্পদ, বিষয় ভোগ ও অহঙ্কারের পথ একদিকে, বৈরাগ্যের পথ অন্যদিকে। এক পথের সঙ্গী পত্নী পুত্র, পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, ধন পিপাসা। অন্য পথের সঙ্গী প্রেমানুরাগ, প্রেমালাপ। লক্ষ্য প্রেমানন্দ স্বজনের বিনয় বাক্যে বধির, কাতর দৃষ্টিতে অন্ধ, উপভোগ পরমানন্দ। সাধক শেষোক্ত পথের পথিক। তাঁহার উপর বিবিধ অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার মাতা সাংসারিক কার্য্যে অবহেলা প্রযুক্ত যাহা অনিষ্ট ঘটিয়াছে নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্য ব্যতীত যে দিন যে কার্য্যে অকৃত কার্য্য হইয়াছেন তাহা সহোদর সমক্ষে মাতার নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সাধক কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন, ভাবিলেন, "উপায় কি করি, একদিকে হৃদয় বাসিনী অভয় বরদার সস্মিত বদনে কর্ম্মের নির্দ্দেশ, আত্মা-রামের তাহাতেই তৎপরতা, অন্য দিকে দেবী স্বরূপিনী জননীর আজ্ঞা, সংসারের অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মে নিয়োগ, মাতৃ আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য, যথাসাধ্য গৃহকর্ম্ম করিব।" যিনি সকল কর্ম্মের বিধান কর্ত্তা তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। সাধক দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাতায়াত সংক্ষেপ করিলেন। কিন্তু মনের গতি, প্রাণের টান সেই সৎসঙ্গে, সদালাপে, দেবীর ধ্যানে, পরম বিদ্যার উপাসনায়। পরমাপ্রকৃতির সেই বদন, সেই প্রসন্ন ভাব সর্ব্বদা হৃদয়ে সন্দর্শন করিতে থাকেন। গমনে বন্ধুর ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি নাই। স্থাবর জঙ্গমে শ্যামাঙ্গিনীর প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান না। সাধক

অন্তর্দৃষ্টিতে হৃদয়পদ্মে মুক্তকেশীকে সন্দর্শন করিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে-ছেন, মধ্যে মধ্যে কর্ম্মের ভ্রম দেখিয়া মৃদুস্বরে গাহিতেছেন :—

মা ! তব চরণাম্বুজে হেরিয়ে জীবন আছে।
নতুবা যাতনা যত ইথে কি মানব বাঁচে ॥
জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন, বিরত থাকিতে প্রাণ, প্রকৃতি বলিয়ে তারা
করতালি দিয়া নাচে।
কমলাকান্তের আর, কে আছে ভুবন মাঝে, আপনার বলিয়ে আমি,
যাব গো মা কার কাছে ॥

সংসারের উপদ্রব হইতে দূরে থাকিব মনে করিলেই দূরে থাকা যায় না। ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া পরম সুকৃতির ফল। সেই সুকৃতি জীবন পটে অদৃশ্য ভাবে আসিয়া দৃশ্যমান ও কার্য্যকর হয়। পুরুষার্থ কৃতির অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া নয়ন আকর্ষণ করে। সাধকের সুকৃতি, অনুরাগ, প্রেম অকৃত্রিম। সাধক সেই সুকৃতি বলে সংসারের অভাব ও অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কমলাকান্তের জনৈক ধনাঢ্য শিষ্য কর্ত্তৃক তাহার সংসারেরর সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণের অঙ্গীকার।

আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। ক্ষীরগ্রামে দেবী যোগাদ্যার উৎ-সব। ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমানের উত্তর, কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী। ক্ষীরগ্রাম পীঠ স্থান, সতীর ছিন্ন অঙ্গ পতিত হইয়াছিল।

পাষাণময়ী দেবী মূর্ত্তি একটী পুষ্করিণীতে সমুদয় বৎসর জলে নিমগ্ন থাকেন। ঐ দিন জল হইতে উত্তোলিত হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন, বিশেষ সমারোহে বহু ছাগ পশু বলি হয়। শুদ্ধ ক্ষীরগ্রামে নহে, বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে যোগাদ্যা দেবীর উৎসব ও পূজা হয়। ক্ষীরগ্রামে সমুদয় বৈশাখ মাস দেবীর উৎসবের মাস বলিয়া স্ত্রীলোকেরা কোন কোন গৃহ কর্ম্ম বন্ধ রাখেন না। কুম্ভকার নিজকর্ম্ম বন্ধ রাখে, গ্রামের মধ্যে কেহ ছত্র ব্যবহার করেন না। অন্যান্য গ্রামেও বিবিধ প্রকারে উৎসবের দিন সম্মানিত হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রাদি পরিষ্কার করেন না, শুদ্ধাচারে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম করেন, কৃষকেরা হল চালনা করে না। নিকটবর্ত্তী গ্রামেও সমুদয় দেব দেবীর মন্দিরে পূজা ও উৎসব হয়। দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে আজ সেই উৎসবের দিন। সূর্য্যদেব ভীষণ করজাল বিস্তার করিয়া অস্তাচলে গমন করিতেছেন। বায়ু অগ্নি কণার ন্যায় অনুভূত হইতেছে। নব বিকশিত তরুরাজির অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক ও ক্ষীণ কলেবর পুষ্করিণী ও খড়্গেশ্বরীর জলরাশি চুম্বন করিয়া সমীরণ ক্রমে শীতল ভাব ধারণ করিতেছে। চান্না ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু লোকের সমাগম হইতেছে। দেবীর মন্দির ও তৎসম্মুখবর্ত্তী স্থান সুশোভিত হইয়াছে। যাত্রা, কবি ও শ্যামা সঙ্গীত হইবে। শ্যামা সঙ্গীতের অধিকারী সাধক কমলাকান্ত। বয়স নবীন হইলেও কৃতিত্বে প্রবীণ। দেবীর মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত স্থানে শ্রোতাগণ উপবিষ্ট। কোকিল কণ্ঠে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। শ্রোতাগণের হৃদয়ে

অমিয়ধারা নিপতিত হইতে লাগিল। সুরের মাধুর্য্য শ্রোতাগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের ধমনী ও শিরা সকলকে শিথিল করিতে লাগিল। দেবীর মন্দির, দেবীর মহিমা স্তবে ও সুমধুর স্বরে পরিপূর্ণ হইল। বিবিধ পাদপ ও লতা বৃন্ত পরি-শোভিত খড়্গেশ্বরীর তীরে সঙ্গীত-সুধা বর্ষিত হইতে লাগিল। সাধক নূতন নূতন স্বরে, স্বরচিত নূতন নূতন পদাবলিতে সমাগত জনগণকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। ধন্য কমলাকান্ত! মায়ের বর পুত্র! ইত্যাদি শব্দে তাঁহার স্তুতিবাদ চতুর্দ্দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিল।

সেই দিন অম্বিকা হইতে সাধকের জনৈক ধনাঢ্য শিষ্য চান্নায় আসিয়া ছিলেন। তিনি গুরুপুত্রের অসাধারণ শক্তি, অপরিসীম ভক্তি, কণ্ঠের মাধুর্য্য, লোক বিমোহনের অপূর্ব্ব ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। ইষ্টদেবের পুণ্যের মূর্ত্তিমান ফলস্বরূপ গুরুপুত্রকে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ স্বর্গীয় গুরু-দেবের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক গুরুপুত্রের মুখ মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে গুরুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক মাতা ঠাকুরাণীর নিকট গুরুপুত্রের অমানুষিক ক্ষমতা, অপার ভক্তি এবং তিনি যেরূপে সমাগত লোকদিগকে বিমোহিত করিয়া ছিলেন, তৎসমুদয় অতি আহ্লাদের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাতাও পুত্রের সুখ্যাতি শ্রবণে সুখী হইলেন। শিষ্য কহিলেন,—"গুরু ভক্তিমান, ধার্ম্মিক, বিদ্বান, যশ ও প্রতিভাশালী হইলে আমার বংশাবলির শ্রেয়োলাভ

হইবে, বংশাবলি ধার্ম্মিক হইবে, সাত্ত্বিক হইবে, এই জন্যই আজ আমার বড় আনন্দ হইয়েছে। আমি সৎগুরুর শিষ্য বলিয়া আমাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতেছি। আজ আমার গুরুদেব জীবিত থাকিলে না জানি কতই আনন্দ অনুভব করিতেন। মা! তোমার এই পুত্র তোমার ও আমার গুরুদেবের পুণ্যের ফলস্বরূপ। ইনি বংশ উজ্জল করিয়াছেন।" সাধক অবনত বদনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভুবন মোহিনীর ধ্যানে মগ্ন, নয়নে প্রেমাশ্রু, শিষ্যের সকল কথা তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। মাতা কহিলেন, "বাবা? তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সকলই সত্য, কিন্তু আমরা সংসারী, অর্থ বিনা আমাদের সম্মান রক্ষা হয় না। তোমার গুরুদেব সংসার চলিবার উপযুক্ত তেমন কিছু রাখিয়া যান নাই, কেবল তোমরাই আমাদের সম্পত্তি কিন্তু তোমাদের নিকট যখন তখন যাওয়া প্রয়োজন, তোমাদের মঙ্গল কামনায় দেব পূজা, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন আদিও মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন। কমল আমার জ্যেষ্ঠপুত্র", পার্শ্বে উপবিষ্ট, অপরটীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এইটী নাবালক। সাসারের ব্যয়ভার বিস্তর, কমলের মনের অবস্থা ভাবিয়া আমাকে অনেক সময় চিন্তিত হইতে হয়। সংসারের শত দুঃখে কমলের হাস্য বদনের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাইনা। আনন্দময়ী নিশ্চয়ই কমলের মনের অবস্থা অন্যরূপ করিয়াছেন।" সাধক কহিলেন, "মা আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আপনার আদেশ যথাসাধ্য প্রতিপালন করি। যে কার্য্যে আপনি দুঃখিত হইবেন তাহা আমি মূণার

সহিত পরিত্যাগ করি। ইহা নিশ্চয় জানিলেন এ জীবনে কখনও আপনার কথায় অবহেলা করিব না।" সাধকের কনিষ্ঠ কহিলেন, "মা যা বলেন, দাদা তাই করেন, কিন্তু কাজ কর্ত্তে দেরী হয়ে যায়, আমি সঙ্গে গিয়ে দেখেছি, দাদা বড় আস্তে আস্তে যান, ভাল গাছ পালা দেখ্‌লে সেই দিকে তাকিয়ে কি ভাব্‌তে থাকেন, যদি পাখী ডাকে, কাণ পেতে শোনেন, হয় ত সেই খানেই গান ধরে বসেন, কখন বা গাছের দিকে চেয়ে তাঁহার চোকের জল পড়ে; কাজেই দেরী হয়ে যায়।" শিষ্য কহিলেন, "তোমার দাদার মত তুমি হতে পার্ব্বে না?" বালক বলিল, "আমার ওমন সুর নাই, কি করে হব।" শিষ্য কহিলেন, "দেখুন মা! আজ হইতে আমি এ সংসারের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিব। আপনার মাসিক ব্যয় ও সাময়িক ব্যয়, যখন যাহা হইবে আমি আহ্লাদের সহিত নির্ব্বাহ করিব।" কমলাকান্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কমলাকান্ত আপনাকে আর সংসারের অর্থ চিন্তায় মনকে দুঃখিত করিতে হইবে না। আপনি পরমার্থ চিন্তা করুন। পরমার্থ চিন্তা বহু সুকৃতি সাধ্য। আপনি মহামায়ার উপসনায় নিরত থাকুন। আপনার তপঃপ্রভাবে পর্জ্জন্যদেব প্রসন্ন হইয়া সময়ে বারি বর্ষণ করুন। পৃথিবী শস্যশালিনী হন, রোগ শোক অকাল মৃত্যু অন্তর্হিত হক, প্রকৃতি পুঞ্জ রাম রাজ্য সুখ ভোগ করুক। পুণ্যকর্ম্ম সংসার বৃক্ষের মূল স্বরূপ, সুখ ও শান্তি তাহার ফল ও পুষ্প, যোগী, সাধক ও ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ তাহার বীজ ও রস।" সাধক কহিলেন, "আপনার জয় হ'ক। মা আমার সংসারের

অভাব জন্য অনেক সময় দুঃখিত থাকেন, সেই জন্য আমার প্রাণ কাতর হয়, কিন্তু দাদা সত্য বলিতেছি সে দুঃখ আমার হৃদয়ে মেঘের বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দেয়, মুহূর্ত্ত মধ্যে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়। মা আমার হাসিভরা মুখে মনের মাঝে আসিয়া হৃদয় আসন অধিকার করেন।" শিষ্য কহিলেন, 'ভাই কমলাকান্ত আপনিই ধন্য। সকল লোকেরই মুখে শুনিতেছি, "কমলাকান্ত মায়ের ছেলে," আমারও তাই বিশ্বাস, আপনি মায়ের বরপুত্র, আপনার শ্রেয়োলাভ হউক, শিষ্য আপনার প্রসন্নতার প্রার্থী। শিষ্যের বদান্যতার কথা শুনিয়া জননীর নয়নে জলকণা দৃষ্ট হইল। তিনি গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি তোমাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব জানি না", জননীর কণ্ঠরোধ হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "এই দুটী সন্তানকে লইয়া আমাকে অনেক সময় চিন্তিত হইতে হয়। আমার ভ্রাতার আয় অধিক নহে, সংসারিক ব্যয়ও বিস্তর, আমার সমুদয় ব্যয় ভার তাঁহার উপর দিতে আমার কষ্ট বোধ হয়। তুমি দীর্ঘজীবি হও, তোমার জয় হউক। আমার আর একটী অনুরোধ আছে, তুমি কমলকে অম্বিকায় লইয়া যাও, তোমার নিকট রাখ, যাহাতে সে গৃহস্থ হইতে পারে, সে বিষয়ে চেষ্টা কর। কমলের বিবাহ হইয়াছে, তাহার সন্ন্যাস বেশ আমি কখনই দেখিতে পারিব না। ভগবৎ চিন্তার নানাবিঘ্ন, সংসারী লোকের একাগ্রতা হওয়া বড় কঠিন, কিন্তু যাহাদের উপর ভগবানের কৃপা হয়, তাঁহাদিগকে সংসারে রাখা বড় শক্ত। বিশুদ্ধ ভক্তিমান বিষয়ী লোকের, সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের

কথাও তুমি শুনিয়াছ, সোণার সংসার সোণার পরিবার, সোণার বৈভব ছাড়িয়া দিয়া, ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ভেক লইয়াছেন। পাছে আমার কমলও ঘর বাড়ী ছাড়িয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়, বাবা! আমার এই ভয় সর্ব্বদা হয়।" জননীর বাক্য শেষ হইবামাত্র সাধক বিনীত স্বরে কহিলেন, "মা! আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি, আমি দেশ ত্যাগ করিব না, আপনার চরণ দর্শন ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহার কখনই অন্যথা হইবে না।" শিষ্য কহিলেন, "মা! পৃথিবী না থাকিতে পারে, সূর্য্য চন্দ্রের উদয় অস্তের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, কিন্তু সংযত সাধক পুরুষের বাক্য কখনও অন্যথা হইবার নহে, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, ইনি কখনই দেশ ত্যাগ করিবেন না, কমলাকান্ত অধিকাংশ সময়ই অম্বিকায় থাকিবেন, তাঁহাকে কোন নিয়মের বশীভূত করা আপনার ও আমার কর্ত্তব্য নহে। মেধাবী ধার্ম্মিক পুরুষ দিগের মনকে ভারাক্রান্ত করা উচিত নহে।" জননী কহিলেন, "বাবা! তুমি যাহা উচিত তাহাই করিবে। এই পিতৃহীন বালক দুটীকে সহোদরের ন্যায় দেখিবে, আমার এই মাত্র অনুরোধ। অনন্তর মাতা বিদায় গ্রহণ করিলেন। সাধক ও শিষ্য পরমার্থ বিষয়ে কথোপকথন করিয়া সুখী হইতে লাগিলেন।

সাধকের সহিত কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয়।

আজ গুস্কড়ে রক্ষা কালীর পূজা। গুস্কড়ে গ্রাম বৰ্দ্ধমানের উত্তর, চান্না হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ। গুস্কড়ে বিশিষ্ট ধনাঢ্য

লোকের বাস না থাকিলেও অনেকগুলি মধ্যবর্ত্তী লোকের বাস ছিল। প্রায় সকলেরই কৃষি বৃত্তি, প্রত্যেক গৃহই ধনধান্যে পরিপূর্ণ, গোধন সকল সুস্থকায়, হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ, জলাশয় সকল স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ, বৃক্ষ সকল ফল পুষ্প পরিশোভিত, অতএব গ্রামে সুখ ও শান্তি সুলভ ছিল, অভাব ও ব্যাধির প্রবেশের অধিকার ছিল না। পূর্ব্বে বঙ্গে প্রায় সকল গ্রামেরই অবস্থা এইরূপ ছিল। এমন গ্রাম দৃষ্ট হইত না যেখানে অন্ততঃ বৎসরে একবার মহোৎসব না হইত। হিন্দুর সকল কর্ম্মই ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট, হিন্দুর মহোৎসবও ধর্ম্ম কর্ম্ম অবলম্বনে সম্পাদিত হয়। সাধকগণের যেমন সর্ব্ব কর্ম্মই "তদর্থং", বিশ্বরূপ পরমাত্মার প্রসন্নতার জন্য, হিন্দু গৃহীর সর্ব্ব কর্ম্মই বৈদিক ক্রিয়া কলাপ সংযুক্ত, চিত্তশুদ্ধি কারক, জ্ঞান ও ভক্তি প্রদায়ক ও মুক্তিমার্গ প্রদর্শক। মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ শ্যামাপূজা, হরিনাম সংকীর্ত্তন, তৎসঙ্গে লৌকিক বিদ্যা সকলের উৎকর্ষ সাধন, যথা শিল্প প্রদর্শন, মূর্ত্তি সকলের অনুরূপ গঠন, যাত্রা, কবি ও পাঁচালী প্রভৃতি দ্বারা কবি কুলের পরিপোষণ ও উৎসাহ দান। এই সকল সমাজ হিতকারী কর্ম্মদ্বারা হিন্দু সাধারণকে ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট না রাখিলে পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম বিপ্লবে কোন্ দিন হিন্দু ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইত। মহোৎসব সকল ধর্ম্ম ভিত্তির উপর সংস্থাপিত বলিয়া প্রত্যেক মহোৎসবে যাজক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধক, কবি, বৈষ্ণব, অতিথি প্রভৃতি বিবিধ লোকের সমাগম হয়। গুমুড়ে আজ উৎসবের সীমা নাই। উৎসব ক্ষেত্রের একধারের মধ্যস্থান অবলম্বন করিয়া

গৃহ মধ্যে মঙ্গলময়ীর প্রতিমা সংস্থাপিত। গৃহটী রঞ্জিত, বাতাতপ নিবারণ যোগ্য বস্ত্রখণ্ড সকল দ্বারা মণ্ডিত। গৃহ দ্বারে আম্র পল্লব সংযুক্ত মাঙ্গলিক ঘট ও কদলী বৃক্ষ। প্রতিমার সম্মুখে কিয়দ্দূরে শ্যামা সঙ্গীত, যাত্রা, কবি, পাঁচালী প্রভৃতির জন্য বৈঠক স্থান। সেই বৈঠক স্থানের উপরের আচ্ছাদন রঞ্জিত তাল পত্র, অতি সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত, শীত, বাত, আতপ, জল, নিবারণ উপযোগী ; সেই স্থানে স্তম্ভ সকল রঞ্জিত বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত, প্রত্যেক স্তম্ভে এক এক খানি চিত্র এবং এক একটী কাচ নির্ম্মিত দীপ সন্নিবেশিত। মহোৎসব-ক্ষেত্রের চারিধারে শিল্প প্রদর্শনের স্থল। কোথাও রাজস্থূয় যজ্ঞ, রাম রাবণের যুদ্ধ, কীচক বধ, ছবি দ্বারা দর্শিত হইতেছে, স্থানে স্থানে প্রহসন চিত্র, শিল্পকারগণের শিল্প চাতুর্য্য প্রকাশ করিতেছে। দাম্পত্য কলহ, মদ্যপায়ীদিগের মত্ততার পরিণাম প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক পূর্ণ ঘটনা সকল অবিকল প্রতিকৃতি দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে, কোন স্থানে দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বিতরণ, কোন স্থানে হরিনাম সংকীর্ত্তন, কোন স্থানে মল্লদিগের ক্রীড়া। বহুলোকের সমাগমে ও তাহাদিগের হাস্যময় বদনে মহোৎসবের স্থানটির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। গ্রামবাসীগণের আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্বগণের সমাগম হওয়াতে প্রত্যেক গৃহই বিবাহ গৃহের ন্যায় আনন্দ উৎসাহে পরিপূর্ণ। গ্রামের প্রান্তভাগে আতস বাজী সকল পরিদর্শিত হইতেছে, নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের অধিবাসীগণকে শুদূরের আনন্দে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিয়া আতস বাজীর শব্দ

দিগন্তরে ছুটিতেছে ও অগ্নিকণা সকল নভোমণ্ডল আলোকিত করিতেছে।

যেমন মৃদু মলয়পবন, মুহুর্মুহু কোকিল ধ্বনি, নব পল্লব, কুসুম বিকাশ, ভ্রমর গুঞ্জন ভিন্ন বসন্ত সমাগম শোভা পায় না, তেমতি 'বর্দ্ধমান ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সাধক কমলাকান্ত ও তাঁহার অনুগামীগণের সমাগম ব্যতীত কোন মহোৎসবই শোভা পাইত না। সাধনা ও সঙ্গীত সময়ে সময়ে একাসনে উপবেশন করে। নির্জ্জনে বসিয়া প্রেমাশ্রুপাত অপেক্ষা বহু লোকের সমক্ষে একাগ্রতা ও প্রেমাশ্রুপাত উত্তম, কারণ তাহাতে বহু লোকের হৃদয়কে প্রেমার্দ্র করিতে পারে, শান্তিসুখ অনুভব করাইতে পারে। মহোৎসবে মহৎ লোকের সমাগমই প্রার্থনীয়, তাহাতে শিক্ষা ও শুভ ফল বিস্তর। তখন প্রত্যেক মহোৎসবে প্রাদেশিক গুণবানও ধার্ম্মিক লোক সকলের সমাগম হইত। তাঁহারা পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতেন। গুসুড়ের মহোৎসবে নানা স্থান হইতে বিশিষ্ট লোকের সমাগম হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের নাম উল্লেখ যোগ্য, কারণ তাঁহার সহিত সাধকের সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল, সাধকের কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক উল্লেখ যোগ্য ঘটনায় তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার নাম কেনারাম চট্টোপাধ্যায়, নিবাস অমরারগড়, বর্দ্ধমান জেলার মানকরের নিকটবর্ত্তী, স্বভাব কুলীন, সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, সংসারী হইয়াও সাধক। তাঁহার ইষ্টদেবের নিবাস গুসুড়ে। সন্ধ্যার পর সাধকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথম দর্শনে উভয়ের

চক্ষু সম্মিলিত হইবামাত্র পরস্পরের হৃদয় আকর্ষণ করিল। কেনারাম কহিলেন, "আপনার যশোরাশি শুনিয়া অনেক দিন হইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা ছিল, জগদম্বা আজ সে আশা পূর্ণ করিলেন, আজ আমার দিন সার্থক।" সাধক সম্মুখস্থিত ইচ্ছাময়ীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "সকলি মায়ের ইচ্ছা, আমিও আপনাকে মায়ের চরণতলে দেখিয়া আনন্দ উপ-ভোগ করিতেছি।" পার্শ্ববর্তী একজন কেনারামের পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "ইনি সদ্গুণ সম্পন্ন, সংযমী ও বাদ্যযন্ত্র সুনিপুণ।" কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ পরিচয়ের পর বহুলোক সমক্ষে সাধকের সঙ্গীত আরম্ভ হইল। তখন বৈঠক গানে পাখওয়াজও ঢোলের প্রচলন ছিল, তবলা বাঁওয়া টপ্পা প্রভৃতি গানে ব্যবহৃত হইত। কেনারাম বাদ্যযন্ত্র বাঁধিয়া সঙ্গত আরম্ভ করিলেন, সাধক পরমাবিদ্যা জগদম্বার প্রতি দৃষ্টি করিয়া গাহিতে লাগিলেন।

নিশি জাগিয়ে পোহাও জননীর গুণ গেয়ে,
কি সুখ চৈতন্য দেহে অচৈতন্য হয়ে রে॥
নিদ্রায় কি আছে ফল, মহা নিদ্রা নিকট হইল,
মন! তখনি মনের সাধ পূরাবে ঘুমায়ে রে॥
যদি না ঘুমালে নয়, যোগ নিদ্রা উচিত হয়,
শ্যামা স্বপনে দেখ নয়ন মুদিয়ে॥
কমলাকান্তের চিত, মিছে সুখে অনুগত,
সকল সুখের সুধানিধি গিরিরাজের মেয়ে॥

সমাগত জনগণ স্থিরভাবে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বাল, বনিতা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বিবিধ জনাকীর্ণ, কোলাহল পূর্ণ মহোৎসবের স্থান নির্ব্বাত নিবিড় অটবীর ন্যায় নীরব হইল। সকলেই কখন সাধক কখন সঙ্গত কর্ত্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সুন্দর তাল মান সহ সঙ্গীত তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের শরীরকে শিথিল করিতে লাগিল। ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যাহাদের কখনও ভাবান্তর হয় নাই আজ তাহাদেরও হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ হইল। এক এক খানি সঙ্গীতের পর আবার কখন সঙ্গীত আরম্ভ হইবে, সেই প্রতীক্ষায় তাহারা চঞ্চল ও উদ্‌গ্রীব হইতে লাগিল। সঙ্গীতের এমনি মোহিনী শক্তি, বালকগণও নিস্তব্ধ। এইরূপ অনেকক্ষণ আনন্দ উপভোগের পর সঙ্গীত শেষ হইল। শ্রোতাগণ কেহ সাধকের অপরিসীম ভক্তি, কেহ পদ সমূহের সুন্দর ভাব বিন্যাস, কেহ তাঁহার সুন্দর কণ্ঠস্বর, কেহ বা সঙ্গত কর্ত্তার নৈপুণ্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত শ্রবণের লালসা পরিতৃপ্ত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইল, পরদিন যথা সময়ে প্রত্যাগত হইবেন স্থির করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

সঙ্গীত শেষ হইবার পর কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের ইষ্ট দেবতা অনুনয়ের সহিত সাধককে কহিলেন, "আজ আপনাকে আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া গৃহ পবিত্র করিতে হইবে।" সাধক তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে আগমন ও পান ভোজনের পর কেণারামের সহিত নানাবিধ

তত্ত্বোধিনী কথা প্রসঙ্গে রজনী অতিবাহিত করিলেন। সংসার পীড়িত মানব যেমন বিদেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক সুখ ও শান্তি ভোগ করে, সংসার ভারাক্রান্ত ভক্তগণও সাধুসঙ্গ পাইলে সেইরূপ আহ্লাদিত হন। প্রেম কি পরম বস্তু? সংসারে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণের এমন পরম ঔষধি আর নাই। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, হৃদয়ে প্রেম নাই, তাহার হৃদয় মরুভূমি। সে ব্যক্তি নিবীড় কানন মধ্যে পথ ভ্রান্ত লোকের ন্যায় বিপন্ন, শান্তি তাহার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় না। যাঁহারা প্রেমিক ও প্রেমালাপী, তাঁহারাই ধন্য। বর্ষাঋতু যেমন জলদ জালকে আকর্ষণ করে প্রেমালাপীগণ তেমনি পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। প্রাতঃক্রিয়া সমাধানের পর সাধক ও কেনারাম পুনর্ব্বার প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রেমালাপের পূর্ব্বেই কেনারাম সাধককে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়া গৃহ পবিত্র করিবার জন্য অন্তরের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাধক স্বীকৃত হইলেন, কহিলেন, "সময় ও সুযোগ পাইলে অমরার গড়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। সময় ও সুযোগ সন্ধান করিতে হইবে। মনপাখী আমার এখনও বাঁধা আছে, কখন কখন শিকলী কাটিয়া এ গাছ ও গাছ, এখান সেখান করিয়া বেড়ায় কিন্তু আবার অনিচ্ছায় আসিয়া ধরা দেয়, খাঁচার ভিতর প্রবেশ করে, পায়ে শিকলী পরে। সতত শিকলী কাটিবার ইচ্ছা কিন্তু তাহাতে তাড়না সহিতে হয়, তাই স্বীকার করিতেছি, সংসার শিকলী একটু আলগা পাইলেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" কেনারাম কহিলেন, "আমি ধন্য হইলাম, মানস বিহঙ্গ

ধরা দেয় কেন? মুক্ত জীব হওয়া বড় কঠিন, তাহা জানি। সংসারে বদ্ধ হওয়া জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, মাতৃ উদর হইতে জীব বদ্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বদ্ধ থাকা জীবের স্বভাব ও সংস্কার। জীব মাত্রেরই আবাস স্থান আছে, সে যেখানে থাকুক, তাহার নিজ আবাস স্থানের প্রতি দৃষ্টি থাকে, আপনি বদ্ধ হইয়াও মুক্ত, আপনি ধন্য। ব্যাস জনকাদি ঋষিগণ বদ্ধ হইয়াও মুক্ত।" সাধক কহিলেন, "আমাদের মুক্তভাবে ও তাঁহাদের মুক্তভাবে প্রভেদ বিস্তর। ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য, তাঁহারা মুক্ত হইয়াও মানব চক্ষে বদ্ধভাবে অবস্থান করিয়া ছিলেন। ভাই আমাদের বন্ধন কঠিন। আমাদের মুক্তভাব কৃপাময়ীর কৃপা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব, কই সে হৃদয় ভরা প্রেম, কই সে ভালবাসা, কই সে আত্ম সমর্পণ। আমরা আত্মাকে সঙ্কীর্ণভাবে দেখিতেছি, চারি-দিকে অহং অহং বলিয়া অবিদ্যা ঘোর রবে নৃত্য করিতেছে। ভাই সকলি কালীর ইচ্ছা, এ বদ্ধভাব মোচনের ক্ষমতা আর কাহারও নাই।" সাধক গদগদ কণ্ঠে, মৃদুস্বরে গাহিলেন,—

কালীর ইচ্ছা যেমন, রে মন! বৃথা কর বাসনা।
মন! তুমি কি করিবে, কোথা পাবে, কালী না পূরালে কামনা॥

কেনারাম কহিলেন, ইচ্ছাময়ীর যেমন ইচ্ছা, সংসারে তেমনি ঘটে। তাঁহার ইচ্ছার সমভাব নাই কেন? বুঝিতে পারি না। তাঁহার নিতান্ত শরণাগত, পরম ভক্ত, পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি ভ্রমেও তাঁহার নাম গ্রহণ করে না, এমন কি তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার

করিতে কুণ্ঠিত হয় সে পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।" সাধক আবার মৃদু স্বরে সহাস্যবদনে গাহিলেন ;—

জন্মান্তর ক্রিয়া অনুচর জীবের যে কিছু যন্ত্রণা।
তুমি এই কর মন! ভাব শ্রীচরণ মহতের এই মন্ত্রণা॥

কেনারাম কহিলেন, "সংসারের সুখ, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, যদি জন্মান্তরের কর্ম্মের ফল স্বরূপ হয়, তাহা হইলে জগদম্বা কি ইহ জগতের সুখ দুঃখের বিধাত্রী নন? কর্ম্মই প্রধান, এবং সেই কর্ম্মের কর্ত্তা আমি?" সাধক হাসিতে হাসিতে আবার গাহিলেন,—

তুমি যে ভাবিছ দেহ অভিমান সকলই তাঁর বঞ্চনা।
সেই সে কর্ত্রী, ধাত্রী, হর্ত্রী, আর যত সে বিড়ম্বনা॥
কমলাকান্ত মান অপমান, দূরে ত্যজ গুরু গঞ্জনা।
তুমি ভাব ভব গৃহিণী, ভবানী না রবে ভবের যন্ত্রণা॥

সাধক কহিলেন, "ভাইরে সংসারের যন্ত্রণা, শারীরিক মানসিক ক্লেশ, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, প্রিয়জন বিয়োগ প্রভৃতি অনিবার্য্য, নিরন্তর চলিতেছে, মানব কর্ম্ম ফলে তাহা ভোগ করিবে কিন্তু সদানন্দময়ীর চিন্তায় যে পরমানন্দ আছে তাহা হইতে মানবকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সংসারীর চক্ষে মহাপাপী বাহ্যিক অকিঞ্চিৎকর সংসারের সুখ ভোগ করিতে পারে কিন্তু মায়াবদ্ধ মানব প্রেমিকের হৃদয়ের সুখের অনুমান করিতে পারে না। দয়াময়ীর ধ্যান ধারণায় যখন প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিবে তখন সংসারের জঞ্জাল সকল কোন দিকে ছুটিয়া চলিয়া

যাইবে। প্রেমিকের হৃদয় ত্যাগ করিয়া সেই সকল জঞ্জাল সংসার মহানদীর আবর্জ্জনা যুক্ত স্থানে ঘূর্ণমান হইয়া দাঁড়াইয়া নিশ্চল হইবে।” কেনারাম কহিলেন, “বিপদ ও দুঃখ সঙ্কুল সংসার মধ্যে থাকিয়া মনকে একবারে মমতাশূন্য, সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করা আমি অতিশয় দুঃসাধ্য বিবেচনা করি। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, পুত্র কন্যার কাতর দৃষ্টি, তথাপি মন ধ্যান ধারণায় রত, পরমানন্দময় প্রেম সাগরে মগ্ন, তাহা কিরূপে সম্ভবে, আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না।” সাধক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “যিনি কখনও ভূমিকম্প দেখেন নাই, শৈল সমুদ্র শালিনী বসুন্ধরা ভূমিকম্পে ক্ষুদ্র লতিকার ন্যায় কম্পিত হন, একথা তাঁহাকে বিশ্বাস করান কঠিন। যিনি যোগবলে বিশ্বাস করেন না, মানবদেহ তৃণ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিতে পারে, একথা তাঁহাকে কিরূপে বিশ্বাস করান যাইতে পারে! এ সংসারে মানব বিচিত্র পদার্থ, মনের ক্রিয়া অত্যাশ্চর্য্য। মানব অভ্যাস যোগে না করিতে পারে কি? একেবারে কোন কর্ম্ম হয় না। অভ্যাসে সাধনার পথে অগ্রসর হও। পরমা প্রকৃতি সদয় হইয়া সাহায্য করিবেন। তোমার কর্ম্ম তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপ হইবে।” এইরূপ কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর সাধক কেনারামের সহিত সময় ক্রমে পুনর্ব্বার তাঁহার গৃহে সাক্ষাৎ করিবেন স্বীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

———

চতুর্থ অংশ।

কমলাকান্তের অম্বিকা গমন।

সাধকের মাতৃ-বিয়োগ ও পত্নী-বিয়োগ।

গুস্কুড়ের উৎসব শেষ হইল। কমলাকান্ত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার জননী তাঁহাকে সংসারের কর্ম্মে নিয়োগ করিবার উদ্দেশে তাঁহার সহিত অম্বিকায় যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "অম্বিকার ধনবান্ শিষ্য আমাদের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আশীর্ব্বাদ করা কর্ত্তব্য। আরও অনেক শিষ্য আছেন, তাঁহারা তাদৃশ ধনশালী না হইলেও সকলেই ভক্তিমান, আমাদের দর্শনে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন। আমরা সংসারী, আমাদের অর্থ প্রয়োজন হইলেও শ্রদ্ধা, ভক্তি, পরম পদার্থ। ঐ সকল ধনহীন ভক্ত শিষ্য সকলকেও দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ করা কর্ত্তব্য।" সাধক মাতৃবাক্য শিরে ধরিয়া অম্বিকা গমনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। চান্না হইতে গো যানে জননীর সহিত অম্বিকায় গমন করিতেছেন। চান্না হইতে অম্বিকা প্রায় বার ক্রোশ। সাধকের গলে উত্তরীয়, রুদ্রাক্ষ মালা, প্রসন্ন বদন, পথের সম্বল কালী নাম। তিনি নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামেই পরিচিত। পথে অবস্থানের জন্য অভ্যর্থনার অভাব নাই। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা,

বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে" "যেই জন ভজে কৃষ্ণ সে বড় পণ্ডিত।" তাঁহার মত গুণবান, ভক্তিমান লোকের বাব ক্রোশ পথ বার দিনেও যাওয়া কঠিন। প্রতি গ্রামেই অবস্থিতিব জন্য উপরোধ অনুরোধ এড়াইয়া যাইতে হয়, বিশেষতঃ তৎকালে অতিথি সংকার বর্ত্তমান অপেক্ষা প্রবল মাত্রায় সমাজ মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, গৃহী মাত্রেই অতিথি সংকারকে গৃহীর পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিত। অতিথিশালা না থাকিলে ধনাঢ্য ব্যক্তি সম্পত্তিশালী বলিয়া গণ্য হইতেন না। বর্দ্ধমান হইতে অম্বিকার পথে পুণ্যশ্লোক বর্দ্ধমানাধিপতি দিগেব তিন চার ক্রোশ অন্তর পান্থ নিবাস, শ্যামা মন্দির, ও শিবালয, উদ্যান ও দিব্য জলাশয় আছে। ওই সকল স্থান দেখিলেই অনুমিত হয়, নিবাস সকল তাঁহাদের বিলাস ভবন নহে, প্রতি স্থানেই দেবালয় ও অতিথিশালা আছে। দুই এক স্থানেব দৃশ্যও অতি মনোহর ও চিত্রাঙ্কণ উপযুক্ত। বর্দ্ধমান হইতে কাল্‌না পর্য্যন্ত পাকা রাজপথ, কর্দ্দম রহিত, শিলামণ্ডিত, অতি সুন্দর। এক স্থানের দেবালয় ও অতিথিশালার দৃশ্য অতি সুন্দর ও বর্ণনযোগ্য। সেই স্থানের দৃশ্য নিম্নে অঙ্কিত হইল—রাজপথের কোলে দুইটী প্রকাণ্ড মন্দির, পান্থদিগের বহুদূর হইতে নয়ন আকর্ষণ করিতেছে। পথ পার্শ্বেও মন্দির প্রবেশ দ্বারে তোরণ ও সিংহমূর্ত্তি, রাজকীয় ভবনের চিহ্ন স্বরূপ। তোরণের নিচে দাঁড়াইলে সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট সংযুক্ত বিমল পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ঘাটের উভয় পার্শ্বে দুইটী মন্দির। একটী মন্দিরে দুই হস্ত পরিমিত মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি। অন্যটিতে

নবজলধর বর্ণা অভয় বরদা করাল বদনা মূর্ত্তি। দুই মূর্ত্তি পরস্পরকে দৃষ্টি করিতেছেন। দুই মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থান শিলা মণ্ডিত ও পুষ্করিণীর ঘাটের মুখে অবস্থিত। মন্দির দুইটীর পশ্চাৎ ভাগে পান্থ নিবাস ও রাজকীয় দাস দাসীগণের বাসের উপযুক্ত ভবন। ঘাট ও মন্দিরের পার্শ্বে পুষ্করিণীর জল সংলগ্ন স্থানে রাজগণের বাসের উপযুক্ত গৃহ। পুষ্করিণীর তিন ধারে উদ্যান। এক ধারে কুসুম কানন, অপর দুই ধারে আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষে পরিশোভিত। তোরণ হইতে আরম্ভ করিয়া পুষ্করিণী ও তৎপার্শ্বস্থ উদ্যান ব্যাপিয়া ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর। সকল স্থানেই দেব সেবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও অতিথি সকলের সৎকার ঐ সকল দেবালয় স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধকের মত গুণবান লোকের অন্ততঃ একদিন অবস্থান ব্যতীত ঐ সকল স্থান অতিক্রম করা নিতান্ত দুরূহ। যাহা হউক, তিনি পথে নানা স্থানে অতিথি সৎকার গ্রহণ করিয়া অম্বিকায় উপস্থিত হইলেন।

সাধক অম্বিকায় শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, যৌবনের উন্মুখ অবস্থায় অম্বিকা হইতে চান্নায় আসিয়া বাস করেন। জ্ঞানের উন্মুখ অবস্থায় শৈশবের লীলাভূমি, পরিত্যাগ করিয়া মানব স্থানান্তরিত হইলে শৈশবের লীলাভূমি কল্পিত স্বর্গের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। শৈশবে ও যৌবনের আরম্ভে মানব সমুদয় জগৎকে নবভাবে দর্শন করে। তৎকালের প্রণয় বন্ধন গভীর ও সুদৃঢ়। মন আপনার থাকে না। মন জগতের হয়। মানব সে সময় যাহা দেখে, তাহাকেই ভালবাসিতে চায়,

পুরুষ হউক, আর প্রকৃতিই হউক, তাহাতে আপনার মন বিলাইয়া দেয়। যৌবন উন্মুখ শৈশবের লীলাভূমি তাহার প্রকৃতি পুরুষকে লইয়া স্থানান্তরিত ব্যক্তির প্রাণের অঙ্কে অঙ্কে, স্তরে স্তরে নৃত্য করিতে থাকে। সেই স্থানের সম বয়স্ক ব্যক্তির সহিত প্রেম, সেই স্থানের তরুরাজি, সেই স্থানের নদী, তড়াগ, জলাশয় সমুদয় সেই স্থানের পক্ষী কুলের কলধ্বনি, সেই স্থানের ভ্রমণ, শয়ন, ভোজন, সুখ-স্মৃতি স্থানান্তরিত ব্যক্তির মনকে অতিবড় বিচলিত করিয়া তোলে। স্থানান্তরে যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বৃদ্ধে মানব তদপেক্ষা সহস্র সুখ অনুভব করিলেও প্রকৃতির শোভা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট হইলেও তাহাকে যৌবন প্রমুখ শৈশবের লীলাভূমি ভুলাইতে পারে না। সেই সময়ের প্রণয় অতি পবিত্র, স্বার্থপরতা ও পাপের লেশ-মাত্র থাকে না। প্রাণ ভালবাসিতে চায়, কেন ভালবাসিতে চায়,—প্রাণ বুঝিতে পারে না, বুঝিবার চেষ্টাও করে না। সেই জন্য শৈশব ও নব যৌবনের প্রণয় সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। প্রণয়ের জোয়ার ভাটা থাকে না, প্রণয়ের ক্ষয় বৃদ্ধি থাকে না, চিরকালই নূতন, চিরকালই সমসুখদায়ী। সাধক আজ শৈশবের লীলাভূমি অম্বিকায় পুনরাগমন করিলেন। সাধক জননীর সহিত প্রথমে তাঁহার ধনাঢ্য শিষ্যের গৃহে গমন করিলেন, শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা পূজিত ও সম্মানিত হইয়া অম্বিকায় অবস্থান করিতে লাগিলেন; এবং বাল্য-বন্ধুগণের সহিত সুখালাপ করিয়া সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

সাধক অম্বিকা কাল্‌নার কত নব ভাবের দর্শন করিলেন।

পূর্ব্বে তিনি সন্তত্বঃখ বিনাশিনী সুরতরঙ্গিণীর সহবাসে অপার সুখ অনুভব করিতেন। এখন তাঁহার দর্শনে সেই সুখের পুনরুদয় হইল। সকাল সন্ধ্যায় যখন সময় পাইতেন, মায়ের কোলে আসিয়া বসিতেন। তীরে বসিয়া প্রতি তরঙ্গ বিক্ষেপে জলদবরণী ভুবন মোহিনীর নৃত্য দর্শন করিতেন। পণ্য পরিপূর্ণ তরণী ও নাবিক-গণের আনন্দ ধ্বনি, পারঘাটে জনতা, দেখিয়া মৃদু মধুর স্বরে হাস্য মুখে গাহিলেন :—

সংসার জলনিধি অনিবার, তরণী শ্যামাপদ সার কর রে মন।
দুরিত ভবার্ণব পারাবার, শ্রীগুরুদেব কর্ণধার রে।
ভুলেছ কি ভ্রান্তি বশে, দিন গেল মিছে আশে,
মন! না চিন্তিলে হিত আপনার।
নিয়ত চঞ্চল তুমি, যন্ত্রণা ভাজন আমি,
অনুচিত তোমার বিচার।
মন রে! মিনতি রাখ, কালী কালী বলি ডাক,
অনায়াসে হবে নদী পার।
কমলাকান্তের ইহ কালে পরকালে,
কালী বিনা গতি নাহি আর॥

লোক অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদী পার হইতেছে, কিন্তু সংসার সমুদ্র অনিবার, তাহার পার নাই, অবধি নাই। কত কতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, কত যোনী ভ্রমণ করিতে হইবে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া যাতায়াত করিতে হইবে। এই সংসার জলধি তরিবার সম্বল সামান্য অকিঞ্চিৎকর নহে, অমূল্য রত্ন চাই, সেই

অমূল্য রত্ন কালী নাম, মহাশক্তি কালী নাম, বাসনা শূন্য মনে, উদার হৃদয়ে মহাশক্তির উৎস্তব করিয়া ভব যন্ত্রণা নিবারণ করে। সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "মন! আমি তোমার জন্য যন্ত্রণা ভাজন।" মনকে সম্বোধন কেন? আমি আর মন কি এক বস্তু নয়? মনই ত আমিত্ব প্রতিবোধক। মনই নেতা, উপদেষ্টা, অতএব "আমি" মনের দাস। আমি ও মন প্রায় এক বস্তু, এক মতাবলম্বী। মনকে সম্বোধন করিবার কারণ এই—মন বড় চঞ্চল, সর্ব্বদা এক ভাবে থাকে না। বিবেক বুদ্ধি মনেরই, মন সব জানে, কিন্তু মাঝে মাঝে চোরা গরুর মত পথ ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে, আবার প্রকৃতিস্থ হয়। যখন মনের মত মন হয়, তখন আপনি আপনাকে তিরস্কার বা নিন্দা করে, সেই তিরস্কার বা নিন্দা আত্মগ্লানি। অনেক গানেই মনকে সম্বোধন করিয়া উক্তি আছে, তাহা বিবেক বুদ্ধির উদয় বা মনের আত্মগ্লানি। সাধক কবি আবার বলিতেছেন, "কালীনাম ইহকাল ও পরকালে একমাত্র গতি। সংসারের সুখ সম্পদ, পুত্র, পৌত্র, ভোগ বিলাস, কালীনামে লাভ না হইতে পারে, কিন্তু কালী নামে আত্মার পবিত্রতা, আত্মার প্রসন্নতা, জ্ঞান, সর্ব্বজীবে দয়া জন্মে, কালীনাম মানবকে সংসারে স্বর্গের সুখ ভোগ করায়। কালীনাম রস পিপাসু আত্মা বিপুল পুণ্য লাভে সক্ষম হয়, সংসার কানন সহজে পার হইতে পারে।

সাধক নদীকূলে দাঁড়াইয়া প্রকৃতি পুঞ্জ, শ্যামল ক্ষেত্র, সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাদের সেই হাস্যময় ভাব দেখিয়া ভাবিলেন,

"আমার ভব ভাবিনীর ভাবের বিকৃতি কখনও দেখি না। সর্ব্বদাই এক এক ভাবে সজ্জিত। প্রকৃতি রূপিণী আমার সর্ব্বদাই হাস্যময়ী, আ মরি কি অনুপম দৃষ্টি। মায়ের আমার এ মূর্ত্তির দিকে যখন নিরীক্ষণ করি, তখনই পরমানন্দ ভোগ করি। মানব কি এই সকল প্রকৃতি ছাড়া, কখনই নয়? তবে কেন মায়ের এত ভাবান্তর—হাহাকার, চীৎকার, রোদন, ক্রন্দন, বিভীষিকা দর্শন, শিরে করাঘাত, বাষ্পাকুল নয়ন। এ সকল কি ভব ভাবিনীর নাট্য মন্দিরের প্রহসন? যদি প্রহসনই হয়, তবে কেন এই প্রহসন দর্শনে হাস্যের উদ্রেক না হইয়া হৃদয় অতি বড় দুঃখে ব্যথিত হয়? অথবা ঐ সকল মায়াময় জগতের রাক্ষসী মায়া। কিম্বা তত্ত্ব জ্ঞানের উদ্বোধক? সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মাইবার উপায়? যাহা হউক মানব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ, অতি বিচিত্র। বিচিত্রের বিশেষত্ব থাকা অসম্ভব নহে।" সাধক এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নদীকূলে বিপণী শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, প্রায় সবই নূতন বুঝিলেন, "এ সংসারে পুরাতন থাকিবার অধিকার নাই। নূতন পুরাতনের স্থান অধিকার করিবে এই প্রকৃতির নিয়ম। একমাত্রকাল চিরন্তন, তাহার ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই। যেমন অনন্ত আকাশের নীচে সমুদয় দৃশ্যমান জগৎ পরিবর্ত্তন-শীল, তেমতি অনন্তকাল পরিব্যাপ্ত সমুদয় পদার্থই বিকার সম্পন্ন, নির্ব্বিকার শবরূপ মহাকালের উপর সংস্থাপিত। হায় হায়! মায়ের আবার চতুর্ভুজ, করাল বদন, গলে মুণ্ডমালা, করে অসি! সাধক মৃদুস্বরে গাহিতে লাগিলেন:—

সদানন্দময়ী কালি! মহাকালের মনমোহিনী গো মা।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা করতালি।
আদি ভূতা সনাতনী শূন্য রূপা শশী ভালী।
যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিলনা মা গো, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন রাখ, তেম্নি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি॥
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি।
এবার অসি ধরে সর্ব্বনাশি, ধর্ম্ম কর্ম্ম দুটই খেলি॥

সাধক জগন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিতেছেন, অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত দৃশ্যমান সমুদয় জগৎ হাস্যময়। মা তুমি সদানন্দময়ী! জগতের কোন পদার্থই তোমা হইতে পৃথক নহে। নিত্য নিরঞ্জন অনন্ত কাল তোমার অনন্ত লীলার বশীভূত। কই দুঃখ কই, কই ক্রন্দন কই, কই ভীষণ ভাব কই, সবই আনন্দময়, সবই নৃত্যশীল, সবই প্রেমানন্দ পরিপূর্ণ।" আবার অন্তরে ব্রহ্মময়ীর রূপ দর্শন করিয়া বলিতেছেন, "একি! গলে মুণ্ডমালা! হা মা! তুমি যে আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা, তোমার আগেও কিছু ছিল না, প্রলয়ের পরেও কেবল তুমি থাকিবে, তবে এ রূপ কোথায় পাইলে, এ রূপ কে কল্পনা করিল।" পাছে রূপ কল্পনার প্রতি দোষারোপ করা হয়, ভাবিয়া আবার বলিলেন, "ওমা! আমার ধৃষ্টতা, আমি বুঝিতে পারি না, তুমি যেমনি বলাও তেমনি বলি, তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার যন্ত্রের উপাদান মাত্র,

যেমন করিয়া রাখিয়া যে নিয়মে চালাইবে সেইরূপ চলিব, কিন্তু মা মনের গোলমাল মিটাইতে পারিতেছি না, তোমাকে স্বরূপ বুঝিবার ক্ষমতা দাও নাই কেন? মা! তোমার প্রতি অভিমান করিয়া তোমাকে গালাগালি দিতে ইচ্ছা হইতেছে, যাহা হউক, তোমার মুণ্ডমালী রূপ সত্যই হউক, আর কল্পনা করাই হউক, কিন্তু কি মোহিনী শক্তি! তোমার এ রূপ ভাবিয়া আর কিছু ভাল লাগে না, ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ভুলিতে বসিযাছি।" সাধক যখন তখন সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিনী জাহ্নবীর তীরে আসিয়া পরিতৃপ্ত হৃদয়ে বসিতেন এবং বালকের ন্যায় জননীর কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিতেন।

সাধক কমলাকান্তের ধনাঢ্য শিষ্য অম্বিকায় প্রত্যাগত হইয়া গুরুপুত্রের সঙ্গীতদ্বারা লোকবিমোহনের অপূর্ব্বক্ষমতা আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। এখন সকলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া যারপর নাই সুখী হইলেন। প্রতি দিনই এক এক স্থানে বৈঠক হইতে লাগিল। সাধক কোকিল কণ্ঠে কালী গুণ কীর্ত্তনে, ভক্তি ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে পাষণ্ডকেও বিচলিত করিতে লাগিলেন। লোকসমাজে যশের প্রতিবন্ধক অহঙ্কার ও অভিমান। সাধক সেই অভিমান ও অহঙ্কারকে জগদম্বার নিকট বলি দিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। এক দিন ধনাঢ্য শিষ্যের পুত্র সাধককে বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি যেখানে সেখানে কালীনাম সংকীর্ত্তন করেন। লোকবিচার, স্থান বিচার, অবস্থা বিচার করেন না। হাড়ী, ডোম, চণ্ডালেরও অনুরোধে স্থান

বিচার না করিয়া কালীগুণ গান করেন। আমার বিবেচনায় তাহাতে আপনার গুরুত্বের লাঘব হয়।" সাধক হাসিয়া কহিলেন, "কেন বাবা! কালীনামের কি কালাকাল, স্থানাস্থান আছে? প্রেম পরমবস্তু, দক্ষিণের বায়ু আবরণ বিহীন স্থানে বড় সুখস্পর্শ হয়। বিষয়ী লোকের হৃদয়ের আবরণ বিষয়। সেখানে প্রেম-বাতাস বড় সুখে সঞ্চারিত হয় না, যদি সঞ্চারিত হয়, বিষয় আবরণ থাকাতে বাতাসে একটু গন্ধ থাকে। যদি বিষয়ী ব্যক্তি হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিতে পারেন, বিষয়ের প্রকৃত আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার উদার হৃদয়-কুসুম-উদ্যান হয়, প্রেম-কুসুমের সৌরভে নিজে উন্মত্ত হইয়া তিনি দশজনকে আকুল করিতে পারেন। তাদৃশ ব্যক্তির মুক্তি-ফল লাভ অতি সুলভে হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ ব্যক্তি সংখ্যায় অতি অল্প। সংসারে যাহারা গরীব, সংসারে যাহারা দুঃখী, তাহাদের হৃদয়ে বিষয় বাসনা বড় স্থান পায় না। আবর্জ্জনা শূন্য বলিয়া প্রেমের বাতাস সহজে সঞ্চারিত হয়। যেখানে প্রেম সেই খানেই মহাশক্তির আবির্ভাব। হৃদয় উদার না হইলে প্রেম আসে না। কুটিল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উদার চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। উদার হৃদয়ে কালীনাম বীজ বপন করিলে শীঘ্র শীঘ্র ভক্তি-তরু বর্দ্ধিত হইয়া সুফল প্রদান করে। কিন্তু বাবা, ইহা ত জানা নাই কাহার হৃদয় উদার, কে ভক্তিমান, আমি জানি আমার মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে। ভাল মন্দ বিচার তিনিই জানেন।" সাধক গাহিলেন:—

মা ! একথা আমারে বল, তোমার কেবা মন্দ কেবা ভাল।
বিদ্যারূপে দিয়ে জ্ঞান কারে কর পরিত্রাণ,
কারে অবিদ্যা আবৃত করে, মোহ গর্ত্তে টেনে ফেল ॥
জীবমাত্রে শিব বটে একথা অনেকে রটে,
যে সদানন্দ তাবে কেন নিরানন্দ হতে হল ॥
কমলা-কান্তের কালী মনের কথা মাকে বলি,
কারো সুখের উপর সুখ, কারো দুঃখে কেন জনম গেল ॥

সাধক বলিলেন, "বাবা ! কে মন্দ কে ভাল একথা বুঝিবার আমাদের ক্ষমতা নাই। আজ যে অতি মন্দ, কাল সে অতি ভাল হয়। মানব-মনের অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার শত শত উদাহরণ শাস্ত্রে পাইবে। ভাল মন্দ করা পরমাপ্রকৃতির ইচ্ছা। বাবা ! মানুষ মাত্রেই সকলেই ভাল, সকলেই সমান, তবে কেহ দুষ্কৃতি বশতঃ অবিদ্যার আশ্রয় লয়; ঘৃণা, অহঙ্কার, দ্বেষ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির বশীভূত হয়, কেহ বা সংসারের সদ্‌গুণ রাশির সুশীতল ছায়া অবলম্বন করিয়া কালী-কল্পতরু-মূলে চারিফল লাভ করে। পণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তি জীবমাত্রকেই শিব-ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। সদানন্দের আবার নিরানন্দ কি ? তাই বলি, মানবের ভেদ জ্ঞান আমাদের অজ্ঞান বশত হয়। তাই কাহাকে উচ্চ, কাহাকে নীচ কাহাকে সুখী, কাহাকেও বা দুঃখী দর্শন করি। এ অজ্ঞান আঁধার ঘুচাইবার একমাত্র ঔষধ কৃপাময়ীর ভক্তি প্রসূত জ্ঞানজ্যোতিঃ। বাবা ছোট, বড় কেহই নাই, সকলেই বড় হইতে চায়। এই পৃথিবীর ভিতর আমরা

কীট পতঙ্গ, আমাদের আবার ছোট বড় কি?" শিষ্য লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আপনাদের মত নির্ব্বিকার সাধু পুরুষের সুজন,' কুজন নাই, কিন্তু বাবা! আমাদের ত সাধু সঙ্গ চাই। নীচমনা, নীচ কুলোদ্ভব, কদাচারি-লোকের সহবাসে আমার বিশ্বাস প্রকৃতি দূষিত হয়। আপনি কি আমাকে উন্নত মনা সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণের সহিত সহবাস করিতে উপদেশ দেন না?" সাধক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে সৎ সহবাস করিতে বলি, কিন্তু নীচ বংশজাত ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করিতে বলি না। বাবা একথা মনে রাখিবে, মানুষ ধনে বড় হয় না, মনে বড় হয়, পাণ্ডিত্যে আচার বিচারে বড় হয় না, মনের শুদ্ধ ভক্তি ও তৎপ্রসূত জ্ঞানে বড় হয়। বড় বলিতে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া বুঝিবে। কাহার ভিতর কি আছে কে জানে। যার কালীনামে হৃদয় দ্রব হয়, তিনি আমার পরম আত্মীয়। কালীনাম অমৃত পানে যাঁর সতত পিপাসা, তিনি আমার মাথার চূড়ামণি।" সাধক আবার গাহিলেন :—

আচার বিচার নিত্য নয়।
যে সাধকের দার্ঢ্যভাব সে সত্যময় ॥
দেখ, একবস্তু নানামত সে পঞ্চতত্ত্বে অনুগত,
যাহাতে উপজে পুন তাহাতেই প্রলয়।
ধ্যান স্থির যে জনার, সেই ব্যক্তি সদাচার,
সে ব্রহ্মরূপ ভাবিয়ে আনে ব্রহ্মময়।

কমলাকান্তের চিত,   তটেতে তরণী পাত,
নানা দেশ ভ্রমণে কেবল দুঃখ চয় ॥

সাধক বলিতেছেন, "আচার বিচারে কি হয় বাবা। সে সব অনিত্য। কেবল মাত্র দৃঢ়াভক্তি সংসার সাগর পার হইবার একমাত্র উপায়। মানুষের মন দেখিয়া বিচার। দৃঢ়ভক্তি মনের। মন অপূর্ব্ব জিনিস। মানুষে কি আছে, ক্ষিতি, অপ ইত্যাদি পঞ্চভূতের বিকার মাত্র। এই পঞ্চভূত হইতে মানুষ জন্মিতেছে, আবার লয় হইতেছে, আবার জন্মিতেছে।

যে ব্যক্তি ধ্যানে স্থির সে ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্ব হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরমব্রহ্মে লীন করিতে পারে, এবং সেই ব্যক্তি-সদাচারী। বাবা বেশ ভূষাতে সদাচারী হয় না, পাণ্ডিত্যে বিচার হয়, কিন্তু মনের উপর বল পাণ্ডিত্য প্রদান করিতে পারে না। মন শরীরের রাজা, শরীর লইয়া দেশদেশান্তরে যাইবে কি, মন যে বাঁকা, নদী পার হইবে কি, কূলেই নৌকা ভাঙ্গিয়া গেল, মন বেঁকে বসল। কাশী গিয়া যদি কেবল সংসার চিন্তা আইসে কাশী না যাওয়াই ভাল। বাবা বোধ হয়, বেশ ভাল বুঝিলে না। ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানের পার। আচার বিচার পাণ্ডিত্য এ সকল অহঙ্কারের অঙ্গ, অতএব অজ্ঞান। অজ্ঞানের পর ভক্তি, তারপর জ্ঞান, তারপর ব্রহ্মলাভ। ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হইলে আচার-বিচার, অহঙ্কার থাকে না, শুদ্ধাভক্তি বিমল-জ্ঞান প্রসব করে, সেই শুদ্ধাভক্তি মনের। মন যার উচ্চ, মন যার বশ, মন যার মন কেবল মাত্র ঈশ্বর চিন্তায় রত, ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত, সেই সাধক,

তার আবার জাতি ভেদ কি? তার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? শুদ্ধাশুদ্ধ কি? সেই আমার গুরু, সেই আমার বন্ধু। কাহার মধ্যে কি জিনিস আছে, কে বলিতে পারে। মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে। কালীনাম বিতরণের পাত্রাপাত্র নাই। তাই আমি লোকবিচার, স্থানবিচার না করিয়াই কালীনাম ছড়াইয়া থাকি। শিষ্য পদস্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, বুঝিলাম, আমরা অহঙ্কার অন্ধকারে রহিয়াছি, উপর দিকে হাত বাড়াইয়া মনে হয়, বুঝি আমা অপেক্ষা এ জগতে বড় আর কেহ নাই।"

সাধক কিছুদিন জননীর সহিত পরম সুখে শিষ্যগৃহে বাস করিলেন। শিষ্যগণেরও অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের মুখে পুত্রের গুণানুবাদ শুনিয়া জননীর আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু এই দুঃখের সংসারে সুখের দিন স্থায়ী হয় না। প্রবল দুঃখ গ্রীষ্মের মধ্যে সুখের বায়ু ক্ষণকালের জন্য তাপিত অঙ্গকে শীতল করে, আবার যে গ্রীষ্ম সেই গ্রীষ্ম, যে জ্বালা, সেই জ্বালা। প্রচণ্ড কালের পীড়নও ভীষণ। মাস, দিন মুহূর্ত্ত তাহার ভুল হইবার নহে। প্রতিদিন দৃশ্যমান রবি-চন্দ্রের ন্যায় ভবিতব্যের উদয় অস্ত অতি নিশ্চিত, কিন্তু সংসার বিধাতার ইচ্ছায় সে ভবিতব্য মানব চক্ষে যাদুকরের হস্তস্থিত গুটিকার ন্যায়, তাহার অস্তিত্ব, আবির্ভাব, তিরোধান মানব চক্ষে শূন্য আকাশের ন্যায়।

সেই ভবিতব্যের বিধাত্রী জগদম্বা নিতান্ত শরণাগত সাধকের প্রতি সদয়, তিনি সাধকের সংসার বন্ধন ক্রমে শিথিল করিলেন।

কিছুদিন শিষ্যগৃহে বাস করিয়া সাধক জননী পীড়িতা হইলেন। পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাধক সহোদরকে চান্না হইতে আনাইলেন। শিষ্যগণ সুবৈদ্য দ্বারা জননীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যু রোগের ঔষধ নাই। জীবনী শক্তি না থাকিলে ঔষধ সকল ফলদায়ী হয় না। জননীকে জাহ্নবীতীরস্থ করা হইল। সাধক পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তিনি যাঁহার অকৃত্রিম স্নেহে সংসারে বদ্ধ ছিলেন, সেই জননীকে মৃত্যু শয্যায় শায়িত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সংসারের মায়া এমনি ভয়ঙ্কর, উদার হৃদয়কেও ব্যথিত করে। রক্তমাংসময় শরীর ধারণ করিয়া সকলকেই তাহার শাসন সহ্য করিতে হয়। যে দেহকে মায়া জন্মের মত পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে দৃঢ়রূপে দংশন না করিয়া পরিত্যাগ করে না। সাধক অপার দুঃখে, কাতর নয়নে, রোগ কাতরা, ক্ষীণ কলেবরা, সংসারের সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী জননীর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য অসহ্য। সাধক সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী বিমলাকে হৃদয় মধ্যে ধ্যান করিলেন, কিন্তু আনন্দময়ীর প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলেন না। আনন্দময়ীর আবির্ভাবে হৃদয়ে দুঃখের অধিকার থাকে না। শত দুঃখ, শত শোক, শত আপদ বিপদের ব্যাকুলতা আনন্দময়ীর প্রেম স্রোতে কোন দিকে চলিয়া যায়, কিন্তু জীবন সর্ব্বস্ব জননীর মৃত্যুশয্যা পাশে বসিয়া, তাঁহার কাতর নয়নের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সাধক আনন্দময়ীকে পূর্ণভাবে হৃদয়ে দর্শন করিতে পারিলেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে বিষমতর বিষণ্ণ হইতে

লাগিলেন। জননীর অন্তিমকাল পর্য্যন্ত সংজ্ঞা ও বাক্‌শক্তির লোপ হয় নাই। কাতর নয়নে ক্ষীণকণ্ঠে পুত্রবৎসলা পুত্রকে আবার সেই অনুরোধ করিলেন, "কমল! বিরাগী হয়ে দেশ ছেড়ে যেয়োনা, ভাইকে দেখো, বউমাকে শ্রদ্ধা করো।" জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কমলাকান্তের কোমল হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি বাষ্পপূর্ণ নয়নে, গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "মা! আপনার আজ্ঞা কখনও অবহেলা করি নাই, করিবও না, আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন অভাব হইবে না।" এই বলিয়া জননীকে এ সময় মায়ামোহ দুঃখে কাতর করা উচিত নহে, ভাবিয়া কহিলেন, "মা! সর্ব্বদুঃখহারিণী শমন ভয় বারিণী ভবানীকে ডাকুন।" জননী বলিলেন, "বাবা! তুমি' কালীনাম শোনাও, তোমার মুখের কালীনাম বড় মধুর।" সাধক জননীর শিয়রে বসিয়া সজল নয়নে হৃদয়ভেদীস্বরে "কালী কালী" বলিয়া নাম শুনাইতে লাগিলেন। জননীর হৃদয় প্রেম পরিপূর্ণ হইল। তিনি কৃতান্ত দলনী নবজলধর বরণীকে হৃদয় মন্দিরে স্থাপন করিয়া সংসারের মায়ামোহ দূরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন। মানুষের পবিত্র ভাবে জীবন যাপনের পরিচয় তাহার মৃত্যুকালে পাওয়া যায়। কথাই আছে "জপ তপ কর কি, মর্‌তে জান্‌লে হয়।" নরজীবনের একমাত্র ভীষণ সঙ্কট সময় মৃত্যুকাল। সেই সময়েই কেবল মানুষের স্বরূপত্ব আসে, সে সমস্ত জীবন যে ভাবে যাপন করিয়াছে, কেবল তাহারই অভিনয় করে। জননী মায়ামুগ্ধ হইলেও সাত্ত্বিকভাবে জীবন-যাপন করিয়াছেন, চৈতন্যরূপিণীকে চিত্ত পিঞ্জরে মাঝে মাঝে বাঁধিতে

অভ্যাস করিয়াছিলেন, আজ তাই পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়াও মহামায়াকে মায়া হইতে পৃথক করিয়া এই সঙ্কট সময় হৃদয়-পদ্মে দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যায় পতিত হইয়া অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে স্থিরভাব, পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়াও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, অপরিসীম প্রেম ভক্তি, অভ্যাস ব্যতীত কখনই সম্ভব নহে। মৃত্যুর সময় ব্যাকুলতা বদ্ধজীবের লক্ষণ। গত কৃত-পাপকর্ম্মের অনুশোচনা, তৎকর্ত্তৃক মর্ম্মপীড়া, প্রলাপ ও তদনু অজ্ঞান ভাব পাপাত্মার পরিচয়। জননী পুত্রমুখ নিঃসৃত কালী-নামামৃত পান করিতে করিতে ক্ষীণস্বরে অস্পষ্ট ভাবে "কালী কালী" বলিতে লাগিলেন। বদন প্রসন্ন, তিনি যেন কোন পরি-চিত সুখের স্থানে যাইতেছেন, যেন কত কষ্টের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। ক্রমে জননীর চরম সময় উপস্থিত। তাঁহাকে অন্তর্জলী করা হইল। অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে স্থাপিত হইল। জননী জাহ্নবী দর্শন করিয়া চিরকালের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিলেন। সাধকের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, অবিরল ধারায় নয়ন জল বিসর্জ্জন করিতে করিতে চিরকালের জন্য জননীর মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। যথাবিধি সতী-অঙ্গ দাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সাধক গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক নববস্ত্র পরিধান করিলেন। নববস্ত্র কেন? শাস্ত্রের বিধান। শাস্ত্রের বিধান কি উদ্দেশ্য বিহীন? কখনই নয়। নববস্ত্র পরিধানে মনের প্রসন্নতা আসে; প্রসন্নতা ও দুঃখ, আলো ও অন্ধকার, এক স্থানে অবস্থান করিতে পারে না, বিলাস দ্বারা দুঃখ দূরীকরণ—এই কি উদ্দেশ্য? অথবা

রোগ মাত্রেই সংক্রামক, রোগীর সংস্রবের বস্ত্র পরিত্যাগ, এই কি নববস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য? অথবা যেমন জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া মানুষ নববস্ত্র পরিধান করে তেমনি আত্মা জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর আশ্রয় করে; গীতার এই বাক্য শোকের সময় সুধীগণের স্মরণ করাইয়া শান্তি প্রদানই কি নব-বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য? যাহা হউক সাধক ও কনিষ্ঠভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ নববস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। শিষ্যগণ যথাসাধ্য সাধক ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার শোক-শান্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদেরই চেষ্টায় সাধক-জননীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া গঙ্গাতীরে যথাবিধি সম্পন্ন হইল। সাধক মাতুল, ভ্রাতা ও স্বজনগণের সহিত অতি দুঃখিত মনে চান্নায় প্রত্যাগমন করিলেন।

জননী বিয়োগে সাধক সংসার শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন, গৃহে বাস করিতে অক্ষম। অন্তরে অভয়া বরদা, নয়নে জননী মূর্ত্তি নৃত্য করিতে লাগিল। হৃদয় আকাশে বৈরাগ্য ঘনাবলি গাঢ়তম হইতে লাগিল, শোকের বায়ু ভক্তি প্রেমধারা বর্ষণে তাঁহার হৃদয়কে সবল ও সারবান করিবার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। তিনি ভীত হইলেন। ভ্রাতা বিবেক বিহীন, অতএব তাঁহা অপেক্ষা অধিক শোকাতুর। ভ্রাতার সান্ত্বনা অতি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। পান্থ নিবাসের ন্যায় গৃহ শূন্য বোধ হইলেও অধিকাংশ সময়ই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। সংসারের ব্যয়ভার অধিকার শিষ্য গ্রহণ করেন। ভ্রাতার বিবাহ হইল, সাধক-পত্নী

চান্নায় আসিলেন। সাধককে বাধ্য হইয়া অনেক সময় সংসার চিন্তা করিতে হয়। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল।

সাধক অন্তর্দৃষ্টি জগদম্বার চরণে রাখিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। সময় পাইলে, নির্জ্জন পাইলে শরীর, মনপ্রাণ, পরমেশ্বরীর চরণ-পদ্মে সমর্পণ করেন, বালকের ন্যায় কাঁদেন, অবিরল ধারায় অশ্রু বিগলিত হয়, যেন কোন অজানিতদেশে অজানিতগৃহে কিম্বা কারাগারে মহাকষ্টে আছেন। সতত ভয়, পাছে মাকে হারাই, মনের মত মনকে হারাই। তিনি বেশ বুঝিয়া ছিলেন, স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা-ভগিনী ভরা ঘরটী মানুষকে প্রেম ঘরের সন্ধান করিতে দেয় না। পরমানন্দপূর্ণ ঘরের কথা একেবারে ভুলাইয়া দেয়। মহা-মায়া ক্রমে মনের চারিধারে মায়ার পর্দ্দা ফেলিয়া দেন। তাই সাধকের এত ব্যাকুলতা। এ সংসারে দুঃখ, বিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু যাঁহার ভীষণ দুঃখে ও শোকে প্রজ্ঞা বিনষ্ট না হয়, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। সাধকেব মহাদুঃখেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি ক্ষণকালের জন্যও সর্ব্বদুঃখহরা জ্ঞান দায়িনীকে বিস্মৃত হন নাই।

জীবনে দুঃখের উপর দুঃখ আইসে। সুখের পর সুখ আইসে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম; জলেব উপর জল হয়; রৌদ্রের উপর রৌদ্র হয়। দুঃখ নিগূঢ় ভাবে সুখের কারণ হইলেও মানব ভবিষ্যতের উপর ভরসা করিয়া হাস্য মুখে দুঃখ সহ্য করিতে পারে না। যাঁহারা সুখ দুঃখে অনুদ্বিগ্ন-চিত্ত মহাদুঃখে কেবল তাঁহাদেরই প্রজ্ঞা

ও শান্তি বিনষ্ট হয় না। সাধকের জীবনের স্রোত অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতি অদৃশ্যভাবে কার্য্যকর হইতেছে। সাধক পত্নী পীড়িতা, পীড়া গুরুতর; আরোগ্যের আশা নাই। সাধকের শ্বশুর ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলেই উপস্থিত। সকলেই নির্ব্বাক ও নতমুখে অবস্থান করিতেছেন। সাধকের শ্বশ্রূ-দেবী প্রিয়তমা কন্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সাধক গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি চলিলে! যাও", আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি বাহিরে আসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন; দেখিলেন, আকাশের কোলে ভুবনমোহিনী এলোকেশী, হাস্যময়ী, দুঃখের লেশ মাত্র নাই, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে তাহার পত্নী জগদম্বার পার্শ্বে বসিয়া প্রেমপূর্ণ নয়নে হাস্যমুখে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সাধক ভাবিলেন, আমার পত্নীই ধন্য, আমার সহবাস প্রিয় না হওয়াতে তিনি পূর্ণানন্দময়ীর সহবাস পাইয়াছেন। আমি কি আমার চির অভিলষিত ওই সহবাস পাইব। আকাশের পানে তাকাইয়া মাকে হৃদয়ে, আকাশে, চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত দেখিয়া সাধক বালকের মত কত কি বলিতেছেন, এমন সময়, গৃহে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল; তিনি দেখিলেন, গৃহ হইতে এক জ্যোতিঃ বিদ্যুতের ন্যায় আকাশ ভেদ করিয়া ছুটিতেছে, অবিচলিত ভাবে সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ ও দুঃখে নিমগ্ন হইয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃত দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত

হইল, তিনি পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলেন, "আধারভূতা- জগতস্ত্বমেকা" তবে আমাদের আসা যাওয়া কি ? যেখানে আছি, সেই খানেই থাকিব, আবার ভাবিলেন, তাঁহাতেই আছি এ কথা সত্য, বীজ ত মাটিতেই থাকে, রস গ্রহণের শক্তি চাই, তবে বীজ অঙ্কুরিত ও ফলবান হয়, সাধনা দ্বারা আমাদিগকে রস গ্রহণের শক্তি উপার্জ্জন করিতে হইবে ; ভ্রাতা কাঁদিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "দাদা ! আমরা অল্পদিন হ'ল মা হারায়েছি, আজ আবার ঘরের লক্ষ্মী চলে গেলেন, দাদা একি ! হল।" সাধক কহিলেন, "কেঁদোনা ভাই, সকলি জগদম্বার ইচ্ছা, আমাদের ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে, বিধির লিখন কারো খণ্ডিবার হাত নাই, কাঁদলে কি হবে, চল সৎকারের উপায় দেখি।" এ সংসারে মানবের শেষ সঙ্গী বাঁশের দোলা আনীত হইল। পথের সম্বল ছেঁড়া কাঁথা, পাঁচকড়া কড়ি, কলসী ও কাচা মাত্র গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে দেওয়া হইল। সমুদয় গ্রাম শোকার্ত্ত, মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনিতে মনের ঔদাস্য জন্মাইয়া, শবদেহ শ্মশানে সমানীত হইল।

শ্মশান খড়ী নদীর তীরে, দেবী বিশালাক্ষীর অনতিদূরে। সাধক শ্মশানকোলে বসিয়া দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিয়া শূন্যমনে কি ভাবিতেছেন, ভাবিতে ভাবিতে বালকের ন্যায় কাঁদিলেন। কাঁদিলেন কেন ? বোধ হয় মন্দিরস্থিত তপস্যা দ্বারা মায়ের জাগরিত মূর্ত্তি সাধকের মনে পড়িল। মানব মহা- দুঃখে পরম আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাতে মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারে না, আত্মীয়ের দুঃখ মোচনের ক্ষমতা না থাকিলেও দুঃখের

ভার লইয়া আত্মীয় স্বজন শোকের লাঘব করে। সাধকের জগতের মধ্যে পরমাত্মীয় জগদম্বা, একমাত্র ভালবাসার পাত্র, দেবী বিশালাক্ষীর পদপ্রান্তে বসিয়া মনের কথা বলিতেন, তাই আজ তাঁহার স্মরণেও দর্শনে শোকের উচ্ছ্বাস উঠিল। শোকে, দুঃখে, আপদে, বিপদে, সুখে, সম্পদে যাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলা যায়, তিনি ভিন্ন এ জগতে আপনার কে হইতে পারে। সাধক-পত্নীর মৃতদেহ চিতায় স্থাপিত হইল। সাধক চারিদিকে শ্মশানরঙ্গিণীর নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, শ্মশানই আমার পরম রমণীয় শান্তির স্থান। আমার মা শ্মশানবাসিনী, বাবা মৃত্যুঞ্জয় শ্মশানবাসী। আমার গর্ভধারিণী এই শ্মশানে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। পত্নীও এই শ্মশানের কোলে শয়ন করিল। একে সাধকের স্বতই বৈরাগ্য, মানব মাত্রেরই শ্মশানে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাই এই মহাদুঃখে সাধকের সহাস্য বদন, যেন কোন রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সুখশান্তি ভোগ করিতেছেন। সৎকারের উপযোগী দ্রব্যাদি আনীত হইতে লাগিল। সাধক শ্মশান কোলে বসিয়া প্রসন্ন মনে ভাবিতেছেন, "মানুষ মাত্রেই চরমে এই শ্মশানকে আশ্রয় করে। এখানে অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই, ধনমদ নাই, জাতি বিচার নাই, তবে কি ইহা স্বর্গ, পূর্ণানন্দময়ী যথা নৃত্য করেন, তাহা স্বর্গ অপেক্ষাও বাঞ্ছনীয়। শ্মশানই সাধনার প্রশস্ত স্থান। এখানে সংসারের ঘৃণা, দ্বেষ, আশা, ভরসা, মায়া, মোহ, আচার, বিচার সব ধ্বংস হইয়া অঙ্গাররূপে পরিণত হয়। এখানে আসিয়া

ঘসিলে ওসকল মনকে ব্যথিত করিতে পারে না, কাজেই চিত্ত শুদ্ধ হয়, প্রেম আইসে, আনন্দ আইসে, হৃদয়ে আনন্দময়ীর আবির্ভাব হয়, আবির্ভাব স্থায়ী হয়। চিন্ময়ী চিন্তাপুরে উদয় হন, জীবাত্মার সহিত মিলিত হন, পরমাত্মা ও পূর্ণানন্দময়ী এক হন।" মুখাগ্নির জন্য সাধককে আহ্বান করা হইল। তিনি মুখাগ্নি প্রদান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন :—

কালি! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের বচন, আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা॥
তোমার যারে কৃপা হয় তার সৃষ্টিছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কোপিন যোটেনা, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাসে, তুচ্ছ ভাবে মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌লো না তার সিদ্ধি ঘোটা॥
দুখে রাখ, সুখে রাখ, করবো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর পুঁছ্‌তে কি পারি সাধের ফোঁটা॥
জগত জুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥

চিতাগ্নি মধ্যে জগদম্বার আবির্ভাব দেখিয়া সাধক চিতার চারিপার্শ্বে নৃত্য করিতে করিতে করযোড়ে সঙ্গীতসুরে কহিতেছেন, "মা আমার সংসারের সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিলে, এখন শিববাক্য সত্য হ'ক। মা আমাকে কৌপীন দাও, ভস্ম দাও, মাথায় জটা দাও, সৃষ্টিছাড়ারূপে সাজাও! মা! লক্ষপতির প্রাসাদ অপেক্ষাও এই শ্মশান যেন আমার প্রিয়তম বোধ হয়। আমাকে সচ্চিদানন্দ

ভাব দাও, আমার জীবন যেন জগতের মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হয়। মা! আমি যেন সুখ দুঃখ সমান বোধ করি। আমার কপাল মাঝে কালী নামের দাগ উঠেছে, দেখো যেন মা! এ দাগ পুঁছে দিও না। মা! দেশময় রব তুলেছ, কমলাকান্ত মায়ের বেটা। তুমি মায়ের মত মা হও, স্নেহ মমতা ছেড়োনা, আমাকে ভক্তি দাও, যেন উপযুক্ত সন্তান হ'তে পারি।"

শবদাহকারীরা বিস্মৃত হইয়া আনন্দনৃত্য দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "এরূপ লোকের সংসারী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ইনি সর্ব্বদুঃখহরা সিদ্ধেশ্বরীর নিতান্ত আশ্রয় লইয়াছেন, তাই কৃপাময়ী ইহাকে মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া পরিণামের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। পুনর্ব্বার ইহার বিবাহ দিয়া ইহাকে সংসারী করিবার চেষ্টা করা বিফল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। হরিধ্বনি পূর্ব্বক সকলে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। হরিনাম উচ্চারণে মনের ময়লা থাকে না। শববাহীরা পুনঃ পুনঃ হরিবল হরিবল শব্দে গ্রাম প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রামবাসীদিগের মনে সকল বস্তুর অনিত্যতা উৎপাদন ও সাধকের সাংসারিক অবস্থা স্মরণ করাইয়া তাহাদিগকে ব্যথিত করিল। সাধক যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পত্নীগ্রহণ সময়ের অঙ্গীকার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন; ভ্রাতৃ হস্তে সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদাই পরমার্থ চিন্তায় রত হইলেন। মাতৃ আজ্ঞা স্মরণ করিয়া দেশ ত্যাগ করিলেন না।

পঞ্চম অংশ

ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় বিশু প্রভৃতি ডাকাইতের সহিত সাধকের সাক্ষাৎ ও বিশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ।

মনের মত মন হওয়া বড় সৌভাগ্যের বিষয়। সৎসঙ্গ ও সদালাপ মনে করিলেই ঘটে না, পঞ্চভূত আছে, দেহ আছে, মন আছে, মায়া আছে, তার পর আত্মা। আত্মা পরমেশ্বরের অংশ। মায়া তাঁহার ইচ্ছা বা সংসার স্থাপনের যন্ত্র। প্রকৃতি ও মায়ার সম্মিলনে এ বিশ্ব কার্য্যকর হইয়া চলিতেছে। স্নেহ, মমতা, অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্য বাসনা, উৎপাদিকাশক্তি এই সকল ধর্ম্ম মায়ার। যে প্রকৃতিতে মায়ার জমাট বেশী বাঁধে, তাহাকে মায়া সংসারে চির সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখেন। পঞ্চভূতের বশীভূত করিয়া রাখেন। মানব-মন মায়ার বশবর্ত্তী হইলে আত্মার সহিত তাহার নির্ম্মলদৃষ্টি ঘটে না। মায়ার ধোঁয়া মনকে কলুষিত করে, মনের ময়লা আত্মায় লিপ্ত হয়। ধূম পরিপূর্ণ গৃহস্থিত স্বর্ণখণ্ডের ন্যায় আত্মা মায়ার দেহকে অবলম্বন করিয়া কলুষলিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। সেই কলুষ মোচনের ও আত্মার স্বকীয়ভাব সম্পাদনের অর্থাৎ আত্মার মুক্তির একমাত্র ঔষধ সদালাপ, সৎসঙ্গ সৎকর্ম্ম, ঈশ্বরে ভক্তি ও জ্ঞান। কর্ম্ম অসংখ্য, জ্ঞান অনন্ত, ভক্তি এক, ভক্তি হইতেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সাধক কমলাকান্ত

পরমাভক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এখন তারার নাম ব্রহ্ম, তারার ধ্যান ব্রহ্ম, সার ভাবিতেছেন। তাঁহার মন, বুদ্ধি ও আত্মা নির্ম্মলভাবে পরস্পরকে দৃষ্টি করিতেছে। তিনি এখন সংসারকে অন্যভাবে দেখিতেছেন, মায়ার বৈচিত্র্য নাই, মায়ার বিভীষিকা নাই, মায়ার ক্রন্দন নাই, মায়ার অন্ধকার ছুটিয়া গিয়াছে, তিনি প্রেমালোকে জগৎ হাস্যময় দেখিতেছেন। সংসার পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে স্তরে স্তরে চুড়া পর্য্যন্ত দুঃখ, অভাব ও ব্যাধি কণ্টক এবং পর্ব্বতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ভীষণ মৃত্যু-শিলাকে অবলোকন না করিয়া তিনি প্রেমালোকে সংসার পর্ব্বত জ্যোতির্ম্ময় দেখিতেছেন, ভক্তি ও জ্ঞান সোপানে আরোহণ করিয়া সংসার পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

জননী ও পত্নীব পরলোক গমনে প্রীতির প্রিয় হাস্য সাধককে পরিত্যাগ করিল না। স্মরণ-রাক্ষস মধ্যে মধ্যে মনকে আক্রমণ করিলে, জ্ঞান-বাণ দ্বারা তাহাকে প্রতাড়িত করিতেন। সর্ব্ব-দুঃখহরা হৃদয়-বাসিনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাতে পিতা মাতা ও পত্নীর অবস্থান দৃষ্টি করিয়া সুখী হইতেন। দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাব উপর্য্যুপরি, সাংসারিক বিপদেব কথা উল্লেখ করিয়া সহানু-ভূতি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাদের সহিত তত্ত্ববোধিনী কথা প্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেন, তাঁহাদিগকে তাঁহার বিপদের কথা উল্লেখ করিবার অবসর দিতেন না, সংসারের অনিত্যতা প্রতিপন্ন

করিতেন, নিত্যবস্তু ভক্তি ও প্রেম, একথা বিশদরূপে বুঝাইয়া তাঁহাদের অন্তর সরস করিতেন ও বৈরাগ্য জন্মাইতেন। তাঁহারা ভাবান্তরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া নিজ নিজ বন্ধুবান্ধবের নিকট তাঁহার মহদ্ভাবের গল্প করিয়া সুখী হইতেন। সাধকের বন্ধু কেণারাম চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। গুসুড়ের মহোৎসবের সময় কেণারামের সহিত সাধকের সাক্ষাতের পর কেণারাম মধ্যে মধ্যে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া সুখী হইতেন, সাধকও শ্যামা পূজার পর কেণারামের গৃহে পদার্পণ করিয়া তাঁহার গৃহ পবিত্র করিতেন। কেণারামকে সাধক অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। বিষম দুঃখ, কি শোকের সময় প্রিয়তম ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইলে মানব মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারে না, কিন্তু কেণারাম শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার সহাস্য বদন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন মন্দির মধ্যে দেবী বিশালাক্ষীমূর্ত্তি, চন্দন চর্চ্চিত, দেবীর পদে জবা ও বিল্বপত্র, সম্মুখে বিল্বপত্র আচ্ছাদিত পূর্ণঘট, পার্শ্বে (কুশাসনে) সাধক উপবিষ্ট, গলে রুদ্রাক্ষমালা, বাস লোহিত বস্ত্র। কেণারাম ভক্তিভরে দেবীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সাধককে অভিনন্দন পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সাধক কেণারামকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নয়নে দর্শন আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কেণারাম সাধকের দুর্ঘটনার কথা উত্থাপন করিলে সাধক গাহিলেন :—

সুখের বাসনা করোনা ক'দিন।
ত্যজি অন্য ফল, কালী কালী বল, মানব জনম য'দিন ॥
পাবে ব্রহ্মপদ, অক্ষয় সম্পদ, স্মরণ করিবে এ দীন।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাহা হইতে হয়, সে হবে তাহার অধীন॥
যখন যেমন, বিধির লিখন, সেইরূপে যাবে সে দিন।
ভাবিলে বিষাদ, ঘটিবে প্রমাদ, কালী না বলিবে যে দিন ॥
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত, ভুলেছ ন'মাস ন'দিন।
বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি, যাতনা সবে কত দিন।

সঙ্গীত শেষ করিয়া সাধক কহিলেন, "ভাই! এই ত মানব জন্ম, দুই তিন দিনের জন্য, যদি এই অল্প সময় সংসারের ভোগ সুখের জন্য লালায়িত হইয়া কাটাইবে তোমার অনন্ত পরকালে কি হইবে একবার ভাবিবে না। ভাই! তাই বলি, অনিত্য ভোগ বিলাসের আশা পরিত্যাগ করিয়া কালী কালী বল। তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর, তন্ময় হইতে চেষ্টা কর। লাভ প্রচুর, দেখিবে কি আনন্দ প্রাপ্ত হইবে, অক্ষয় সম্পদ, ব্রহ্মপদ লাভ করিবে। ত্রিগুণধারিণী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-প্রসবিনী তোমার সাধনার বশীভূত হইবেন। কর্ম্মী হও, তবে এ দীনের কথা সফল হইবে। জীবনের সাংসারিক সুখদুঃখ বিধান ব্যবস্থায় যাহা ঘটিবে, বিধির ইচ্ছায় তাহা ঘটিবেই, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিও না, সে সকল ঘটনাকে মনো-মধ্যে স্থান দিও না, যদি দাও, তাহা হইলে জানিবে বিপন্ন হইলে, তোমার পরম পথে কণ্টক পড়িল। সর্ব্বদা কালী কালী বলিয়া পথ পরিষ্কার রাখ। ভাই এই বড় দুঃখের বিষয়, আমাদের

কি ভ্রম ঘুচিবে না ; পুনঃ পুনঃ গর্ভযন্ত্রণা, এই সব অসীম দুঃখ রাশি স্মরণ করিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না !" কেনারাম কহিলেন, "আপনিই ধন্য, আপনার মনের বিকার কখনও দেখিলাম না, আপনি কর্ম্মী ও আমরা জল্পনাশীল, কি করিয়া মন বশীভূত হইবে, এই তর্কেই আমরা এ জীবন কাটাইয়া দিব, কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইব না, নির্জ্জনে বসিব না, সংসার ভুলিবে না, ধ্যান-ধারণা করিব না, নয়ন জলে ভিজিব না, সোজা পথে যাইব না, পথ কণ্টকময় জানিয়াও সেই পথে যাইব, শেষে কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হইয়া আকুল হইয়া পড়িব, আবার কণ্টককে আলিঙ্গন করিয়া গড়াগড়ি দিব, চিৎকার করিব, রুধিরাক্ত কলেবর হইব, শিরে করাঘাত করিব, তথাপি কণ্টক ত্যাগ করিব না, পশ্চাৎপদ হইব না।" সাধক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সে দৃশ্যও বড় মন্দ নহে, জগদম্বার সংসার-নাট্য-মন্দিরে এ প্রহসন ঘরে ঘরে," "শ্যামা মা উড়াচ্ছেন ঘুড়ী সংসার বাজারের মাঝে .... ঘুড়ী লক্ষে ছুটো একটা কাটে হেসে দেন মা হাত চাপুড়ী।" তুমি যে বলিলে, পশ্চাৎপদ হইব না, তাহা কি সহজ কথা, তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করিও না, ভক্তি পাইবার উপযুক্ত হইয়া কেবল ভক্তি চাও, তাহা হইলেই কণ্টকময় পথ ত্যাগ করিতে পারিবে . আরও বুলি, তুমি যে অনুতাপ করিলে সে অনুতাপও ভাল। অনুতাপে বোঝা যায়, মন কর্ম্মী হইতে চায়। মন যদি [illegible] পথে দাঁড়ায়, তাহাকে সুপথের পথিক করা বেশী কষ্টসাধ্য নহে। তখন জানিবে মন ভ্রমর হইয়াছে, আর কলুষ প্রিয় মাছি নাই,

সে মধুপান করিতে চায়, তাহাকে মায়ের পাদপদ্ম দেখাইয়া দাও, সে মধুপান করুক। পাদপদ্মের এমনি গুণ, বঞ্চনা নাই, পিপাসু হইলে মানব মন তৃপ্তি লাভ করিবেই, প্রেম-মধুপানে বিভোর হইয়া সংসার ভুলিয়া যাইবে। সাধক আবার গাহিলেন :—

শ্যামা ? ভাল ভেবেছ মনে।
যে ওপদে আশ্রয় লয়, তারে বিষয় বিষে রাখ্‌বে কেনে॥
কিঞ্চিৎ করুণাময়ী কালী যদি চাও নয়নে।
তবে নিরানন্দ দূরে যায় মা ! সদানন্দ সুধাপানে॥
বিষয় পথের পথিক যারা, সে চল্‌বে কেন তাদের সনে।
সে একাকী বিরলে বসে, হেসে হেসে চায় যাত্রিগণে,
কমলাকান্তের এই নিবেদন মা শ্রীচরণে,
আমার একুল গেল, ওকুল রাখ, সকূল হও নাথের বচনে॥

ভাই রে ! যে ব্যক্তি মায়ের নিতান্ত আশ্রয় গ্রহণ করে তার কি বিষয় বাসনা থাকে। অরুণ উদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তার নিরানন্দ পূর্ণানন্দময়ীর দৃষ্টিতে কোন্ দিকে চলিয়া যায়। ভোগ সুখ বিষয় বাসনাতে সে ব্যক্তি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তুমি ভোগ-বিলাস পিপাসু লোকের কণ্টকাকীর্ণ পথে গমনহেতু যে দৃশ্যের কথা এখনি বলিলে, সেই দৃশ্য সে ব্যক্তি দর্শন করিয়া এ সব মায়ের লীলা বলিয়া হাস্য করেন। ভাই রে ! এখন ত মনে হইতেছে সোজা পথে দাঁড়াইয়াছি, পথের সম্বল কেবলমাত্র তন্ত্রোক্ত শিব বাক্য। এখন সচ্চিদানন্দ নিকেতনে পৌছান পূর্ণানন্দময়ীর ইচ্ছা।”

কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত এইরূপ সদালাপে দিবস অতীত

হইল। কার্ত্তিকের শেষ, সায়ংকাল উপস্থিত, শিশির মণ্ডিত সূর্য্যদেব অতি সুখস্পর্শ হইয়া পশ্চিম গগনে শয়ন করিতেছেন। আকাশ অতি নির্ম্মল, প্রকাণ্ড নীল পট্টের ন্যায় বৃহৎ তরুরাজির অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে। আজ শুক্ল ত্রয়োদশী, সুষমা সজ্জিত, প্রায় পূর্ণ কলেবর প্রিয়দর্শন নিশানাথ সুনীল পূর্ব্বগগনে ইতি মধ্যেই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। বর্ষার অবসান হইলেও খড়্গেশ্বরী পূর্ণ কলেবরা, তীব্র বাহিনী। নদীপারে গমনাগমনে নৌকার প্রয়োজন। সাধক কেনারামকে বিদায় দিয়া নদীপারে শৌচার্থে চলিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রদোষ সময়ে নদীপারে যাইতেন। নৌকা-বাহীরা তাঁহাকে পার করিবার জন্য দেবী বিশালাক্ষীর ঘাটের নিকট উপস্থিত থাকিত। চান্না গ্রামের পার ঘাট দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির হইতে কিছু দূরবর্ত্তী ছিল। নৌকা-বাহীরা চান্নার পার ঘাটে সর্ব্বদা থাকিত, কেবল সাধককে পার করিবার জন্য সকাল সন্ধ্যায় দেবী বিশালাক্ষীর ঘাটে আসিত। সাধক ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, নৌকা-বাহীরা উপস্থিত নাই। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নৌকা বাহীরা দেবী বিশালাক্ষীর ঘাটে আসিবে এমন সময় কয়েকজন ভদ্রলোক তাহাদিগকে পার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নৌকা-বাহীরা কহিল, "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, [illegible] হইয়াছে, এতক্ষণ নিশ্চয়ই দেবীর পার ঘাটে আমাদের ঠাকুর [illegible]সিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে পার করিয়া শীঘ্র আসিয়া আপনাদিগকে পার করিতেছি।" ভদ্রলোকেরা কহিলেন, "আমাদিগকে অনেক দূর

যাইতে হইবে, রাত্রি হইবে, অগ্রে আমাদিগকে পার করিয়া দাও, তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পার করিও।" এমন সময় সাধক নদীকূলে দাঁড়াইয়া খড়্গেশ্বরীর গৌরবগমন এবং প্রতিতরঙ্গ বিক্ষেপে আনন্দময়ীর নৃত্য অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পূরবীরাগে গাহিলেন :—

লয়ে চল ভব নদী পার (গো মা মোরে)।
আমি অতি অকৃতি অধম দুরাচার ॥

নৌকাবাহিরা ভদ্রলোকদিগকে কহিল, "মহাশয়রা ওই শুনুন, আমাদের ঠাকুর বিশালাক্ষীর ঘাটে আসিয়াছেন, তাঁহার মধুর গান শুনিয়া আমাদের হাতের হাল আল্‌গা হইতেছে!" ভদ্রলোকগণ কহিলেন, "তোমাদের বিলম্বের কারণ ঠাকুরকে বলিলে তিনি নিশ্চয়ই সুখী হইবেন, তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন, আমাদের রাত্রি হইবে, আমাদিগকে অগ্রে পার করিয়া দাও, তোমাদিগকে পারের পয়সা দ্বিগুণ দিব।" দূরবর্ত্তী বংশীধ্বনির ন্যায় সাধকের কণ্ঠস্বর খড়্গেশ্বরীর উভয়কূল উল্লাসিত করিয়া আবার শ্রুত হইল :—

সম্বল আছিল যার, অনায়াসে হ'ল পার,
কিছু ধন নাহিক আমার (যে নাবিকে দিব মা)
প্রদোষ সময়ে, ধরম তরি বায় নেয়ে,
চেয়ে আছি চরণ তোমার (গো কৃপাময়ী)

নৌকাবাহিরা বলিল, "ওই শুনুন, ঠাকুর তাঁহার পয়সা নাই এই কথা মায়ের কাছে বলিতেছেন। আমরা সকাল সন্ধ্যায় প্রথম

খেওয়া অমনি পার করি, পয়সা লই না। ঠাকুরকে না পার করিয়া আপনাদিগকে পার করিতে পারিব না, আপনারা একটু দাঁড়ান।" এই বলিয়া নৌকাবাহিরা সাধককে পার করিবার জন্য চলিল। সাধক আবার গাহিলেন :—

অজ্ঞানে হয়েছি অন্ধ, পথে নানা প্রতিবন্ধ,
ভবসিন্ধু অতি অনিবার (কিসে পার হব মা)।
কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ী,
তুমি মোরে করিবে নিস্তার।

সাধকের সমুদয় গীত এক এক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছিল। গান বাঁধিবার ইচ্ছায় চিন্তা করিয়া কোন গীত রচিত হয় নাই। অনুগত লোকদিগের সহিত কথোপকথন সময় কিম্বা প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য দর্শনে যখন যেমন চিন্তার উদয় হইয়াছে, তখন সেইরূপ সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশে ডাকাইতের সহিত গুড়গ্রামের ডাঙ্গায় সাধকের সাক্ষাৎ তাঁহার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশে ডাকাত সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং যতদিন জীবিত ছিল, সাধকের সহবাস ক্ষণেকের জন্যও পরিত্যাগ করে নাই। সাধকের সহিত সাক্ষাতের পর বিশুর জগাই মাধাযের ন্যায় বিশুদ্ধ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। সাধক তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহার আত্মগ্লানি, ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ দেখিয়া সাধক তাহাকে পরমভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

সাধক অমরাগড়ে তাঁহার বন্ধু কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের

বাটীতে পদার্পণ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার কেনারামকে দর্শন করিবার ইচ্ছা হইল। চান্না হইতে অমরারগড় গ্রাম প্রায় সাত আট ক্রোশ। চান্নার পশ্চিম অমরারগড়। অনেক গ্রাম, প্রকাণ্ড মাঠ ও ডাঙ্গা পার হইয়া অমরারগড় যাইতে হয়। জগদম্বা বিশালাক্ষীর চরণে বিল্বদল ও জবা নয়নজলে প্রদান করিয়া সাধক আহারান্তে বন্ধুদর্শনে চান্না হইতে বহির্গত হইলেন। সাধকের সহাস্য বদন, তাঁহার শ্মশ্রুজাল মণ্ডিত মুখমণ্ডল জলদজাল বেষ্টিত শশধরের ন্যায় বোধ হইতেছে। তাঁহার গলে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র, বগলে গাত্র মার্জ্জনী বদ্ধ দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ড। সাধক খড়োশ্বরী পার হইয়া প্রশস্ত শস্যক্ষেত্র মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছেন। কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগ, ধান্য সকলের মধ্যে কোন জাতীয় ধান্য পরিপক্ক অবস্থায় মস্তক অবনত করিয়া স্বর্ণ পঙ্‌ক্তির ন্যায় সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন জাতীয় ধান্য গর্ভাবস্থায়, কেহ বা সদ্য প্রসূতা। সাধক মানবের প্রাণস্বরূপ ধান্য সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অতি প্রফুল্ল মনে বিশ্ব প্রতিপালিনী পরমেশ্বরীর পদে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "মা তোমার এ মূর্ত্তি বড় মনোরম, তাই মানব তোমার এ মূর্ত্তিকে শারদীয় পূজায় নব পত্রিকার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। মা এই বিশ্বমাঝে সকল বস্তুই তোমার অসীম করুণার চিহ্ন স্বরূপ।" সাধক ক্রমে ক্রমে অনেক গ্রাম বিবিধ শস্যক্ষেত্র পার হইয়া ওড়গ্রামের ডাঙ্গার পূর্ব্বপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। ওড়গ্রামের ডাঙ্গা একটী বিস্তৃত

প্রান্তর, প্রায় একক্রোশ ব্যাপী। সাধককে ঐ প্রান্তর পার হইয়া যাইতে হইবে। দিনমণির করজাল অতি ক্ষীণ ও সুখস্পর্শ। দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ মণ্ডলে ব্যাপ্ত সৌরকররাশি দূরস্থিত প্রকৃতি মণ্ডলের শিরোদেশে ও ওড়গ্রামের প্রান্তরে পতিত হইয়া অবনীকে রজতময়ী করিয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে।

সাধক ক্রমে ক্রমে ওড়গ্রামের ডাঙ্গার মধ্যদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যদেব অস্তাচলে শয়ন করিয়াছেন। তখনও অন্ধকার হয় নাই। লোহিতবর্ণ মেঘশ্রেণী পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আকাশে দৃষ্ট হইতেছে। সাধক অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে চলিতেছেন। এমন সময় মানুষের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। তিনি পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, ভীষণাকার কয়েকজন শড়্কী হস্তে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে।

তাঁহারা কৃষ্ণকায় ও বলিষ্ঠ। তাহাদের মস্তকে দীর্ঘকেশ, পরিধান বস্ত্র আজানুলম্বিত ও মল্লবেশে কটিবদ্ধ, হস্তে শড়্কী বা দৃঢ় কাষ্ঠনির্ম্মিত নাতিদীর্ঘ লাঠী। সাধক দেখিলেন, তিনি ডাকাইতের হস্তে পড়িয়াছেন, আর নিস্তার নাই। যমদূতের হস্তে নিস্তার আছে কিন্তু ডাকাইতের হস্তে পরিত্রাণের উপায় নাই। সাধকের কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। তিনি ভুবন-মোহিনীর ধ্যান করিয়া তাহাদের গতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্যমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, দেখিলেন, শ্মশানবাসিনী ডাকিনী পরিবৃতা হইয়া অট্ট অট্ট হাসে তাহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার বেশ ভয়ঙ্করী হইলেও অভয় বরদামূর্ত্তি, বদনে কাদম্বিনী

শোভা, নয়নে করুণাদৃষ্টি। সাধক হাস্য করিয়া কহিলেন, "ইচ্ছাময়ী! তোমার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হউক।" ডাকাইতেরা শড়্‌কী নিক্ষেপ করিতে করিতে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল। সাধক ভাবিলেন, "নিকট মরণ এবং প্রাণ খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন :—

আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী অতেব হলেম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদ কালে কেউ কারো নয়, ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা॥
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখ,
নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা॥
কমলাকান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা,
জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥

সাধক এই ভীষণ বিপদকালে পৃথিবীর মধ্যে জগদম্বা ব্যতীত আর অবলম্বনের পাত্র কিছু নাই ভাবিয়া বলিতেছেন, "মা আমি চিরকাল তোমার চরণ সম্বল করিয়াছি, চরণে শরীর মনপ্রাণ সব সমর্পণ করিয়াছি, আমার এইরূপ পরিণাম কি উচিত? শুনি তোমার চরণে ত্রিপুরারী ভিন্ন কাহারও অধিকার নাই, যদি তাই হয়, তাহা হইলে আমার এইরূপ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। মা! আমি তোমাকে ভালবাসিয়া জ্ঞাতিবন্ধু দারা সুত ঘরবাড়ী সব ত্যাগ করিয়া কত জপ তপ করিয়াছি, তথাপি আমার পরিণাম এইরূপ হইবে? হায় হায়! আমি ভাবিতেছি, আমি ভেক

লইয়াছি ও আমি সাধক হইয়াছি, আমি জপ করিয়াছি, আমার অহঙ্কার আসিয়াছে, বুঝিয়াছি, জননী! তোমার দয়া না হইলে জপ তপে কিছু হয় না। এখন আত্মীয় স্বজনই বা কি করিত, তারা কি আমাকে এই ঘৃণিত পরিণাম হইতে রক্ষা করিতে পারিত। মা বিদায় দাও, একবার করুণানয়নে চাও, সেই হাসিভরা মুখ দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করি। মা আর একটী কথা বলি, আমার বড় সাধের জপের মালা ঝুলিকাঁথা, জপের ঘরে টাঙ্গান আছে, সে সব তোমারই জিনিস তোমাকেই দিয়া চলিলাম। মা! আমি তোমাকে ভালবাসি, আমার প্রিয়তম জিনিস আর কাহাকে দিব।

ডমরুর বাদ্য শ্রবণে বিষধরের ন্যায় ডাকাইতেরা সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দাঁড়াইল, সাধকের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল। তাহাদের হস্ত পদ উদাসীন, যেন কি এক মোহিনী শক্তি তাহাদিগকে স্থাবরের ন্যায় করিয়া তুলিল। তাহাদের মধ্যে প্রধান ডাকাইতের নাম বিশে ডোম, তাহার জন্মান্তরের সুকৃতি বিস্তর ছিল। বিশে সাধকের চারিদিকে কি এক জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, ভাবিল, এই সাধু স্বর্গের দুত, মহাপুরুষ, ভৈরব। তাহার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া গেল, হৃদয়-কলুষ ভক্তির স্রোতে ভাসিয়া গেল। পাপ কল্পনা ধুলিজাল ভক্তিবারিতে বিদূরিত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হইল। বিশে গদ গদ স্বরে কহিল, "কে তুমি?" সাধক হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "কালী কিঙ্কর কমলাকান্ত, বাড়ী চান্না। বিশে বলিল, "চান্নার কমল

ঠাকুর!" সাধক বলিলেন, "হাঁ।" বিশে উন্মাদের ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া সাধকের পদযুগল ধরিয়া পতিত হইল। বিশে ডাকাইতি করিবার জন্য বাহির হইবার পূর্ব্বে কালীর চরণে জবা, বিল্বদল ও পদ্ম দিয়া জয় প্রার্থনা করিত। বিশে সাধকের চরণে সেই পদ্মগন্ধ পাইল, মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিল, সাধক কমলাকান্ত নহেন, তাহার মা কালী। বিশে আবার সাধকের চরণে মস্তক স্থাপন করিল। সাধক তাহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। বিশে করযোড়ে ছবির ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার হৃদয় ব্যাকুল, সাধকের দিকে একদৃষ্টি, নয়নে জল। সাধক তাহার ভক্তিপূর্ণ ভাবান্তর দেখিয়া জগদম্বার ধ্যানে তাহার সহিত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "মা লীলাময়ী! তোমার বুঝি এই অভিনয়টুকু দেখিবার ইচ্ছা ছিল, তাই আমাকে এই প্রান্তরে আনিয়া তোমার অপার করুণার পরিচয় দিলে, এ ঘোর পাষণ্ডের ও বিকার জন্মাইলে। এখন বোধ হইতেছে এবার আমাকে রক্ষা করিলে। বিশ্ব জননী! তুমিই জান আমি এ সংসারের কোন্ উপকারে আসিব।" বিশের সঙ্গীগণ বিশের এই প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া ভাবিল, "বিশের একি হ'ল, ব্রাহ্মণ বোধ হয় কিছু মন্ত্র জানে। বিশে আমাদিগকে বলিত, সন্ন্যাসী, ফকিরের ঝুলির ভেতর বেশ দশটাকা থাকে, আজ কাল অনেক লোক আমাদের ভয়ে সাধু সন্ন্যাসীর বেশ ধরে যাওয়া আসা করে, যে রকম বিশের গতিক দেখ্ছি, বুঝি শুধুহাতেই বা ঘরে ফিরে যেতে হয়, যা হ'ক ঠাকুরের গানটা শুনে আমাদেরও যেন প্রাণ

কেমন করে উঠ্‌লো, আজ বোধ হচ্ছে ছুই একটা গান শুনেই ঘরে ফিরে যেতে হবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বিশের সঙ্গীগণ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "ওরে তোর কি হ'ল, গান শুনে অবাক হয়ে গেলি যে, কাঁদ্‌ছিস্ কেন?" সাধককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হঁা ঠাকুর! বিশের একি হ'ল, বিশে আজ পর্য্যন্ত এক পয়সার লোভ ছাড়্‌তে পারে নাই, তুমি বুঝি কিছু মন্ত্র জান, মন্ত্রটী ফিরে নাও, বিশেকে পাগল করো না, যাও বাবা আস্তে আস্তে চলে যাও।" উহাদের মধ্যে একজন বলিল, "তুমি মায়ের গান গেয়ে বেড়াও, তাই মা তোমাকে আজ বাঁচিয়ে দিলে, তোমার গলাটি বড় মিঠে, আর একখানা গান গাওনা ঠাকুর।" ডাকাইতদিগের মধ্যে অন্য একজন কহিল, "আষাঢ়ে নবমীতে বিশালাক্ষী মার খুব ধুমধামে পূজো হয়, আমি ছু'একবার পূজো দেখ্‌তে গিয়েছি, কমল ঠাকুরের গানও শুনেছি, তোমার চেহারাটা কমল ঠাকুরের মত বটে, কমল ঠাকুর হাতে তাল দিয়ে যে রকম গান করে সে রকম হাতে তাল দেবার ক্ষমতা কারো নাই, তার হাতের তাল বাজনার চেয়ে মিঠে, যদি তুমি কোমল ঠাকুর হও, তেমনি করে হাতে তাল দিয়ে গাও দেখি, গাও ঠাকুর! এবার তোমার তাল দেয়া দেখে বুঝ্‌বো কোমল ঠাকুর কিনা।" বিশের সেই ভাব, স্থিরদৃষ্টি সাধকের চরণের দিকে, করযোড়ে দণ্ডায়মান, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ-নিশ্বাস। ডাকাইতদিগের মধ্যে জনৈক বিশেকে আবার সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওরে একি ভণ্ডামী যুড়্‌লি, কথা ক'স না কেন?

গান শোন।” সাধক বিশ্বজননীর ধ্যান করিয়া দেখিলেন, বরাভয় ধারিণী নির্জ্জন প্রান্তরে মৃদুহাস্যে নৃত্য করিতেছেন।; ডাকাইতদিগের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দেখিলেন, তাহাদের মধ্যেও স্নেহময়ীর আবির্ভাব। তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, জননী আজ আবার একি ভাব! করে যষ্টি, মল্লবেশ, প্রান্তর প্রদেশে শরণাগত সন্তানকে লইয়া একি অভিনয়! বড়ই রঙ্গ জান মা! তোমার উপর এখন আমার অভিমান হইতেছে। সন্তানের উপর একি বিড়ম্বনা! তুমি আমাকে বলিবে বিধির লিখন যে দিন যেমন সেই রূপে যাবে সেদিন। বিধির লিখন ত কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী। হাঁ মা! জিজ্ঞাসা করি যদি আমার কর্ম্মফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে, তবে তুমি কি [illegible]? আমি ত তোমার নিতান্ত শরণাপন্ন, তুমি আমাকে যে পথে ভ্রমাইতেছ আমি সেই পথে ভ্রমিতেছি, যাহা করাইতেছ তাহাই করিতেছি, তবে আমার সুখ দুঃখ কি? আমার আবার কর্ম্ম কি? তুমিই আমার কর্ম্ম। বুঝেছি, জননী তুমি আমাকে বুঝাইলে শমন শঙ্কট অতি কঠিন সময়। সেই শমন সঙ্কটে মানবের তোমা ভিন্ন অবলম্বনের, শান্তির পদার্থ আর নাই। মানব জীবনে কত আসে, কত যায়, কত হয়, কিন্তু মৃত্যুর সময় তুমিই একমাত্র আধার, এক মাত্র আশ্রয়, একমাত্র শান্তি। মা বুঝেছি, সেই ভীষণ সময়ের জন্য তোমার নিতান্ত প্রয়োজন।” ডাকাইতেরা বলিল, হাঁ ঠাকুর! তুমিও যে বিশের মত হা করে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লে, আজকার রাতটা এইখানেই কাটাবে নাকি?

আর একটা গান গাওনা, হাতে তাল দিয়ে গাইবে, দেখ্‌বো তুমি কমল ঠাকুর কিনা? সাধক হাতে তাল দিয়া গাহিলেন ঃ—

তারা! তবে তোমার ভরসা বল কে করে।
যদি আপনারি কর্ম্মফল ফলিবে আমারে॥
যে পথে ভ্রমাও তুমি, সেই পথে ভ্রমি আমি
মিছে সুখ দুঃখ ভাগী কর গো আমারে॥
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ী
শমন সঙ্কট যদি না থাকিত নরে॥

ডাকাইতেরা হাতে তাল দেওয়া দেখিয়া ও গান শুনিয়া বলিল, "হাঁ তুমি কমল ঠাকুর বটে, শুনেছি কমল ঠাকুর পয়সা নেয় না, পয়সা সঙ্গে রাখে না, যাও ঠাকুর যাও।" বিশের সেই ভাব, নয়নে জল, সাধকের দিকে একদৃষ্টি, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস। ডাকাইতেরা বিশেকে বলিল, "ওরে বিশে আয়, কোথাও ডাকাতীর চেষ্টা দেখিগে, ভণ্ডামী কল্লে ত পেট ভর্‌বে না।" বিশে উত্তর করিল, "তোরা যা, আমি আর ঘরে ফিরে যাবনা, আর তোদের সঙ্গে মানুষ মেরে বেড়াব না, অনেক পাপ করেছি, পাপের জ্বালা বিছের কামড়, দেহ জ্বলে গেল, কোথা যাব, এই ঠাকুরই আমার মা কালী। আমার চোখ ঠাকুরের পা ছাড়া হলেই দেহ জ্বলে যাচ্ছে। আমি আর কারোদিকে চাইব না, কারো কথা শুন্‌বো না, তোরা যা, বলিস বিশে ঠাকুর পেয়েছে।" ডাকাইতেরা বলিল, "তুই কি পাগল হলি, ঠাকুরের সঙ্গে কোথা যাবি, শেষে কি আমাদিগকে ধরিয়ে দিবি।" কাজে

ধরিয়া টানিয়া বলিল, "চল ঠাকুরকে যেতে দে, যদি ঠাকুরের সঙ্গে যাস, তোকে খুন করে ঘরে যাব।" বিশে বলিল, "ঠাকুর আমার দয়াল হরি, তোরা জানিস না বিশে কি ধন পেয়েছে, ঠাকুরের সবাই ছেলে, ঠাকুর কি কাউকে ধরিয়ে দেয়, দেয় ত আমাকে দেবে, আমি ঠাকুরের কাছে আমাকে বলি দিয়ে পাপের জ্বালা জুড়োবো, তোরা আমাকে খুন কর্ব্বি, কর, আমার মাথাটা ঠাকুরের পায়ে দিস।" ডাকাইতেরা সাধককে কহিল, "হাঁ ঠাকুর! বিশের একি কল্লে, বিশে আমাদের সর্দ্দার, আমাদিকে বিপদে ফেলবে দেখ্‌ছি, ভালয় ভালয় তোমাকে ছেড়ে দেলাম, তার বুঝি এই ফল, কি মন্ত্র পড়েছ, নাও মন্ত্র ফিরে নাও।" সাধক বলিলেন, "বাবারা আমি ত কিছুই জানিনা, আমার মহামন্ত্র কালীনাম।" বিশে সেই কথা শুনিয়া হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল, আমার মহামন্ত্র কালীনাম, ঠাকুরের মুখের কালীনাম, আমার কানের ভেতর ঢুক্‌লো, আমার বুকের পাঁজরের ভেতর ঢুক্‌লো, ওই কালী মা আমার বুকের ভেতর বসেছে, যা তোরা চলে যা, নইলে এখনি সাজা পাবি, জানিস তো মায়ের আমার অসুরের মুণ্ডকাটা স্বভাব, যদি বাঁচ্‌বার ইচ্ছে থাকে এখনি চলে যা।" বিশের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য দস্যুরা কোন কথা কহিতে পারিল না, বিশের ভাব দেখিয়া তাহাদের ভয় হইল, বিশের মুখপানে চাহিয়া রহিল। সাধক দস্যুদিগকে কহিলেন, "বিশের মনের বিকার উপস্থিত হইয়াছে, পতিত পাবনী বিশের মনের অবস্থা ফিরাইয়াছেন,

বিশে কোনমতে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবে না, তোমাদের ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে বিপদে ফেলিব না, এখন রাত্রিকাল, আর এখানে বেশীক্ষণ থাকা ভাল নয়।” ডাকাইতেরা বলিল, “ঠাকুর তোমার ভয় কি! রাত্রির ভয় তো আমরা, বিশের ভাব দেখে বোধ হচ্ছে, বিশে তোমার সঙ্গে যাবে, দেখো যেন আমরা বিপদে না পড়ি, বিশের মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে, তাকে ঘরে ফিরে পাঠিয়ে দিও, আমাদেরও ভয় হচ্ছে পাছে আমাদেরও মন ওই রকম হয়ে যায়, যাও ঠাকুর আর বেশীক্ষণ তোমার কাছে থাকা ভাল নয়।” এই বলিয়া তাহারা বিদায় হইল। ডাকাইতেরা বিশেকে পরিত্যাগ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে, সাধক কহিলেন, মা সর্ব্বমঙ্গলা! তোমার লীলা অসীম, যাহারা মানুষের প্রাণকে পিপীলিকার প্রাণ অপেক্ষা তুচ্ছ জ্ঞান করে, যাহারা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডেরও লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, আজ তাহাদের বিকার জন্মাইলে।” সাধক করযোড়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, “বিবাদে বিষাদে, প্রমাদে প্রবাসে, জলে চানলে, পর্ব্বতে শত্রু মধ্যে, অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।” এই বলিয়া সাধক জগদম্বার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, বিশের সহিত প্রান্তর পথে চলিতেছেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী। শরতের আকাশ, ক্ষীণচন্দ্র হইলেও প্রভাসম্পন্ন, প্রান্তর পথ সম্পূর্ণ ভাবে অলক্ষিত নহে। পথ সংলগ্ন তৃণরাশির শিশিরে সাধকের পদদ্বয় সিক্ত হইতেছে। তৃণরাশি যেন সাধকের বিপদে দুঃখিত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।

বিশে সাধকের চরণের দিকে চক্ষু রাখিয়া নতমুখে সাধকের সঙ্গে চলিতেছে। সাধক কহিলেন, "বিশু ওই দেখ গ্রাম দেখা যাইতেছে, আজ রাত্রিতে ওই গ্রামে আশ্রয় লইব, কাল সকালে উঠিয়া অমরার গড় যাইব, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে, ঘরে ফিরিয়া যাও।" বিশে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "আর ঘরে ফির্কোনা, যতদিন বাঁচ্‌বো, ওই চরণ দর্শন কর্বো, তোমার মুখের মিষ্টি কথা শুনে কাণ জুড়োবে, কালী কালী বলে হাত তুলে নাচ্‌বো, ঠাকুর আমি অনেক পাপ করেছি, অনেক মানুষ খুন করেছি, ঠাকুর আমার গতি কি হবে। সাধক কহিলেন, "বিশু! একথা তোমার আগে মনে হয় নাই, আজ একবারেই এমন হইল কেন? আমাকে বুঝাইয়া বলিতে পার। বিশে কহিল, "ঠাকুর তোমাকে খুন কর্বার জন্য যখন তোমার কাছে এলাম, দেখ্‌লাম তোমার চার ধারে কি এক আলো, আমাদের ধর্ম্ম আছে, প্রতিদিন কালী পূজা করে, মাকে প্রণাম করে, মায়ের পায়ে জবা বিল্বদল দিয়ে ডাকাতী কর্ত্তে যাই, দেখলাম মায়ের মূর্ত্তি চারধারে, মায়ের পায়ে যে জবা দিয়েছিলাম সেই জবা এখনও পায়। মা যেন আমাকে কাণে কাণে বল্লে, বিশে! ঠাকুর পেয়েছিস ছাড়িস না, যা সঙ্গে যা, মন ঘুরে গেল, তোমার মুখে মায়ের গান শুনে সব ভুলে গেলাম, যদি সঙ্গে না নাও, দাও গলায় ছুরী দাও, আমরা ছুরী সঙ্গে রাখি (ছুরী দূরে নিক্ষেপ করিয়া) কহিল, "ওঃ এই ছুরী আমাকে কত পাপে ডুবিয়েছে, ঠাকুর আমাকে ধরে তোল, বিশে পাপী, পাপী বলে ত্যাগ

করোনা! তুমি না সঙ্গে নিলে, হয় আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে মর্ব্বো, না হয় বিষ খাব, এ দেহ বদ্‌লাব।" সাধক বিশুর অকস্মাৎ নিরতিশয় বৈরাগ্য দেখিয়া ভাবিলেন, "ইহা খণ্ড বৈরাগ্য নহে, কোন কারণ বশতঃ উপস্থিত হয় নাই, ইহা দৈব প্রসূত, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির উদয়, নিশ্চয় স্থায়ী হইবে। বিশের কর্ম্মফল দূষিত হইলেও দুষ্কৃতি বিনাশিনীর প্রতি অচলাভক্তি। সে বিশ্বেশ্বরীকে নিজকর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বলিয়া আরাধনা করিত, মাতাও তাহার ভক্তির গুণে দিব্যজ্ঞান দিয়াছেন, এখন বিশুর নিজকর্ম্মকে অতি অপকর্ম্ম বলিয়া বোধ হইয়াছে, ভক্তির সহ জ্ঞানের উদয় হইতেছে, আর ইহাকে ভুলান দুঃসাধ্য।" ইহা ভাবিয়া সাধক কহিলেন, "বিশু! তোমার পত্নী, পুত্র-কন্যা আছে?" বিশু কহিল, "এখন আমার মা কালী, আর আপনি ছাড়া আর কিছু নাই, যে ছিল সে ছিল, যে আছে সে থাকুক, আমার সেই পরিবার, আমার পুত্র-কন্যারা আমার গলার ফাঁসী। ঠাকুর! মানুষ মেরে যেদিন টাকাকড়ি না আন্‌তে পার্‌তাম, তারা মুখভার কর্‌তো, আমি তা'দিকে খুসী কর্ব্বার জন্য পরদিন ডাকাতী কর্ত্তে যাবার আগে মাকে কেঁদে কেঁদে কত কথা বল্‌তাম, পয়সা চাইতাম, ঠাকুর! আমার কি ভুল, আমার ওসব কথা মনে হলে বুকফেটে যাচ্ছে, ঠাকুর আমাকে রক্ষে কর।" সাধক বিশুর এই সকল কথা শুনিয়া ভাবিলেন, "বিশুর বিষমতর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, নিজকর্ম্মকে অতি অকর্ম্ম বোধ হওয়াতে বিশু মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেছে, ইহার অতীত কর্ম্মের

আন্দোলনে প্রয়োজন নাই।" ক্রমে ক্রমে ওড়গ্রামের প্রান্তর অতিক্রান্ত হইল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নয়নগোচর হইল। গ্রামের কোলাহল তখনও অন্তর্হিত হয় নাই, দূর হইতে অল্প অল্প শ্রুত হইতেছিল। গ্রামস্থ দেবালয় নাদিত শঙ্খ ও ঘণ্টার শব্দ গ্রাম সংলগ্ন শস্যক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া প্রান্তর প্রান্তে ক্ষীণভাবে চলিতেছিল। গ্রামের মধ্যে দুই এক স্থানে দীপাগ্নি ও কার্ত্তিক-মাসদত্ত স্বর্গবাতি দৃষ্ট হইতেছিল। গ্রামের বহির্ভাগের বাসগৃহ হইতে রাখাল ও শ্রমজীবিদিগের আনন্দ সঙ্গীত অতি মধুর বোধ হইতেছিল। সাধক কহিলেন, "বিশু এই আমরা গ্রামে আসিয়াছি। এই গ্রামের জনৈক পরিচিত লোকের গৃহে অদ্য রাত্রির জন্য আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিব। বিশু! যদি কেহ তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তুমি কি পরিচয় দিবে?" বিশু বলিল, ঠাকুর! আমাকে এ অঞ্চলে কে না জানে! আমি প্রাণখুলে বল্‌বো আমি বিশে ডাকাত, খুনেরা, মহাপাপী, আমি কত গেরস্তের সর্ব্বনাশ করেছি, কত মানুষ মেরেছি, রাত দুপুরে ছেলেপিলে মেয়ে মানুষকে শাস্তি দিয়েছি, আয় গাঁয়ের লোক আয়, সবাই মিলে এসে আমাকে শাস্তি দে, যে রকম শাস্তিতে তোরা সুখী হ'স, বিশে পাপের ফলভোগ করুক।" বিশুর এই কথা শুনিয়া সাধক কহিলেন, "বিশু আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি তুমি আজ রাত্রে কেবল তোমার সেই কালীমার ধ্যান করিবে, মুখে কোন কথা কহিবে না, গৃহস্থ যাহা তোমাকে খাইতে দিবে, কোন কথা না কহিয়া খাইবে; যাহা করিতে

বলিবে, কোন কথা না কহিয়া করিবে; তোমার সম্বন্ধে যাহা ব্যক্তব্য তাহা আমি বলিব।" বিশু বলিল, "যে আজ্ঞা ঠাকুর! তোমার কথার একতিলও অন্যরূপ কর্ব্বোনা।" এই বলিয়া সাধক গ্রাম প্রবেশ পূর্ব্বক পরিচিত ব্যক্তির গৃহে গমন করিলেন। সাধকের আগমনে গৃহস্থের আনন্দের সীমা রহিল না। পরিচিত ব্যক্তি সাধককে আসন প্রদান পূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পরিচিত ব্যক্তির পুত্র সাধকের পদদ্বয় ধৌত করিয়া দিলেন। গৃহের রমণীগণ তাহার জলযোগ ও রাত্রির আহারীয় দ্রব্যব প্রস্তুত জন্য ব্যস্ত হইলেন। সাধক বিশুর মনের অবস্থা জানিয়া সে রাত্রে ওড়গ্রামের প্রান্তরের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন না। বিশু বহির্গৃহপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট, অবনত বদন, কটিদেশে পরিধানবস্ত্র, কপালদেশ অন্য এক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত, তাহার হৃদয়ে অভয়া বরদামূর্ত্তি, নয়নে জল, হৃদয় ব্যাকুল। সে মনে মনে বলিতেছে, "মা! বিশে আর মানুষ মার্‌তে চায়না, বিশে আর ডাকাতী কর্ত্তে চায়না, বিশে আর ডাকাতী করে, গয়না, টাকাকড়ি এনে পরিবার ছেলেদিগে দিয়ে তাদের হাসিভরা মুখ দেখ্‌তে চায় না, বিশে চায় এই ঠাকুরের সঙ্গ, আর তোমার ছুটী রাঙ্গাচরণ, পোঁকাভরা ডোবা পুকুরের জলের মত বিশের বুক পাপ পাঁকেতে ভরা, পাপপোঁকাগুলো কিল বিল কচ্ছে, মা ভাল পুকুরের পদ্মফুল, রক্তচন্দন মাখা ভাল জবা তোমার পায়ে দিয়ে তোমাকে মনে মনে বুকের মাঝে বসাচ্ছি, চোখের জলে রাঙ্গাচরণ দেখে মনে হচ্ছে এইবার বুঝি পাপপোঁকা গেল,

কিন্তু পাপ পোকাগুলো মাথার ভেতর ঢুকে চোক আঁধার করে দিচ্ছে, আর তোমাকে বুকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, বুঝেছি পাপীর বুকে থাকৃতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, মা বুক ছেড়োনা মা! মা তুমি যেখানে যাও আমি তোমাকে ছাড়্‌বোনা।" এমন সময় বিশেকে জলখাবার আনিয়া দিল, বিশে অবনত বদনে তন্ময়, খাদ্যদ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য নাই। সাধক কহিলেন, "বিশু জল খাও।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! খাই।" পরিচিত ব্যক্তি কহিলেন, "লোকটী বোধ হয় ক্লান্ত হইয়া ঢুলিতেছে, অদ্য আপনি পদব্রজে অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন, শীঘ্র আপনার ভোজন ও শয়নের ব্যবস্থা করা উচিত।" সাধক সেই রাত্রে পরিচিত ব্যক্তির গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহস্থের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বিশুর সহিত অমরারগড অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হেমন্তকাল কার্ত্তিকের শেষ, সন্ধ্যায় শীতঋতুর শুভাগমনের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। সূর্য্যদেব শিশির মাখিয়া স্নিগ্ধ কলেবরে উদয় হইতেছেন। পাদপ পত্রে তৃণরাশিতে ধান্যক্ষেত্রে, ফলভরে অবনত ধান্যশীর্ষে মুক্তামালার ন্যায় শিশির বিন্দু সকল সূর্য্য-রশ্মিতে পরমশোভা ধারণ করিয়াছে। সূর্য্যকিরণ সুমধুর বোধ হইতেছে। সাধক বিশুর সহিত নানাবিধ কথোপকথনে অমরার গড়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। অমরারগড় গ্রাম অতি প্রাচীন। পূর্ব্বে ইহা রাজা মহেন্দ্রের গড় ছিল, তাঁহার মহিষীর নাম অমরা, তদনুসারে এই গড়ের নাম অমরারগড় হইয়াছে। রাজা মহেন্দ্রের পিতামহ ভল্লুপাদ এই নগর স্থাপন করেন। রাজা ভল্লুপাদের জন্ম

সম্বন্ধে প্রবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার ভল্লূকীর গর্ভে জন্ম হইয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি ভল্লূকগুহায় রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ভল্লূপদ বা ভল্লূকপদ হইয়াছে। কথিত আছে যখন নন্দবংশ ধ্বংশ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অমানুষিক মেধাবীসম্পন্ন চাণক্য পণ্ডিত মগধে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করেন, তখন মগধের অনেক ক্ষত্রিয় সস্ত্রীক বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই ক্ষত্রিয়গণের অনুগামিনী জনৈক রমণী অমরারগড়ের নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে এক পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া তাহাকে ভল্লূকগুহায় স্থাপন পূর্ব্বক প্রস্থান করেন। কোন ব্রাহ্মণ সেই বনমধ্যে কাষ্ঠ আহরণে গিয়াছিলেন। সদ্য-প্রসূত শিশুর ক্রন্দন শব্দ শ্রবণ করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক দেখিলেন সূর্য্যসম পরম রূপবান একটী শিশু একটী গুহায় শায়িত রহিয়াছে। গুহাটী ভল্লূকের আবাস ছিল বলিয়া বোধ হইল। ব্রাহ্মণ সেই বালককে গৃহে আনিয়া সাদরে প্রতি-পালন করিলেন এবং তাঁহাকে ভল্লূক গুহায় প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম ভল্লূপদ রাখিলেন। শৈশবেই মানবের জাতীয় শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বালক নিদাঘ সূর্য্যের ন্যায় শৈশবেই অসীম তেজসম্পন্ন হইলেন। নানাবিধ অদ্ভুতকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক সকলকে বিস্মিত করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্মদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাদি করিলেন। বালক যৌবনে পদার্পণ পূর্ব্বক ভুজবলে নিকটবর্ত্তী রাজগণকে পরাজয় পূর্ব্বক অমরারগড়ে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র গোপাল পিতার ন্যায় বলশালী ছিলেন।

গোপালের পুত্র রাজা মহেন্দ্র। ইনি সিয়োরের (সিউরী বা বীরভূমের) রাজকন্যা অমরার পাণি গ্রহণ করেন। অমরা স্বয়ম্বরা হন। সেই স্বয়ম্বরে বঙ্গের তৎকালিক চক্রবর্ত্তী রাজা সুদর্শন ও অন্যান্য রাজগণ উপস্থিত ছিলেন। অমরা সমুদয় রাজগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা মহেন্দ্রকে মাল্য প্রদান করেন, সেই জন্য রাজা সুদশন ও অন্যান্য রাজগণ একত্রিত হইয়া অমরারগড় আক্রমণ করেন। রাজা মহেন্দ্র নিজ গুরু শিবরাম স্বামীর বুদ্ধি কৌশলে রাজগণকে পরাজয় পূর্ব্বক বঙ্গে বলবীর্য্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠেন। এই সকল বিষয় "শিবাখ্যা কিঙ্কর" মহাকাব্যে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। রাজা মহেন্দ্রের উপাস্য দেবতা দেবী শিবাখ্যা। দেবীর অনুপম মনোহর দশভুজা পাষাণময়ী মূর্ত্তি এখনও অমরারগড়ে বিদ্যমান আছে। শিবাখ্যা প্রসিদ্ধ দেবতা। ঐ স্থানের ভৈরব শিবলিঙ্গ, নাম দুগ্ধেশ্বর, জাগ্রত দেবতা। রাজা মহেন্দ্রের গুরু শিবরাম স্বামী অমরারগড়ে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার সমাধির উপর এককালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে সেই কালী মূর্ত্তির পার্শ্বে শিবরাম স্বামীর সিদ্ধাসন আছে, সেই সিদ্ধাসনে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে জপ করিতে পারিলে সিদ্ধি লাভ হয়। সেই কালীমূর্ত্তির নাম সিদ্ধেশ্বরী। প্রবাদ আছে সাধক কমলাকান্ত ও কেণারাম চট্টোপাধ্যায় সেই সিদ্ধাসনে জপ করিয়া ছিলেন। অমরারগড়ের পূর্ব্ব চিহ্নমধ্যে গড়খাই ও বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় সকল বিদ্যমান আছে। গড়খাই সকল অনেক স্থলেই বিচ্ছিন্ন ও শস্যক্ষেত্রে পরিণত, জলাশয় সকল

পঙ্কিল ও গভীরতাশূন্য। জলাশয় সকলের কাহারও নাম রাজার, কাহারও নাম রাণীর, কাহারও নাম মৃত রাজার, ইহাদের মধ্যে যমুনাদীঘি অতি প্রকাণ্ড, প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধার্দ্ধক্রোশ এবং দীর্ঘে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ, ইহারও অবস্থা অন্যান্য জলাশয়ের ন্যায় শোচনীয়। দেবী শিবাখ্যা, দেবী সিদ্ধেশ্বরী ও ভৈরব-দুগ্ধেশ্বরের পূর্ব্ব মন্দির সকল বর্ত্তমান নাই, পরবর্ত্তী সময়ে যে সকল মন্দির রচিত হইয়াছিল তাহাও ভগ্নপ্রায়। একশত বৎসর পূর্ব্বে অমরার গড়ের অবস্থা বর্ত্তমানের ন্যায় ছিল না। বৃহৎ পুষ্করিণী ও উদ্যান সকল তখনও বিনষ্ট হয় নাই। বৃহৎ জলাশয় সকল বিদ্যমান থাকাতে জলকষ্ট কি জলাভাব জনিত শস্যহানি হইত না। সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত করিতেন। বর্ত্তমানের ন্যায় দ্বেষ হিংসা ও কুটিলতা ছিল না, উৎসব, আমোদ আহ্লাদে, সাধারণের উপকার উদ্দেশে কল্পিত কর্ম্মসমূহে গ্রামের কর্ম্মীদিগের সময় অতিবাহিত হইত। গ্রামস্থ কোন লোক বিপন্ন হইলে অনেকেই নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তিবিশেষ বিপন্ন বিবেচনা করিয়া দুঃখিত হইতেন, গ্রামে গুণী, সাধক সন্ন্যাসী সমাগত হইলে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অতিথি বিবেচনা করিয়া পরিচর্য্যা করিতেন।

সাধক দেবী শিবাখ্যা, দেবী সিদ্ধেশ্বরী ও ভৈরব দুগ্ধেশ্বরের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক গ্রাম প্রবেশ করিলেন। কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের বহির্গৃহের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে বিষ্ণু মন্দির, দুইপার্শ্বে দুইটী শিবালয় ও পার্শ্বে শ্যামাগৃহ। সাধক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রসবিনী ত্রিনয়নীর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক

দেবগণের চরণে প্রণিপাত করিয়া শ্যামাগৃহে প্রবেশ করিলেন। কেনারামের আনন্দের সীমা রহিল না। কেনারাম সস্মিত বদনে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কেনারামের সহোদর দ্বয় সাধকের সহিত পরিচয় করিয়া সুখী হইলেন। কেনারামের তিন পুত্র সাধকেব পরিচর্য্যায় রত হইলেন। কেহ তাঁহার চরণ ধৌত, কেহ বা মৃদুমধু ব্যজন করিরা শ্রম লাঘবের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেনারাম তাদৃশ সমৃদ্ধিশালী না হইলেও তাঁহার সংসারিক অভাব ছিল না। গৃহ ও গ্রামজাত দ্রব্য সমূহে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ, অতিথি সৎকার ও দেব সেবাদি সচ্ছন্দে চলিত। কেনারাম স্বভাব কুলীন ও সত্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। বাদ্যযন্ত্রে ও সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, তিনি পরমার্থ চিন্তা, দেবসেবা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে সময়ের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। তিনি গ্রামের মধ্যে জ্ঞানে, আচারে, বিচারে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিলেন।

স্নানাহার ও বিশ্রামের পর সাধক কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের শ্যামাগৃহে উপবেশন করিলেন। গ্রামের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোক সকল তথায় আগমন করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক আহ্লাদিত মনে সাধকের সহিত পরিচয় করিতে লাগিলেন। সকলের মুখে মৃদুহাস্য, আনন্দে নয়ন উৎফুল্ল, যেন তাঁহাদের বিদেশাগত আত্মীয়ের সহিত বহুদিনের পর সাক্ষাৎ হইয়াছে। বিশু একপ্রান্তে উপবিষ্ট ছিল, সে গ্রামবাসীদিগের ঠাকুরের দর্শনে আনন্দ উৎসব দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, "ওঃ! সেই এক, আর এই এক, আমার বেশ মনে পড়্ছে

গেরুয়া কাপড় পরা, মাথায় জটা, গলায় হাড়ের মালা, কাঁধে ঝুলি কত ফকিরের পেছু পেছু মার মার শব্দে দৌড়েছি, ভেবেছি, বেটা আমাদের ভয়ে ফকিরের বেশ ধরে যাচ্ছে, ওর ঝুলির ভেতর পয়সা আছে। কাজেই এই ঠাকুরের পেছু পেছু তেমনি করে দৌড়ে ছিলাম। হায়! এই যে এরা এখানে এসে ঠাকুরের পা ছুঁয়ে কতই হাস্‌ছে, কতই খুসী হচ্ছে, আমিও মানুষ, এরাও মানুষ। মা কালী তোমাকেত আমি কেঁদে কেঁদে পয়সা চাইতাম, তখন কেন মনটা ঘুরিয়ে দাও নাই। মা তোমার রাঙ্গা পায়ে জবা দিয়ে বেলপাতা দিয়ে, ভাল পদ্মফুল দিয়ে, কত রক্তচন্দন দিয়ে, হেসে হেসে লাঠী হাতে করে বেঁরুতাম, তখন কেন বল নাই, বিশে মানুষ মার্ত্তে যাস্‌না, তখন কেন আজকার মত মনের ভাব দাও নাই। তখন কেন বল নাই, বিশে! সব মানুষ আমার ছেলে।" বিশু এতক্ষণ জগদম্বার চরণে মন রাখিয়া মনের কথা কহিতে ছিল। বিচলিত চিত্তে বহির্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, একটী ক্ষুদ্র পুষ্প বৃক্ষে বহু সংখ্যক কীট পুষ্প কলিকা দংশন করিতেছে, বিশুর মনের উদ্বেগ গুরুতর হইল, সে ভাবিল, সংসারের সুন্দর বস্তু বিনাশের জন্য এই সকল কীটের জন্ম, আমি এই সকল কীটের অধম, এরা একটী ফুলগাছ নষ্ট কচ্ছে, আমি কত শত সংসার নষ্ট করেছি। মা, বাপ, ভাই, বোন, ছেলে, মেয়ে নিয়ে হেসে হেসে সুখে স্বচ্ছন্দে যে লোক ঘর কচ্ছিল, হয়ত আমি এমন কত লোককে পথের মাঝে একলা পেয়ে খুন করেছি, চিরকালের জন্য সেই সংসারটাকে কাঁদিয়েছি।" এই সকল ভাবিয়া বিশুর প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল

হইয়া উঠিতেছিল, তাহার দৃষ্টি স্থির, নয়নে জল। সমাগত ব্যক্তি-গণের মধ্যে অনৈক ব্যক্তি বিশুর ভাব দেখিয়া কহিলেন, "এ লোকটা কাঁদিতেছে কেন? বোধ হয় ইহার কোন মানসিক কষ্ট আছে।" এই কথা শুনিয়া সমাগত অনেকে বিশুর নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাহার চিত্ত বিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। সাধক বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "উহার মানসিক বিকার জন্মিয়াছে, উহাকে বিরক্ত করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। ইহা শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইল। কেহ কেহ কহিলেন, "ইহার কেশ, বেশ ও শরীরের বন্ধন দেখিয়া অনুমান হয়, এ ব্যক্তি আমাদের দেশীয় ডোম, মল্লক্রীড়ায় পারদর্শী।" ইহা শুনিয়া বিশু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার নাম বিশে ডোম, আমি ডাকাত, আমি মহাপাপী। আমার শাস্তি দাও, আমাকে তোমরা মুক্তি কর। আজ যাকে তিলেক না দেখে থাকৃতে পাচ্ছি না, কাল আমি আমার এই দয়াল ঠাকুরকে খুন কর্ব্বার জন্যে তাড়া করে-ছেলাম, ঠাকুরের রূপ দেখে, গান শুনে, ঠাকুরের মধ্যে আমার মা কালীকে দেখে, আমার নেশা ছুটেছে, দেখ্‌ছি আমার মত পাপী দুনিয়ায় আর নাই। ওই দেখ, ওই পোকাগুলো ওই ফুলের গাছের ফুল কাটছে, ফুলগাছ নষ্ট কচ্ছে, আমি কত সংসার নষ্ট করেছি, হায় হায়! এই বড় দুঃখ হচ্ছে, মা কালী কেন আমাকে ডাকাতী শিখিয়েছিল, কেন আগে এই ঠাকুরের ও তোমাদের মত লোকের সঙ্গ দেয় নাই।" বিশুর এই সকল কথা শুনিয়া তথ্য জানিবার জন্য সকলে কৌতুহলে ঠাকুরের

মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। সাধক কহিলেন, "বিশু যাহা কহিল তাহা সত্য, বিশু কাল সন্ধ্যার সময় ওড়গামের ডাঙ্গায় সদলে শড়্‌কী হস্তে আমার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল। আমি সেই ভীষণ শঙ্কট সময়ে জগদম্বার নিতান্ত শরণাপন্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার গুণগান করিলে, বিশু মোহিত হইয়া শড়্‌কী দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমার পায়ে আসিয়া পতিত হইল, দেখিলাম, তাহার সংজ্ঞালোপ হইয়াছে। আমি ইহাকে হস্ত দ্বারা উঠাইলে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বিশু নিজ কৃত কর্ম্মের অনুতাপ করিতে লাগিল। ইহার জগদম্বার উপর অভিমান ও আত্মগ্লানি ইত্যাদি শুনিয়া আমার বিবেচনা হইল বিশুর অকস্মাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। বিশু ডাকাইতের সর্দ্দার, ডাকাইতদিগকে বিদায় দিয়া আমার অনেক প্রবোধ বচন সত্ত্বেও কোন ক্রমেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। বিশুর অকস্মাৎ বৈরাগ্য ও প্রেমের উদয় দেখিয়া অনুমান হয়, ইহা বিশুর জন্মান্তরের সুকৃতির ফল। সাধকের কথা শ্রবণ করিয়া সকলে বিশুর দিকে বিস্ময় ও প্রফুল্ল নয়নে চাহিয়া রহিল ও পরে উহাদের মধ্যে অকস্মাৎ বৈরাগ্য উদয়ের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। কেহ বা সাধকের গত বিপদে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কেহ বা তাঁহার সঙ্গীত দ্বারা মন বিমোহনের অপূর্ব্ব শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ওড়গ্রামের ঘটনা ক্রমে ক্রমে আরও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল ও অনেকে বিশুকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। কেনারাম চট্টোপাধ্যায় সাধকের ইচ্ছা অনুসারে বিশুর বিরক্তিজনক জনস্রোত বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই গ্রন্থের আরম্ভে প্রথম অংশে সাধকের জন্মকাল নির্ণয় সময়ে যে বৃদ্ধের কথা উল্লেখ আছে, তাঁহার নিবাস অমরারগড়, নাম দুর্গাচরণ রায়। সাধক কমলাকান্ত সম্বন্ধীয় অধিকাংশ জনশ্রুতি তাঁহার নিকট প্রাপ্ত। সাধকের অনেক গান তাঁহার সংগ্রহ ছিল। স্থল বিশেষে, ঘটনা বিশেষে যে সকল গান সাধকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, তিনি সে সকল ঘটনা ও গান বলিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। যখন তাঁহার বয়স বার তের বৎসর, তখন তিনি সাধককে দেখিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন, "বিশে ডাকাতকে আমার বেশ মনে পড়ে, বিশের চাঁচর চুল, কালবর্ণ, বলিষ্ঠ শরীর আমার বেশ স্মরণ হইতেছে। কেনারাম চট্টোপাধ্যায় বিশুকে কেহ বিরক্ত করিও না, বলিয়া আমাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছেন, ইহা যেন আমার সে দিনের কথা বলিয়া মনে হইতেছে, সাধকের সঙ্গীত, বহুলোকের সমাগম, তাহাদের আহ্লাদ, কোন কোন ব্যক্তির সঙ্গীত শ্রবণে অশ্রুপাত, সাধকের গলে, কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের গলে মাল্য প্রদান আমার যেন অতি অল্প দিনের ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে, সেই বৈঠকের চিত্র কালের ছায়াতে যেন কিছুমাত্র মলিন হয় নাই।"

কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের শ্যামাগৃহে প্রতিদিনই সঙ্গীত হয়, বহু লোকের সমাগম হয়। সাধকের অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই, তিনি জগতকে আপনার বলিয়া বোধ করেন। তিনি অনেক সময় বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন! বালকের ন্যায় হাস্য কৌতুকে তিনি সুখী হইতেন! কেনারামের অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ

তাঁহাকে পিতার ন্যায় পূজা করিতেন। সাধক নিজ উদারতা গুণে কেনারামের পরিবার বর্গের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে নানাবিধ জনশ্রুতি আছে, তাহার মধ্যে একটী উল্লেখ যোগ্য! এক দিন কেনারামের ভ্রাতৃকন্যা শ্যামাগৃহের নিকট আসিয়া তাহার পিতা শ্যামাগৃহে আছেন বিবেচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "বাবা আজ কাঠ নাই, কাঠ না দিলে রান্না হবে না!" শ্যামাগৃহে তৎকালে সাধক ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। সাধক বাহিরে আসিয়া বালিকাকে কহিলেন, "ওমা কাঠ কোথায় আছে, কুড়ুল আন, আমি কাঠ কেটে দেব।" বালিকা কহিল, "কাঠ খামারে আছে।" এই বলিয়া বালিকা গৃহ হইতে কুঠার আনিতে চলিল। ঐ প্রদেশে ছোট ছোট শাল কাঠ রান্নার কাঠের জন্য ব্যবহার হয়! বালিকা কুঠার লইয়া উপস্থিত হইয়া সাধককে খামার গৃহ ও শাল কাঠ দেখাইয়া দিল। সাধক কুঠার হস্তে লইয়া কাষ্ঠ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। বালিকা কহিল, "তুমি পার্ব্বে না, এখনি জনরা মাঠ থেকে জল খেতে ঘরে আস্‌বে, তারাই কাট কেটে দেবে।" সাধক কহিলেন, "আমাদেরও জন মজুরের মত হাত পা আছে, কেন পার্ব্বো না।" বালিকা কহিল, "তুমি গান কর্ত্তে পার, আবার কাঠও কাটতে পার নাকি? আমার বাবা কি কাকা ত পারে না। তোমার কপালে ঘাম পড়্‌ছে, আর থাকুক, অনেক কাঠ কেটেছ, বয়ে নিযে যেতে পার্ব্বোনা, তোমার হাত কাঁপ্‌ছে, আর কেটোনা।" সাধক ভাবিলেন, "বালিকার হৃদয় কোমল, আমার কপালে ঘর্ম্ম, হস্ত কম্পন দেখিয়া তাহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার

হইয়াছে।" এই ভাবিয়া সাধক হৃদয়বাসিনী বিমলার প্রতি কহিলেন "স্ত্রিয়ঃ সকলা, তব দেবী ভেদা। না জানি মা তোমার হৃদয় কত কোমল।" বালিকাকে প্রকাশ্যে কহিলেন, "তোমাদের যত কাঠ আছে, সব কেটে ফেল্‌বো, গাড়ী করে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব।" বালিকা কহিল, "তাই বুঝি কাঠ কাট্‌তে এলে? সব কাঠগুলি নিয়ে গেলে আমার মা রাঁধ্‌বে কিসে?" এমন সময় কেনারামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সাধককে ভদবস্থাপন্ন দেখিয়া. সাধকের হস্ত হইতে কুঠার লইয়া চরণস্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন, "একি আপনাকে এরূপ কার্য্য করিতে কে বলিল?" সাধক বলিলেন, "অন্তর্বাসিনী জগদম্বা রূপিণী এই কন্যা।" আপনাকে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য আপনার কন্যা বাহিরে আসিয়া বলাতে আমার কাষ্ঠ ছেদনের ইচ্ছা হইল, আমি আপন ইচ্ছায় কাষ্ঠ ছেদন করিয়াছি এবং আনন্দ অনুভব করিতেছি, শারীরিক পরিশ্রম কি মন্দ? নিজ হস্তে সমুদয় গৃহকর্ম্ম করা ভাল, আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না।" ইত্যবসরে বিশু আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরকে কাষ্ঠ কাটিতে দেখিয়া বিশু গদ গদ কণ্ঠে কহিল, "একদিন লোক কাঠ কাট্‌তে বল্‌লে দেমাক করে বল্‌তাম, পার্ব্বো না, ভাব্‌তাম, রেতের রোজগার মজুর খাটার পঞ্চাশ গুণ, মজুরী কর্ব্বো কেন? হায় হায় কি দুর্ম্মতিই ছিল, এমন ভাল কাজে পেটের ভাত রোজগার না করে মানুষ মেরে খেতাম, আমি রাক্ষস, মানুষ নই।" এই বলিয়া কাটা কাষ্ঠের বোঝা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। কেনারামের ভ্রাতা কহিলেন, "বিশু! তোমায় কাষ্ঠ বহিয়া লইয়া

যাইতে হইবে না। আমার লোক আসিতেছে, তাহারাই কাষ্ঠ লইয়া যাইবে।" বিশু কহিল "আমি ঠাকুরের কাটা কাঠ মাথায় করে বইবো।"

গ্রাম মধ্যে তাঁহার এই বৃত্তান্ত শীঘ্রই প্রচারিত হইল, কেহ তাঁহার অমায়িকভাব, কেহ বা অভিমান শূন্যতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেনারাম চট্টোপাধ্যায় কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, তিনি বাটী আসিয়া সাধকের কাষ্ঠ ছেদন শুনিয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "শুনিলাম আজ আপনি আমার গৃহের রন্ধন কাষ্ঠের আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু আমি আপনার নিকট সামান্য সম্বল সংগ্রহের প্রত্যাশী নহি। আপনি পরকালের অনন্ত পথের সম্বল বলিয়া আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এ কথাও আপনিই বলিয়াছেন। এই বলিয়া নিম্নলিখিত গানটী আবৃত্তি করিলেন :—

ওরে! কিছু পথের সম্বল কর রে ভাই।
ঐহিকের যত সুখ হল হল নাই নাই ॥
ক্রোশেক দু ক্রোশ যেতে গেঁটে বেঁধে লও খেতে
সে বড় দুর্গম পথ, মাথা খুঁড়লে পাবে নাই ॥
বাণিজ্য ব্যবসায় এসে, মূলে টানাটানি শেষে,
এখন উপায় বল, কল্পতরু মূলে যাই।
কমলাকান্তের মন, যথা আছে মহাধন,
সকল আশায় দিয়ে ছাই, দৃঢ় করে ধর তাই ॥

কেনারাম কহিতে লাগিলেন, "ভবের হাটে এসে আমি মূল

হারাইতে বসিয়াছি, আর কেনা বেচা কতদিন চলিবে, পূর্ব্বধন সব ফুরাইয়া আসিল, পরকালের সম্বল কিছু মাত্র করি নাই, করিতেও পারিতেছি না। আপনি সকল আশায় ছাই দিয়া মহাধনের অনুসন্ধান করিতে বলিতেছেন, কিন্তু হায় হায়! আমার যত দিন যাইতেছে, তত আশালতা বাড়িতেছে, মনকে জড়ীভূত করিতেছে, সে আশালতা ছিড়িবার শক্তি আপনাকেই দিতে হইবে, সে লতার মূলচ্ছেদের উপায় আপনাকেই বলিয়া দিতে হইবে।" বিশু কেনা-রামকে কহিল, "দাদা ঠাকুর! তুমি পরকালের জন্য ভাব্‌ছ, তা হলে আমার কি গতি হবে। তোমার গা খোলোসা, আমার যে পাপের বোঝা মাথায়। ঠাকুরের পেছু পেছু যাবার শক্তি নাই, ঠাকুরকে আমার পাপের বোঝাটী নিতে হবে, না হলে আমি কিছুতে ছাড়্‌ব না।" সাধক নির্দ্দোষ হাস্য পরিহাসপ্রিয় ছিলেন, কেনারামের আসিবার পূর্ব্বে বিশুর সহিত বসিয়া বালকের ন্যায় নানা কথায় হাস্য পরিহাস করিতেছিলেন, এখন বিশুর এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বিশুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বিশু! তোমার মাথার বড় বোঝাটী কি শেষে এই বুড়ো বামণের ঘাড়ে ফেলিয়া দিবে এই মতলব ঠিক করিয়াছ? বোঝাটা তুমি নিজে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারিবে না।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! তুমি শক্তি দিলেই পার্ব্বো, বুঝেছি সে শক্তি দেনার কর্ত্তা তুমি।" সাধক কহিলেন, "শক্তি দিবার কর্ত্তা আমি নয়, শক্তি উপার্জ্জন করিবার কর্ত্তা তুমি, তোমার মন, তোমার আত্মা, এ সব কথা তুমি এখন বেশ বুঝিতে পারিবে না, তুমি যার ভাবনা ভাবিতেছ তাঁহাকেই

নিতান্ত-আশ্রয় কর, তিনিই তোমার পাপের বোঝা লইবেন, কালী নাম রসায়নে কলুষ কাটিয়া যাইবে, তুমি নির্ম্মল হইবে।" সাধক কেনারামকে কহিলেন, "ভাই! তুমি সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী। সংসারে অবস্থান করিয়া যাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে, দেখিতেছি, তাহাই তুমি করিয়া থাক। তোমার সরস প্রাণে মায়ার বন্ধন শিথিল অবলোকন করিতেছি। তোমার আসক্তি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি তোমাকে অনেক দূর অগ্রসর দেখিতেছি, আমি তোমাকে সর্ব্বদা ব্যাকুল দেখিতেছি। এই ব্যাকুলতাই তোমার পরকালের দুর্গম পথের যষ্টি স্বরূপ।" কেনারাম কহিলেন, "এই সংসারের জন্য সিদ্ধেশ্বরীর নির্জ্জন সাধনার সময় পাই না। আমি ক্রিয়াহীন। আমি মনে করি, চিন্ময়ীকে চিত্ত হইতে তিলেক ত্যাগ করিব না, কিন্তু সংসার অনেক সময় আমাকে অন্য চিন্তায় রাখে।" সাধক কহিলেন, "যে জন চিন্তাহরা চিন্ময়ীকে চিত্ত মধ্যে রাখিয়া চলিতে পারেন, তাঁহার বাহ্য সাধনা ক্রিয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। জগদম্বার চরণে সর্ব্বদা মনের সন্নিবেশ হইতে ভক্তি আইসে, ভক্তি হইতে জ্ঞান আইসে, জ্ঞান হইতে ধ্যান আইসে, ধ্যান হইতে তন্ময়ভাব আইসে, তন্ময়ভাব হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ, ত্যাগ হইতে চিরশান্তি লাভ হয়। "অভ্যাসাৎ জ্ঞান মুচ্যতে, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে, ধ্যানাৎ কর্ম্মফল ত্যাগঃ, ত্যাগাচ্ছান্তি নিরন্তরং।" ইহা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাক্য, নিত্য সত্য। ভক্তিযোগে সাধনা মন্দিরের মধ্যে যাইবার পথ পাইয়াছ, অক্লান্ত ভাবে ত্যাগ স্বীকার

করিয়া চল, উপাস্য দেবতার দর্শন পাইবে। বাহ্য সাধনা কেবল মাত্র চিত্তশুদ্ধির জন্য। যখন চিন্ময়ীকে সর্ব্বদা চিত্ত মধ্যে ধ্যান করিতে অভ্যাস করিয়াছ, তখন বাহ্য সাধনার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া সাধক গাহিলেন,—

যার অন্তরে জাগিল ব্রহ্মময়ী, তার বাহ্য সাধন কিছুই নয়।
অচিন্ত্য চিন্তিলে অন্য চিন্তা আর কি মনে লয়॥
যেমন কুমারী কন্যার খেলা নানাভাবে হয়।
তাদের পতির সঙ্গে সঙ্গ হলে, সে সব খেলা কোথা রয়॥
কি দিয়া পূজিব তাঁরে সে যে সত্ত্বতত্ত্ব ময়।
দেখ নির্গুণ কমলাকান্ত, ভাবেও করে গুণাশ্রয়॥

সাধক কহিলেন, "মূলাধারে নিদ্রাগত যোগমায়াকে জাগাইবার জন্য চিত্ত শুদ্ধির প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধিব জন্য বাহ্য সাধনার প্রয়োজন। আমি দেখিতেছি, তোমাব চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তোমার বাহ্য সাধনার প্রয়োজন কি ? চিত্তশুদ্ধিমান ব্যক্তির বৈদিক ক্রিয়া কলাপও নিষ্প্রয়োজন। পুষ্পাহরণ, নৈবেদ্যাদির চেষ্টার কিছু প্রয়োজন দেখি না। দেখ কুমারী কন্যা নানাভাবে খেলা করে, সে মাটীর সংসার পাতায়, বালির ঘর করে, উনান পাতে, শাক পাতা লইয়া তরকারী করে, পরিবেশন করে, পুতুলের বিবাহ দেয়, জামাই বেহাই পাতায়, কিন্তু যখন সেই কুমারীর সংসারের উপাস্য দেবতা পতির সহিত মিলন হয়, তখন উপাস্য দেবতা পতিকে হৃদয়ে স্থান দিয়া সত্যের সংসারকে অবলম্বন করে, পাতান মিথ্যার সংসার ভুলিয়া যায়, তেমনি বাহ্য সাধনা মিথ্যার সংসার, সেই বাহ্য সাধনায় চিত্তের

চাঞ্চল্য দূর হইলে, জীবভাব দূরীভূত হইলে, চিন্ময়ীকে চিত্ত মধ্যে সর্ব্বদা স্থিতিভাবে রাখিতে পারিলে, আর বাহ্য সাধনার প্রয়োজন্ কি? বাহ্য সাধনার অঙ্গ, পূজাদি, কিন্তু কি দিয়া তাঁহার পূজা করিবে? তিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, প্রভৃত সমুদয় পদার্থ। তোমার বাহ্য সাধনা নাই বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না। চিন্ময়ীকে স্থিতিভাবে হৃদয়ে রাখিতে অভ্যাস কর, তোমাকে সকল গুণ আশ্রয় করিবে। দেখ, আমি জানি আমার কোন গুণই নাই; আমি জানি, আমি কেবল জগদম্বার অতি শরণাগত, তাই তোমরা আমাকে গুণবান বলিতেছ। এইরূপ সদালাপে কেনারাম ও সাধকের অনেক সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু কেনারামের ভাগ্যে সাধকের সহবাস সুখ সম্ভোগ বেশী দিন ঘটিল না। সাধকের অম্বিকার ধনাঢ্য শিষ্যের গৃহে কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে সাধককে শীঘ্রই অম্বিকার যাইতে হইল। অম্বিকায় যাইবার পূর্ব্বে সাধক বিশুকে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু, বিশু বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া সাধকের চরণে পতিত হইল, সাধক বিশুকে সঙ্গে লইয়া অম্বিকায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে বিশু সাধককে কহিল, "ঠাকুর! আমি বেশ বদ্লাব, মাথা মুড়াব।" ঠাকুর কহিলেন, "বেশ বদ্লান মুহূর্ত্তে হয়, কিন্তু মন বদ্লান্ হয় ত জন্মেও হয় না। বিশু গেরুয়া বসন পরিল, তাঁহার চাঁচর চুল মুড়াইল। সাধক কেণারাম ও গ্রামবাসীগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস বেশী বিশুর সহিত অম্বিকা যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ অংশ।

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সহিত সাধকের সাক্ষাৎ ও তাঁহার বর্দ্ধমানে আগমন।

"ঈশ্বর সাধনা কহি শোন স্থির।
একমাত্র নহে করম যোগীর॥
পরম করম তাঁর, সদাপর-উপকার,
লোক হিত কর কার্য্যে জীবন তাহার।
ব্যয়িত হইবে বলি ত্যজে সে সংসার॥"

নিবিড় নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে, পর্ব্বত গুহায় যোগ সাধনা করিয়া লোকহিতকর কার্য্যে জীবন ব্যয়িত না হইলে কোন সাধকের, কোন যোগীর চিত্তের প্রসন্নতা আইসে না। ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ তপঃসিদ্ধ হইয়াও লোক সমূহের ত্রিতাপ বিনাশের জন্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র, নারদাদি ঋষিগণ মানবগণের উদ্ধারের জন্য নিজ নিজ তপস্যার অংশ প্রদান পূর্ব্বক সিদ্ধ মন্ত্র সকল প্রচার করিয়াছেন। রাজপুত্র ভগবান বুদ্ধ এই লোক শিক্ষার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সিদ্ধার্থ কঠোর-তপস্যায়

শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া আধি ব্যাধি পীড়িত লোক সমূহের চিরশান্তি মোক্ষের পথ উদ্ভাবন করিয়াছেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ভগবান শঙ্করস্বামী বৌদ্ধমতাবলম্বী সমুদয় রাজগণকে স্বমতে আনয়ন পূর্ব্বক ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। এই সমুদয় মহাপুরুষগণ রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত ছিলেন, প্রজাশক্তির সমষ্টি রাজশক্তির আশ্রয়ে তাঁহাদিগের লোকশিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। মহাত্মা মহম্মদ ধনশালিনী খাদিজা নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণে ধনশালী বণিকগণের পদস্থ হইয়া নিজ মত প্রচারে প্রবৃত্ত হন। যে কোন প্রকারে হউক রাজগণের সহিত সংশ্রব ব্যতীত ধীশক্তির সাফল্য লাভ হইতে অনেক দিন আবশ্যক করে। ঈশ্বর সদৃশ মহাপুরুষগণ হইতে সামান্য কবিকুল পর্য্যন্ত রাজশক্তির সাহায্যে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এখন সাধক কমলাকান্ত সেই রাজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ জন্য অম্বিকায় চলিলেন। তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর কর্ত্তৃক পূজিত হইতে চলিলেন। তাঁহার রচিত পদাবলী সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিলেও বর্দ্ধমানাধিপতির সংশ্রবে তাঁহার রচিত পদাবলির বহুল প্রচার আরম্ভ হয়।

সাধক কেনারামের সহিত বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অমরারগড় হইতে চান্নায় প্রত্যাগত হইতেছেন। চান্না হইতে অম্বিকা যাত্রা করিবেন। সাধক বিশুর সহিত সেই ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় প্রবেশ মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধক কহিলেন, "বিশু! তোমার বাড়ী কোন গ্রামে?" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমার বাড়ী

শিবদে, আমরা আমার গ্রামের পাশ দিয়া যাইতেছি।" সাধক কহিলেন, "বিশু! তোমার গ্রাম প্রবেশের ইচ্ছা হইতেছে না? তোমার আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইতেছে না? তোমাকে আবার বলিতেছি, তোমার মায়ার জিনিস এখনও বর্ত্তমান আছে, তুমি শান্তি লাভ করিতে পারিবে না, বাটী ফিরিয়া যাও।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমার কায়েও দেখ্‌তে ইচ্ছে নাই, গায়ে আগুন লাগা লোকের মত ব্যাকুল হয়েছি, তোমাকে ধরে দাঁড়ালে শান্তি পাচ্ছি, জ্বালা যাচ্ছে, ওই দেখুন আমার গ্রামের ধার, ওই দেখুন পুকুর, পদ্মফুলে আলো হয়ে আছে, ওই দেখুন, বেলগাছ, ওই ফুল তুলে, ওই বেলপাতা তুলে মা কালীর পায়ে দিতাম, ওদিকে আমি বড় ভালবাসি, ওরা ত আমাকে ডাকাতী কত্তে বল্‌তো না, ওরা এখন আমাকে হেসে হেসে বল্‌ছে যা বিশে বেঁচে গেলি। আমি গাঁয়ের গাছ পালাদিগকেও বড় ভালবাসি, ওরা ত আমাকে ডাকাতী কত্তে বলে নাই। ঠাকুর! পরিবার দিকেও ভাল বেসেছি, মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছি, যদি পরিবার বলেছে আজ সোণার গহনা পর্ব্বো, বিশে আহ্লাদে আট-খানা হয়ে নিজের প্রাণের দিকে না চেয়ে, বড় লোকের বাড়ী ডাকাতী কত্তে বেরুয়েছে, যদি পরিবার আকাশের চাঁদ চেয়েছে; চাঁদ ধর্ব্বার জন্য পাগলের মত লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়েছে, ঠাকুর! আর না, যদি তোমাকে পেতাম, যদি আমার মা কালীকে তেমনি করে ভাল বাস্‌তাম, তাহলে আজ এমন করে কাঁদ্‌তে হত না। আমি আমার মা বাপের চরণে প্রণাম করে, গ্রামের ঐ সকল গাছ

পালা, সাধু সজ্জনের কাছে বিদায় চাচ্ছি, সকলের কাছে জন্মের মত বিদায় চাচ্ছি, সকলে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুক, যেন বিশের পাপের ক্ষয় হয়। ঠাকুর! ঐ শুনুন কাক, কোকিল, গরু, বাছুর সকলে একেবারে ডাক্‌ছে, ওরা ত কেউ আমার শত্রু নয়, কি বল্‌ছে জানেন, যা বিশে তোর মুক্তি হবে, ঠাকুর পেয়েছিস ছাড়িস না।" সাধক দেখিলেন বিশুর বৈরাগ্য অতিশয়। ঔরসজাত সন্তান, পাণিগ্রহিতা পতিপরায়ণা পত্নী, শৈশবের সুহৃদ, আজন্ম পরিচিত তরুলতা, জলাশয়, বাসস্থান, ক্রীড়াস্থান জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে যাহার হৃদয় ব্যথিত না হয়, তাহার হৃদয় সংসার ভাব হইতে মুক্ত। ক্রমে তাঁহারা ওড়গ্রামের ডাঙ্গার মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাতঃকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। সূর্য্যদেব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করিয়া দক্ষিণ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক চলিতেছেন। সমুদয় জগৎ কোলাহল পূর্ণ হইলেও প্রান্তর বৃক্ষাদি রহিত, বিহঙ্গমগণের গতিবিধি বর্জ্জিত অতএব অতি নীরব। বিশু যাইতে যাইতে দাঁড়াইল, সাধকের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর! এই সেই স্থান, যেখানে শড়্‌কী হাতে করে তোমাকে খুন কর্ব্বার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম, তোমার গান শুনে, তোমার পা ছুঁয়ে আমার জ্ঞান এসেছিল, এই ডাঙ্গা আমার পাপের পাহাড়, মানুষ যাবে, ঘর দুয়ার যাবে, গাছপালা কিছুই থাক্‌বে না, কিন্তু এই ডাঙ্গা থাক্‌বে, আমার পাপের গন্ধ থাক্‌বে।" ঠাকুর! কহিলেন, "বিশু! কিসের পাপ! যে জন কালীনাম করে তার কি পাপ থাকে?" প্রান্তরের সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সে দিনের

ঘটনা মনে হওয়াতে সাধকের কিছু ভাবান্তর ঘটিল, তিনি জগদম্বার ধ্যান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন,—

এই সময় ভজ মন! তারা।
গেলে এ সময়, হবে অসময়,
তখন মূলে মূলে ভুলে হবে দিশে হারা॥
কাল ফিরিছে অণু, জীর্ণ করিছে তনু,
বহে গেলে দিন, হবে পরাধীন,
হবে ভ্রান্ত নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ে সারা॥
সম্পদে বাড়িছে সুখ, আজ বই কাল দুখ,
দুখের উপরে দুখ, যখন হবে জরা।
কমলাকান্তের কাছে, এখনও উপায় আছে,
রঙ্গী রসনা, মাকে ডাকনা,
পাবে ভবে মুক্তি, শিবের উক্তি, ভাব্‌লে ভব দারা॥

গান শুনিয়া বিশুর নয়নবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সে সাধকের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান, নির্ব্বাত সময়ে পাদপের ন্যায় নিশ্চল। সঙ্গীত শেষে বিশু কহিল, "ঠাকুর! এ তোমার গান নয়, ঘুমপাড়া মন্ত্র, মা কালী সাক্ষাৎ হয়ে তোমার গান শোনেন।" এই বলিয়া বিশু সাধকের সহিত পরমানন্দে চলিল এবং অতীত বেলায় চান্নায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধক দেবী বিশালাক্ষীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক ওড়গ্রামের ডাঙ্গার ঘটনা স্মরণ করিয়া কহিলেন, "লীলাময়ী! তোমার খেলা কে বুঝিবে? মা! শৈল-সমুদ্রশালিনী বসুন্ধরা তোমার ইচ্ছায় থর

থর কম্পিত হয়, রাজ রাজেশ্বরের মুকুট ভয় বিচলিত হইয়া ভূমে পতিত হয়, সূর্য্যজ্যোতিঃ চন্দ্রজ্যোতিঃ বিলুপ্ত হইয়া পৃথিবী অন্ধকার হয়, অতি শরণাগত সেবককে ঘৃণিত পরিণাম হইতে রক্ষা করা তোমার পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর, একজন পাশণ্ডের বিকার উপস্থিত করা অতি তুচ্ছ।" এই বলিয়া দেবীর আরাধনা পূর্ব্বক সে দিন চান্নায় অবস্থান করিয়া পরদিন প্রত্যুষে বিশুর সহিত অম্বিকা যাত্রা করিলেন।

মহাত্মা কমলাকান্ত অম্বিকায় গমন করিয়া শিষ্যবর্গ দ্বারা পূজিত হইয়া সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর সেবায় স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। বিশুর সহিত সাক্ষাতের বৃত্তান্ত প্রায় সকল স্থানেই প্রচারিত হইল। সাধকের ন্যায় বিশুও অনেকের দর্শনীয় হইল। অম্বিকা কালনার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সাধক এখন বিশিষ্টরূপে পরিচিত ও পূজিত। এই সময় ঘটনাক্রমে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর কালনায় উপস্থিত হয়েন। কালনা সুরতরঙ্গিনীর তীরবর্ত্তী, বর্দ্ধমানাধিপতিগণের অধিকার মধ্যে পুণ্যক্ষেত্র, সেই জন্য ধর্ম্মপ্রাণ রাজগণ মধ্যে মধ্যে কালনায় গিয়া অবস্থান করেন। কালনায় বর্দ্ধমানাধিপতিগণের কীর্ত্তি কলাপ দর্শনীয়। এক শত শিবালয়, বিস্তর দেব মন্দির, সমাজ বাটী প্রশংসার যোগ্য। মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর উদার চিত্ত, গুণগ্রাহী ও স্বজনানুরক্ত ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিও বিস্তর। বর্দ্ধমান অঞ্চলে অনেক পুরাতন ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁহার সাক্ষরিত নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি প্রদানের পত্রিকা এখনও বিদ্যমান আছে। তিনি

বদান্য ও সৎকর্ম্মপ্রিয় ছিলেন। কথিত আছে, বর্দ্ধমান রাজবাটির মোক্তার হুগলী কালেক্টারিতে দেয় রাজস্ব হইতে একলক্ষ টাকা চুরি করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। মোক্তার বাবুকে বর্দ্ধমানে বন্দী করিয়া আনিয়া মহারাজ বাহাদুরের নিকট উপস্থিত করা হইল। মহারাজ বাহাদুর মোক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একলক্ষ টাকা লইয়া কি করিয়াছ।" মোক্তার অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার টাকা সৎকর্ম্মেই-ব্যয় করিয়াছি। আমাদের গ্রামে ভাল জলাশয় নাই, আপনার প্রজা-গণ ভীষণ জলকষ্ট ভোগ করে, আমি আপনার অর্থে একটি জলাশয় খনন করাইয়া মহারাণীর নামে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছি। যে সকল লোক আমাকে বন্দী করিয়া আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার পুণ্যে পুষ্করিণীর জল কিরূপ সুন্দর হইয়াছে। আমাদের গ্রামে শিবমন্দির নাই, সন্ধ্যার সময় কুমারীরা দীপ দান করিতে পান না, শিব রাত্রির দিন ও অন্যান্য পার্ব্বণে আপনার প্রজাগণ মহাদেবের পূজা করিতে পান না, আমি আপ-নার টাকায় একটি শিব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শিব লিঙ্গ স্থাপন করাইয়াছি। আমাদের গ্রামটী বর্দ্ধমান হইতে পুরী যাইবার পথে অবস্থিত,—কিন্তু আমাদের গ্রামে কি কোন নিকটবর্ত্তী গ্রামে পান্থশালা নাই। আমি আপনার ব্যয়ে একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছি, যে সকল লোক আমাকে আনিতে গিয়াছিল, তাহারা সেই পান্থশালায় বিশ্রাম করিয়াছিল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন পান্থাশালাটী কিরূপ বাসের উপযুক্ত হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া

মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "দেখিতেছি এ ব্যক্তি আমার টাকা অতি সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছে।" এই কথা বলিয়া মোক্তারকে কহিলেন, "সমুদয় কাজ তোমার মনের মত হইয়াছে?" মোক্তার অতি প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, "মহারাজ! সমুদয় কর্ম্ম আমার ইচ্ছা-মত সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল শিবলিঙ্গটীর প্রতিষ্ঠা এখনও বাকী আছে, আর এক হাজার টাকা হইলে সমারোহের সহিত আপনার নামে শিবলিঙ্গটী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।" মহারাজ বাহাদুর মোক্তারের এই কথা শুনিয়া তাহাকে এক হাজার টাকা দিয়া বিদায় দিবার আদেশ দিলেন। বসন্তপুর নামক গ্রামে মোক্তারের নিবাস ছিল। বসন্তপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। কবিকুল চূড়ামণি রায় গুণাকর ভারত চন্দ্রের জন্মস্থান পাণ্ডুয়া নামক গ্রামের অতি সন্নিকট, হাবড়া জেলায় মুন্শীর হাট রেলষ্টেশন হইতে দুই তিন ক্রোশ। পুষ্করিণী ও শিব মন্দিরটী এখনও বিদ্যমান আছে। পুষ্করিণীটির নাম "রাণীর সায়ের" ও শিবলিঙ্গটির নাম "চণ্ডেশ্বর" কালের প্রভায় পুষ্করিণীটী দীর্ঘ জলজ জালে পরিপূর্ণ। শিব মন্দিরটী ঘাটের উপর অবস্থিত, সংস্কার বিহীন। দেব সেবার জন্য মহারাজা কর্ত্তৃক অনেক ভূ-সম্পত্তি দেওয়া আছে, পূর্ব্বে বসন্তপুর গ্রামখানির নাম চণ্ডালপুর ছিল। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের শেষ রাণী বসন্ত কুমারীর নাম অনুসারে শুনিতে পাওয়া যায় গ্রামটির নাম বসন্তপুর হইয়াছে। প্রবাদ আছে মহারাণী বসন্তকুমারী কুমারী অবস্থায় নিজ পিতার সহিত শ্রীক্ষেত্র গমন করেন। পথমধ্যে ঐ বসন্তপুর গ্রামে একদিন অবস্থান করেন। পাণ্ডুয়া, বসন্তপুর

প্রভৃতি গ্রাম মহারাজা বাহাদুরের অধিকার ভুক্ত ছিল। মহারাণীর পিতা মহারাজার স্বজন জানিয়া উক্ত মোক্তার প্রমুখ গ্রামবাসীরা তাঁহাদের গ্রামে ভাল জলাশয়, শিব মন্দির ও অতিথিশালা নাই বলিয়া তাঁহার নিকট আবেদন করেন। মহারাণীর পিতা গ্রামবাসীদিগের অভাব মহারাজা বাহাদুরের কর্ণগোচর করিয়া অভাব দূরীকরণ করিবার চেষ্টা করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইলে মহারাজা বাহাদুর বসন্ত কুমারীর পাণি গ্রহণ করেন। মোক্তার বাবু এক্ষণে উৎসাহিত হইয়া মহারাণীর পিতা ও মহারাণীর নিকট পুনর্ব্বার আবেদন করেন ও শীঘ্র অর্থ সাহায্য পাইবেন বলিয়া আশা প্রাপ্ত হন, কিন্তু মোক্তার বাবু মহারাণী কি মহারাজা বাহাদুরের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া বর্দ্ধমান রাজস্বের এক লক্ষ টাকা লইয়া বাটী গিয়া ঐ সকল সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতে থাকেন। যাহা হউক মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের বদান্যতার আরও অনেক ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই সকল যথাস্থলে বর্ণিত হইবে।

সাধক কমলাকান্তের সুখ্যাতি ক্রমে ক্রমে মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের কর্ণগোচর হইল। তিনি সাধকের সঙ্গীত শ্রবণের অভিলাষী হইলেন। মহাত্মার অধিকার ধনবান শিষ্য মহারাজা বাহাদুরের পরিচিত ছিলেন। মহারাজা বাহাদুর সেই ধনাঢ্য শিষ্যকে আহ্বান করাইয়া তাঁহার গুরু পুত্রের সঙ্গীত দ্বারা লোক বিমোহনের অসাধারণ শক্তির কথা উল্লেখ পূর্ব্বক সঙ্গীত শ্রবণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শিষ্য অতিমাত্র প্রফুল্ল হইয়া সেই

দিনই গুরুপুত্রের সহিত মহারাজার সমীপে উপস্থিত হইবেন নিবেদন করিয়া গুরুপুত্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক মহারাজা বাহাদুরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সাধক হর্ষ বা বিমর্ষতা প্রকাশ না করিয়া শিষ্যকে কহিলেন, "নদী, পর্ব্বত, রাজগণের নিকটে সর্ব্বদা বাস ভাল নয়, কিঞ্চিৎ দূরে থাকিলেই ভাল"। যখন আমরা তাঁহার অধিকারে বাস করিতেছি, যখন তিনি আমাদের পুণ্যের অংশ গ্রহণের অধিকারী, তখন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, আমি অদ্যই সন্ধ্যার পর আপনার সহিত রাজ-দরবারে গমন করিব। শিষ্য সাধকের এই কথা শুনিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। সাধক মহামায়াকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া কহিলেন, "মা! সে দিন নির্জ্জন প্রান্তরে দস্যু মধ্যে আমাকে লইয়া কত রঙ্গ করিয়াছ। রঙ্গিণী! না জানি রাজ দরবারে আমাকে লইয়া আবার কি অভিনয় করিবার ইচ্ছা আছে।"

বিশু তথা উপস্থিত ছিল, কহিল, "রাজ দরবার! যেখানে পাপীদিগের শাস্তি হয়। মহারাজ আমার পাপের শাস্তি দিতে পার্ব্বে না?" সাধক কহিলেন, "বিশু! তুমি কি মানুষের দরবারে তোমার বিচার প্রার্থনা কর? বিশ্বেশ্বরীর দরবার আছে, সেখানে সকল লোকের বিচার হয়, তুমি বলিতেছ, তুমি পাপ করিয়াছ, তুমি পুণ্য উপার্জ্জন কর, পুণ্য কার্য্যে পাপের ক্ষয় হয়, তুমি পুণ্য কর্ম্মে পাপের ক্ষয় করিয়া সেখানে যাইতে চেষ্টা কর, দেখিবে তোমার শাস্তি হইবে না, তুমি পুরস্কার পাইবে।" বিশু করযোড়ে কাতর হইয়া কহিল, "ঠাকুর! তোমাকে সেই কাজ কর্ত্তে হবে, যাতে

আমি মায়ের দরবারে গেলে আমার শান্তি না হয়, আমার পুরস্কার হয়।" বিশুর এই কথা শুনিয়া সাধক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "বিশু! তোমার এ অন্যায় আবদার, কখন বলিতেছ, ঠাকুর! আমার এ পাপের বোঝাটী নাও, কখনও বলিতেছ, ঠাকুর! আমাকে ধরে তোল, আমি পাপের গর্ত্তে পড়িয়াছি।' তুমি এত বড় বলবান পুরুষ, তুমি নিজে কিছু করিতে পারিবে না। শোন বিশু! নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চেষ্টা কর, সর্ব্বদা পাপ পাপ করিও না, কর্ম্মী হও, পৃথিবীর সকল বস্তুতে জগদম্বার আবির্ভাব জানিয়া সকলকেই আপনার পরমাত্মীয় বিবেচনা কর। ঈশ্বরীর ধ্যান, ধারণা, গুণানু-কীর্ত্তন, জীবের মঙ্গল বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিও না, প্রেমের পাগল হও, প্রেম পরম বস্তু, প্রেম পরম বিদ্যা। তুমি যখন পুত্র পরিবার সত্বেও সংসার ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বৈরাগ্য পথ অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছ, তখন তোমার শীঘ্র শ্রেয়োলাভ হইবে।" ইহা কহিয়া সাধক বিশুকে বিষয়ান্তরে লইবার জন্য পুনশ্চ কহিলেন, "দেখ বিশু! আমি তোমার মত কেবল পাপ ভাবিতেছি না, আমি এখন ভাবিতেছি, আমাদের মনের অবস্থা অনুরূপ, আমাদের বিষয়ী লোকের সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়। মানুষ কখনও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হয় না, কেবল মাত্র আমার পরমা-প্রকৃতি সর্ব্বগুণ সম্পন্না, তাঁহার উপাসনাতে তোষামদ নাই, কারণ যাহা তাঁহার আছে তাহা মানুষ বাক্যে প্রকাশ করিতে পারে না। মানুষ মাত্রেই তোষামদ প্রিয়, বিশেষতঃ রাজগণের ও বিষয়ী লোকের সর্ব্বদা তোষামদ শ্রবণ অতি সুলভ। কোন কোন স্থলে

অথবা গুণানুবাদ শ্রবণে ধনাঢ্য ব্যক্তি আনন্দ প্রকাশ না করিলেও শিষ্টতার অনুরোধে তাঁহাকে তোষামদ বাক্য শ্রবণ করিতে হয়। নিজ স্তুতি শুনিয়া মনে মনে আনন্দ প্রকাশ না করে, এরূপ মানুষ অতি বিরল। আমাদের কালীর গুণানুকীর্ত্তন ভিন্ন মানুষের স্তুতিবাদ শ্রবণে প্রবৃত্তি হয় না, তাহাতে আত্মার পরমানন্দের বিঘ্ন হয়। আরও দেখ, বিত্ত, বিলাস ও বিষয় এই উভয়ের পরস্পরের প্রতি ভারী সন্তোষ ভাব, তাহারা দুই সহোদর, বিষয়ী লোকের সহবাসে থাকিয়া পাছে তাহাদের বশীভূত হইতে হয়, ইহাও ভাবনার কথা। সংসারী লোকের বিশেষতঃ বিষয়ী লোকের পরমার্থ ভিন্ন অন্য অর্থ চিন্তায় অনেক সময় অতিবাহিত হয়। তাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা সহবাস, বন্ধুতা ও সজ্জনতার অনুরোধে তাঁহাদের বিষয় চিন্তার সামান্য অংশ গ্রহণ করিতে হইলেও আমাদিগকে আবদ্ধ প্রাণের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। আমরা বনস্পতির পাদদেশে বসিয়া তাহাদের প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা, পত্রাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিশ্ব রচয়িত্রীর বিচিত্র রচনা দর্শন করিয়া সুখী হইব। আমরা কখন খরতর বাহিনী তটিনীর কূলে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক সলিল বিক্ষেপে চঞ্চলার নৃত্য দেখিয়া নৃত্য করিব। আমরা কখনও কণ্টক কাননে কণ্টকাকীর্ণ কুসুম সকলের বিকাশ দর্শনে আমাদিগের আত্মার বিকাশ কতদিনে হইবে এই ভাবিয়া চিন্ময়ীর চিন্তা করিব। আমরা কখনও বা তৃণ শস্য রহিত নির্জ্জন প্রান্তরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চারিদিকে নবজলধর বরণীর অবস্থান অবলোকন করিয়া সুখী হইব। কখন পর্ব্বত

প্রান্তে উপস্থিত হইয়া স্তরে স্তরে শিলারাশির অবস্থান ও তদুপরি মহীরুহগণের পর্য্যায় বিন্যাস দেখিয়া আমরা লীলাময়ীর লীলা দর্শন করিব। আমরা কখন নগরে, কখন জনপদে ও জনাকীর্ণ স্থানে গমন করিয়া লোক সকলের সুখে দুঃখে সমভাগী হইয়া ভবভাবিনীর সংসার ভাবের পর্য্যালোচনা করিব। আমরা কখনও বা শশ্মান কোলে বসিয়া সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক জগতের অনিত্যতা সন্দর্শনে নিত্যানন্দময়ীর ধ্যানে বিভোর হইব।” বিশু কহিল, “ঠাকুর! আমার ও তাই ইচ্ছে। কিন্তু ভয় হচ্ছে, মহারাজা বাহাদুর তোমাকে ছাড়্‌বে না, কাছে রেখে সর্ব্বদা গান শুন্‌বে, দেখো ঠাকুর! আমাকে ছেড়ে যেও না।” সাধক কহিলেন, “বিশু! যদি মহারাজা বাহাদুর বলেন, “তোমাদের এ প্রকার রুক্ষ কেশ, মৃত্তিকারঞ্জিত মলিন বস্ত্র, পাদুকা বিহীন পদ আমার প্রিয় নহে। তোমাদিগকে আমার এজলাসে থাকিতে হইবে, চাপকান্ পরিতে হইবে, আতর গোলাপ ব্যবহার করিতে হইবে, জরী দেওয়া জুতা পায়ে রাখিতে হইবে, দেখ বিশু! এ সাজ ত্যাগ করিয়া সে সাজ পরিতে পারিবে ত?” বিশু ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “হাঁ ঠাকুর! তবে কি মো সাহেব সাজ্‌তে হবে নাকি? তা হলে যে আমার চাষ করা ভাল ছিল। আর মানুষ মার্‌তাম না। কোন স্থানে কুঁড়ে ঘর করে জগদম্বার মূর্ত্তি রেখে তাঁর চরণে মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে পড়ে থাক্‌তাম। সেই-খানেই ফল মূল আজ্ঞাতাম, মাকে দিতাম, আমি ও খেয়ে প্রাণ ধারণ কর্‌তাম। বিশুর এই কথা শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন, “যাও

বিশু, তুমি তাই কর, তোমার ভাল হইবে। যদি আমি রাজার ঘরে যাই আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইবে বলিতে পারি না।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! তোমাকে না দেখে এক তিলও থাকতে পার্ব্বোনা। ঠাকুর! আমি ভোলালে ভুলবো না, আমি বেশ বুঝেছি, পাহাড় ভেঙ্গে যেতে পারে, পৃথিবী উলটাতে পারে, পূর্ব্বের স্থৰ্য্যি পশ্চিমে উদয় হতে পারে, কিন্তু তোমার মন উলটাবে না। বনের পাখীকে সোণার খাঁচায় পুরে ফল মাকড় খেতে দিলে খায়না, সোণার নূপুর পায়ে দিলে সে নুপুর কাটিবারই চেষ্টা করে, নুপুর পরে নাচে না। মহারাজা বাহাদুর যতই চেষ্টা করুক, তোমার এ বেশ ছাড়াতে পার্ব্বেনা, রাজ সভাতেও ধরে রাখতে পার্ব্বেনা। সাধক মৃদু স্বরে গাহিলেন,—

অভয়ে দেহি শরণং করুণাময়ী!
কাতর অনুগত জন প্রতিপালিনী গো।
ত্রাসিত মম তনু বিষয় নিবন্ধে,
ত্রাহি ত্রিতাপ বিনাশিনী গো।
ত্রিভুবন স্বজন পালন লয় কারিণী গো।
কমলাকান্ত প্রমোদ দায়িনী চন্দ্রচুড় হৃদয় বিহারিণী গো॥

অগ্রহায়ণ মাস। দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সূর্য্যদেব ক্ষীণ দীপ্তিতে পশ্চিম গগন উজ্জ্বল করিতেছেন। শীতল কনককান্তি কিরণমালা মহীরুহগণের শিরোদেশে দৃষ্ট হইতেছে। গগন প্রান্তে মেঘমালা তপন কিরণ সংযোগে বিশাল লোহিত পট্টের শোভা ধারণ করিয়াছে। সাধক বিশুর সহিত

গঙ্গাতীরে গমন করিতেছেন। সন্ধ্যা সমাগত দর্শন করিয়া সাধক কহিলেন, "বিশু! ভুবন মণ্ডলের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন আসিতেছে? দিবসে জীবগণের চেষ্টা, কোলাহল, উন্মাদ ভাব, রাত্রে নিবিড় অন্ধকার, নীরব, সমুদয় জগৎ নিশ্চেষ্ট, ইহা দেখিয়া কি তোমার ভবভাবিনীর ঐন্দ্রজালিক শক্তির বিষয় মনে হয় না? সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যোদয়, দিবস রজনীকে বোধ হয় তুমি সাধারণ ভাবে দর্শন করিয়া থাক, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, বিশ্বের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন, বিশ্বেশ্বরীর আজ্ঞা ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালনের কি সুন্দর দৃষ্টান্ত। বিশু! ওই শোন বিহঙ্গমগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া আনন্দে কোলাহল কবিতেছে, দিবসের কোলাহল এখন অন্য সময় অপেক্ষা অধিক বোধ হইতেছে, ইহার কারণ কি জান? সমুদয় জগৎ সত্বর নিশ্চেষ্ট ও শান্তি-ভাব অবলম্বন করিবে তাহার পূর্ব্ব সূচনামাত্র, আতিশয্য হইতে সমস্ত শান্তি ভাব আইসে।" এমন সময় কাল্‌নার দেবালয় সমূহের ঘণ্টা ও কাঁসর শব্দে সমুদয় নগর প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সাধক ও বিশু জগদম্বার ধ্যান করিতে করিতে জাহ্নবীর তীরে উপস্থিত হইলেন।

বিশু গঙ্গাবারি স্পর্শ করিয়া কহিল, "মা গঙ্গা! আমার পাপের ক্ষয় কর মা।" সাধক কহিলেন, "মা আমার সপ্ত পাতক সংহন্ত্রী।" এই কথা শুনিয়া বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমি যে পুরাণ পাপী!" সাধক কহিলেন, "না হে! সদ্য অর্থে টাট্‌কা নহে, গঙ্গাবারি স্পর্শ করিবামাত্র সকল পাপের বিনাশ হয়। বিশু! তুমি বিশ্বাস কর, কেবল পাপ পাপ করিয়া অমূল্য ধীশক্তি সম্পন্ন জীবন অতিবাহিত

করিও না। যখন তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হইবে দেখিবে তখন তুমি কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছ। বিশু! তুমি জান না, সন্দেহই মানুষের দুঃখ, যে ব্যক্তি সকল কার্য্যে সন্দিগ্ধ তাহার সকল কার্য্যই নিস্ফল হয়, তুমি তাহাকে দুঃখী বলিয়া জানিবে।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! পাপের কথা উঠাতেই আমার মন যেমন কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। মা গঙ্গার উপর ফেণা গুলাকে আমার মারা মানুষ পড়ে আছে বলে বোধ হচ্ছে। জলের ঢেউ লেগে কল কল শব্দ হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে আমার শড়্‌কীর আঘাতে মানুষ পড়ে চিৎকার কচ্ছে, ওই শুনুন ঠাকুর! শাঁখ ঘণ্টা বাচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে ওরা বল্‌ছে, "বিশে বেটা পাপী।" বিশুর এই সকল কথা শুনিয়া ও তাহার দুঃখিত বদন নিরীক্ষণ করিয়া সাধক কহিলেন, "বিশু! তুমি গঙ্গা মাহাত্ম্য জান না, তাই বারি স্পর্শে তোমার কিছু মাত্র পাপ থাকিবে না, এই বিশ্বাস আসিতেছে না। "ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা প্রভৃতি পাপ করে—কুশাগ্রে পর্শিলে জল সর্ব্ব পাপে তরে।" বিশু! তুমি গঙ্গার মর্ত্ত্যলোকে আসিবার ইতিহাস শোন—পূর্ব্বে অযোধ্যা নগরে সগর নামে একজন নরপতি ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। ইন্দ্র সংসারের হিতের জন্য তাঁহাব যজ্ঞের ঘোড়াটী লইয়া পাতালে যেখানে কপিল মুনি তপস্যা করিতে ছিলেন, তথায় লুকাইয়া রাখেন। সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান ছিল। তাঁহার সন্তানগণ কুত্রাপি অশ্বের সন্ধান না পাইয়া পৃথিবী খনন করিয়া পাতালে গমন করেন। কপিল মুনির নিকট অশ্বের সন্ধান পাইয়া সগর সন্তানগণ তাঁহাকে অশ্বচোর

বিবেচনা করিয়া খনিত্র দ্বারা আঘাত করেন। কপিল মুনি কুপিত হইয়া শাপ প্রদান পূর্ব্বক সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। সগর রাজার পৌত্র সন্ধান করিয়া পাতালে গমন পূর্ব্বক কপিল মুনিকে স্তবে সন্তুষ্ট করেন। মহর্ষি কপিল বলিলেন, "গঙ্গা ব্রহ্মলোকে আছেন, যদি তুমি পাপী তাপী তরাইবার জন্য তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোকে আনিতে পার তাহা হইলে তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণ জীবিত হইবেন।" সগরও তাঁহার পৌত্র অনেক তপস্যা করিয়াও গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিতে পারেন নাই, পরে সগর রাজার প্রপৌত্র বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আনিয়া নিজ বংশের উদ্ধার করেন। সাধক পুনশ্চ কহিলেন, বিশু! গঙ্গা স্বর্গের নদী, ইনি স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভগীরথ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া এই সুরেশ্বরী ভাগীরথীকে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তোমার মা কালী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ও আরাধ্যা। তোমার মা কালীর অসংখ্য রূপ। তাঁহার এই দ্রবময়ী রূপ।" সাধকের মুখে গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিশু সজল নয়নে পরমা ভক্তির সহিত কালী, কালী বলিয়া গঙ্গাবারি স্পর্শ পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

গঙ্গাতীর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সাধক বিশুর সহিত কালনায় মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সভায় গমন করিতেছেন। সাধকের বয়ঃক্রম চল্লিশের অধিক। সূর্য্যরশ্মি সংযুক্ত স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তাঁহার নয়ন যুগল উজ্জ্বল, হাস্যময় বদন, কেশ কলাপ দীর্ঘ ও গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত বিন্যস্ত, পরিধান গৈরিক বস্ত্র, অঙ্গ এক মৃত্তিকা

রঞ্জিত বস্ত্র খণ্ড দ্বারা শরীর আবৃত। রাজসভা সুন্দর ভাবে সজ্জিত। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর মহার্ঘ্য আসনে উপবিষ্ট, পার্শ্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র যুবরাজ প্রতাপচাঁদ, যুবা পুরুষ, বয়স ১৯ বৎসর। বাঙ্গালা ১১৯৭ সালে যুবরাজ প্রতাপচাঁদের জন্ম হয়। কথিত আছে ১২১৬ সালে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সহিত সাধকের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কাল্নার গণ্য মান্য, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ, পণ্ডিত মণ্ডলী ও অনুজীবিগণ অনেকেই রাজ সভায় উপস্থিত। সভাগৃহ প্রশস্ত, সুধাধবলিত, বিবিধ আলেখ্য পরিশোভিত। গৃহের পাদদেশ রঞ্জিত প্রস্তর গ্রথিত। স্ফটিক দীপদান মধ্যে লম্বমান স্নিগ্ধ আলোক মালা দিবস জ্যোতিকে অতিক্রম করিয়াছে। অগ্রে সাধক, পশ্চাৎ তাঁহার অম্বিকার ধনাঢ্য শিষ্য, তৎ পশ্চাৎ সাধকের সমবেশী বিশু সভা গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। সাধক মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের নয়ন পথে পতিত হইবামাত্র শুক্রসম তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু রাজা বাহাদুরের নয়ন আকর্ষণ করিল। তিনি সাধকের মুখ মণ্ডলে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন কোন স্বর্গীয় মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিতেছেন। তিনি সসম্ভ্রমে আসন হইতে গাত্রোত্থান করাতে যুবরাজ প্রতাপচাঁদ ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ দণ্ডায়মান হইয়া সাধকের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা বাহাদুর নতশিরে নমস্কার পূর্ব্বক সাধকের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। রাজা বাহাদুর ও যুবরাজ প্রতাপচাঁদ সাধকের মুখ মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে কি এক আনন্দের

উদয় হইতে লাগিল। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ দর্শন লাভ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। প্রথম দর্শনেই তাঁহাদের সাধকের প্রতি অপরিসীম ভক্তির সঞ্চার হইল। প্রথম দর্শন শুভভাবে হইলে নিশ্চয়ই সে দর্শন শুভফলদায়ী হয়। সাধক সভাস্থলে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, বিশু দূরে প্রবেশ দ্বারে একপ্রান্তে উপবেশন করিয়াছে। তিনি ইঙ্গিত দ্বারা বিশুকে নিকটস্থ হইতে বলিলেন। বিশু করযোড়ে নতবক্ষে আসিয়া সাধকের অনতিদূরে উপবেশন করিল। বিবিধ বাদ্য যন্ত্রের সহিত সুরের সামঞ্জস্য চলিতে লাগিল। সাধক জগদম্বাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া খাম্বাজ রাগিণীতে গাহিলেন,—

তারিণী আমার কেমন, কে জানে তাঁরে,যেমন তারা তেমনি ভাল।
দুটী অভয় চরণ, ভাব ওরে মন, অনুমানে তাঁর কাজ কি বল॥
প্রকৃতি পুরুষ, অথবা শূন্য, সেই সে সকলি সকলে ভিন্ন,
ধন্য ধন্য! কে জানে অন্য, ভব যাঁরে ভেবে পাগল হল।
নীল পীত লোহিত বর্ণ, কি রূপ কি গুণ, কে জানে মর্ম্ম,
সে সহজে প্রবীণা, অতি সুনবীনা, স্বভাব নির্ম্মল, কথার কাল॥
যেরূপে যেজনা, করয়ে ভাবনা, সেইরূপে তার পূরায় কামনা,
দ্বৈত ভাব ত্যজ, নিত্যানন্দে মজ, অনিত্য ভাবনায় কি আর ফল।
কমলাকান্ত কি ভাবনা আর, পেয়েছ যে ধন হেলে হবে পার,
ওপদে বঞ্চিত যে জনা তার, একুল ওকুল দুকুল গেল॥

তাল মান সহ সাধকের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইবামাত্র সঙ্গীত বিদ্যা পারদর্শী অনেকের মস্তক বিচলিত হইল। মহারাজা বাহাদুর,

যুবরাজ প্রতাপচাঁদ ও অন্যান্য সকলে বিমুগ্ধ চিত্তে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সুরের মাধুর্য্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভক্তির উচ্ছাসে তাঁহাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। অমিয় সদৃশ সঙ্গীতধারা প্রাসাদ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ সমুদয়কে প্লাবিত করিয়া সুরধুনীর কল্লোলের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। প্রাসাদ মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমগণ, প্রাসাদ উপরি তোরণস্থিত ময়ুর দম্পতি গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া নিঃশব্দে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিল। প্রবীণ ধার্ম্মিক মহারাজা ও অন্যান্য অনেকের নয়নে প্রেমাশ্রুপাত হইল। প্রেম ও ভক্তি যুবরাজ প্রতাপচাঁদের প্রকৃতিগত ছিল তিনি নবীন হইলেও তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছাস নয়নে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সঙ্গীত শেষে সকলে সাধকের ভূয়োসি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, তিনি জীবনে এরূপ সুন্দর মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করেন নাই। যুবরাজ প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা অতি মধুর।" "আমার যেমন তারা তেমনি ভাল" রূপ গুণ অবিচারে ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। সন্তান সুরূপ হউক আর কুরূপ হউক, বিদ্বান হউক আর মূর্খ হউক, ধনবান হউক, আর নির্ধন হউক, জননী সন্তানকে ভালবাসিয়া থাকেন, সেই ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। পিতা মাতা কুটিল, কর্কশ ও স্নেহহীন হইলেও যে সন্তান সেরূপ পিতা মাতাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, তাহারি যথার্থ ভক্তি। সভাস্থ জনৈক ভাবগ্রাহী ব্যক্তি কহিলেন, "আরও দেখুন, "অনুমানে ভাব কাজ কি বল" যেখানে অনুমান সেখানেই অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহ,

অস্তিত্বে সন্দেহ থাকিলে দৃঢ়া ভক্তির অভাব হয়। দ্বৈত ভাব বা ভেদ জ্ঞান সন্দেহ প্রসূত। এ নয় সে নয় এরূপ চিন্তা, কল্পনা ও জল্পনায়, দৃঢ়া ভক্তি প্রসূত আনন্দের হানি হয়। সভাস্থ জনৈক পণ্ডিত কহিলেন, "প্রকৃতি পুরুষ অথবা শূন্য" ইত্যাদি কথা গুলিও অতি সারগর্ভ, পরম ব্রহ্ম শাশ্বত, অব্যক্ত, অপরিবর্ত্তনীয়। যেমন সূর্য্য হইতে জ্যোতিঃ সকল বাহির্গত হয়, তাহাতে সূর্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, তেমনি পূর্ণব্রহ্ম হইতে পুরুষ প্রকৃতি সৃজিত হইয়া সাকার রূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণত্বের, নিরাকার চৈতন্য স্বরূপত্বের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না। অতএব তিনি লিপ্ত হইলেও নির্লিপ্ত। সেই অব্যক্ত পুরুষের রূপ নিরূপণও দুঃসাধ্য।" সভাস্থ অন্য এক ব্যক্তি কহিলেন, "একথা গুলিও অতি সুন্দর 'যেরূপে যেজনা করয়ে ভাবনা, সেই রূপে তার পূরয়ে কামনা।' ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

সাধক এতক্ষণ জগদম্বার ধ্যানে ছিলেন, তিনি ভাবিতে ছিলেন, "আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।" মহারাজা বাহাদুরও সভাস্থ ব্যক্তিগণের বিচার ও বাক্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। বিভোর নয়নে জল, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি গুরুতর। বিভু চারিদিকে মা কালীর আবির্ভাব দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আবার বাদ্যযন্ত্র সকলের সুমধুর ধ্বনি ধীরে ধীরে উঠিল। সাধক গাহিলেন,—

আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন মন কেউ না দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস মনরে মাকে দেখি,
রসনারে বলে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে॥
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, নিকট হতে দিও নাক,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ সে যেন সাবধানে থাকে।
কমলাকান্তের মন, শোন মোর নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন সেকি অন্যান্তরে রাখে॥

সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকলের হৃদয় পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ রসে আপ্লুত হইল। সঙ্গীত শেষে সভাস্থ জনৈক ব্যক্তি কহিলেন, "ঠিক বাবা! কাম, ক্রোধ, অজ্ঞান, অহঙ্কার প্রভৃতি কতক গুলি মনের সঙ্গী মানুষের শত্রু। তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে না পারিলে চিত্তের বিশুদ্ধতা আইসে না, হৃদয় মাঝারে উপাস্য দেবতাকে স্থির-ভাবে রাখা কঠিন। 'দরিদ্র পাইলে ধন সেকি অন্যান্তরে রাখে' সুন্দর উদাহরণ। দরিদ্র ধন পাইলে সে নিজের কাছ ছাড়া করে না, নিজের নিকটে রাখিয়াও নিশ্চিন্ত থাকে না, মধ্যে মধ্যে হস্ত দ্বারা অর্থের অবস্থান অনুভব করিয়া সুখী হয়। নিজ উপাস্য দেবতাকে হৃদয় মধ্যে এরূপ ভাবে রাখিতে হইবে, যেন তিলার্দ্ধ কালের জন্য মন তাঁহার চরণ ছাড়া না হয়। এই অভ্যাস যোগে তন্ময় ভাব আইসে।

মহারাজা তেজচন্দ্রবাহাদুর সাধকের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার সঙ্গীত দ্বারা চিত্ত বিমোহনের অসাধারণ

শক্তি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। সঙ্গীত শ্রবণ পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কাল আমি বর্দ্ধমান যাইব। আমার প্রার্থনা আপনি আমার সঙ্গে বর্দ্ধমান যাইবেন। আপনি যখন যাহা ইচ্ছা করিবেন, যথাসাধ্য তখনিই তাহা সম্পাদিত হইবে। সাধকের ধনাঢ্য শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "ইনি আপনার গুরুদেবের পুত্র, আপনি সদ্‌গুরুর শিষ্য। অদ্য হইতে আমি ইঁহাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিব। দেখিতেছি আপনার গুরুপুত্র সংসার ত্যাগী। ইঁহার পিতা মাতা কি পত্নী বর্ত্তমান আছেন কি? শিষ্য নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মহারাজ এখন ইহার একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছেন, ইঁহার সংসারে আরও দুই একজন উপজীবীও আছেন। আমি তাঁহাদের সমুদয় ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়া গুরুপুত্রকে সংসার চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত করিয়াছি। মহারাজা বাহাদুর কহিলেন "আপনি অনেক দিন গুরু ও গুরুপুত্রের সংসারের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আমি তাঁহাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। শিষ্য কহিলেন, "মহারাজ! আমরা সকলেই আপনার অন্নে প্রতিপালিত। ব্রাহ্মণ সংসার প্রতিপালন জন্য আমার সাহায্য আপনার সাহায্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা অবশ্যই সম্পন্ন হইবে। সাধক কহিলেন, "মহারাজ! আমার বর্দ্ধমানে আপনার নিকট অবস্থান করিবার আপত্তি কিছুই নাই, কিন্তু আমার মনের অবস্থা অন্যরূপ, যখন তখন যথা ইচ্ছা গমন, সকল অবস্থাপন্ন লোকের সহিত সমাগম, রাজদ্বারে বদ্ধলোকের

সর্ব্বদা ঘটেনা। তাঁহাদিগকে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য অনেক সময় সৎকর্ম্মেও সঙ্কুচিত হইতে হয়, সেই জন্য আমার প্রার্থনা আমাদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিবেন না।" রাজা বাহাদুর কহিলেন, "আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, দেশ ভ্রমণ, তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি সৎকর্ম্ম আপনার যখন যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। আমি আপনার ইচ্ছার বশবর্ত্তী, যথার্থ বন্ধুর ন্যায় আপনার সাহায্য করিব। আপনি সকল অবস্থার লোকের সহিত ইচ্ছামত সহবাস করিবেন, সাধারণকে উপদেশ দিবেন, ইহা আপনার অমায়িকতা ও অহঙ্কার শূন্যতার পরিচয় দিবে। আমার পূজনীয় ব্যক্তির তাদৃশ ব্যবহার দেখিয়া বরং আমি সুখী হইব।" সাধক মহারাজা বাহাদুরের সহিত বর্দ্ধমান গমনে স্বীকার করিলেন। সাধক কহিলেন, "আমার জননীর আদেশ আছে, আমি সন্ন্যাসী বেশে দেশ ত্যাগ করিব না। দেশে অবস্থান করিয়া জগদম্বার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিব।" মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "তাহাই হইবে। বর্দ্ধমানের মধ্যে আপনার যে স্থানে অভিরুচি হয়, কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অবস্থান করিবেন। আমরা আপনার যখন তখন চরণ দর্শন করিতে পারিব। আপনার মধুময় সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সুখী হইব।" অনন্তর সাধক রাজা বাহাদুরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শিষ্যের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাজা বাহাদুর, যুবরাজ প্রতাপ ও তত্রস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ সুমধুর সঙ্গীত ও তাঁহার চিত্ত বিনোদনের অপূর্ব্ব শক্তির পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী হইতে লাগিলেন। সে রাত্রে নিদ্রাকর্ষণ

পর্য্যন্ত কেহই সাধককে মন হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না।

উদ্দেশ্য ব্যতীত এ জগতে কোন পদার্থেরই সৃষ্টি হয় নাই। সমুদয় পদার্থের যথা সন্নিবেশ ও তাহাদের সামঞ্জস্য বিধাতার ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। মানবচক্ষে সকল পদার্থের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সহসা অনুভূত হয় না। যাহার অস্তিত্বে বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় ও যাহা দ্বারা মানব উপকৃত হয়, বুদ্ধিজীবি মানব তাহারি সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুমান ও অনুভব করে। সকল পদার্থেই ভগবানের শক্তি বিদ্যমান আছে, যাহাতে সেই শক্তির আধিক্য উপলব্ধি হয়, মানব তাহাকে অসাধারণ বলিয়া গণ্য করে। মানব সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি বশতঃ জীবের মহাকষ্ট উপস্থিত হইলে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ভক্তিমান মহাপুরুষ গণের জন্ম হয়। সেই সকল মহাপুরুষে ঐশী শক্তির আধিক্য বশত, .কেহ অবতার, কেহ দেবতা, কেহ সাধক কেহ বা মুক্ত পুরুষ বলিয়া পূজিত হন। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি হয় সেই খানেই আমার আবির্ভাব হইয়া থাকে। জগতে পাপ পুণ্য উভয়েই বর্ত্তমান আছে, ধর্ম্ম থাকিলেই তাহার গ্লানির সম্ভাবনা, সেই জন্য অবতারের সংখ্যাও অসংখ্য। বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা থাকিলেও তাহার মূলে একেশ্বর বাদিত্ব, ধর্ম্ম কর্ম্মের গূঢ়ত্ব ও সমুদয় কর্ম্ম ব্রাহ্মণগণের অধীন থাকায় অল্প শিক্ষিত অন্য জাতিত্রয় সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্য বেদকে অবলম্বন করিয়া পুরাণোক্ত দেব দেবীর উপাসনা আরম্ভ হয়। পুরাণোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্মে সাধারণের কতক পরিমাণে

স্বাধীনতা থাকিলেও বৈদিক কর্ম্মের বাহুল্য ও সেই কর্ম্ম ব্রাহ্মণগণের হস্তগত থাকায় পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রণালীতেও সাধারণ সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। পরে প্রকৃতির ইচ্ছায় বহু আড়ম্বর যুক্ত, বৈদিক ও পৌরাণিক দীক্ষাকে সংক্ষেপ করিয়া তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচার আরম্ভ হইল। গুরুমন্ত্র জপই একমাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া গৃহীত হইল। ধর্ম্ম রাজ্যে "জপাৎ সিদ্ধি জপাৎ সিদ্ধি" এই বাক্যের জয় পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল। তান্ত্রিক মতাবলম্বী গুরুগণ অনেক স্থলে কষ্ট সাধ্য ও সংসারীর চক্ষে বীভৎস ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধির উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। তন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য অতিক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল। সেই গ্লানি নিবারণের জন্য ভারতের নানাস্থানে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল। নানক, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষ-গণের আবির্ভাব হইল। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়ার বিরোধী। বঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া স্থলে ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র মুক্তির উপায় এই উপদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রকৃতির ইচ্ছায় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হেতু সাধারণ তাঁহার উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তান্ত্রিক ও বৈদিক ক্রিয়া সকল উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ও উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য শূদ্রদিগকে অবলম্বন করিয়া জীবিত রহিল। অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নাম সঙ্কীর্ত্তন ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য মুক্তিদান করে শ্রীচৈতন্য মহা-

প্রভু এই উপদেশ নিজ শিষ্য ও অনুবর্ত্তী শক্তি সম্পন্ন পুরুষদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে সংসার ত্যাগ করিলে ভক্তি ও প্রেম পরিবর্দ্ধিত হয়, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারে, 'কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দম্পতীর ভাব থাকিবে না, তাঁহারা গুরু শিষ্যের ভাবে অবস্থান করিবে। তাঁহার উপদেশ—

"প্রকৃতি হইয়া করে পুরুষের সঙ্গ।
দিনে দিনে বাড়ে তার প্রেমের তরঙ্গ॥
প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি আলিঙ্গন।
রায় বলে আমি তার না দেখি বদন॥"

যে পুরুষ প্রকৃতির বেশ ধারণ করিয়া অর্থাৎ প্রকৃতির মত বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক প্রকৃতি সাজিয়া কামাদি রিপুগণের দমন পূর্ব্বক ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার প্রেমের তরঙ্গ দিনে দিনে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যে পুরুষ বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রকৃতির বেশ ধারণ করিয়া প্রকৃতির সহ দম্পতীর ভাবে.অবস্থান করে রায় বলেন আমি তাহার মুখ দর্শন করি না।

কিন্তু প্রকৃত প্রেম ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে সংসার ত্যাগ না করিলে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ রক্ষা করা কঠিন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশ সাধারণ মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেক স্থলে প্রকৃত বৈরাগ্য অভাবে কামাদির-বশবর্ত্তী হইয়া সংসার পরিত্যাগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশে গ্লানি উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই গ্লানির আতিশয্য নিবারণের প্রয়োজন হইল। ক্রিয়া কলাপ সংযুক্ত বেদ সম্মত তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম মহাক্রম দৃঢ় মুক্তিকার

উপর সংস্থাপিত। বৈদিক ক্রিয়া বর্জ্জিত, শ্রীচৈতন্য ধর্ম্ম রূপ প্রবল পবনে তাহার শাখা প্রশাখা ছিন্ন হইয়াছিল মাত্র, সেই মহা বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড বিচলিত হয় নাই। তাহাকে শাখা প্রশাখা যুক্ত করা অল্পায়াস সাধ্য। কিন্তু ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তনই মহামন্ত্র, মুক্তির সহজ উপায়, এই সহজ পথ হইতে সাধারণকে জটিল বহু আড়ম্বর যুক্ত, ব্রাহ্মণাধীন তান্ত্রিক ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপের পক্ষপাতী করা কঠিন। এ কারণে প্রকৃতির ইচ্ছায় বঙ্গীয় ১১২৭ সালে সাধক কবি মহাত্মা রাম প্রসাদ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তন্ত্রোক্ত মাতৃ ভাবের উপাসনায় নাম ও ধ্যান একমাত্র মুক্তির উপায়, সঙ্গীত উপাসনার অঙ্গ, এই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃত ধর্ম্মপ্লাবিত স্থান সমূহে সুললিত সঙ্গীতে ছড়াইতে লাগিলেন। তিনি গাহিলেন, যে ব্যক্তি মন প্রাণে কালীর নাম ও ধ্যানে সক্ষম তাঁহার তীর্থ পর্য্যটন, ক্রিয়া কলাপ কিছুই নাই। তিনি গাহিলেন,—

"গয়ায় ক'রে পিণ্ডদান, পিতৃ ঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি।"

নূতন ভাবে নূতন সুরে উপাসনার অঙ্গ সঙ্গীত সকল রচনা ও প্রচার করিয়া মাতৃভাবের উপাসনা বিস্তার করিতে লাগিলেন। তিনি মানব চরিত্রের সহিত সঙ্গীত সকলের সামঞ্জস্য রাখিয়া সকল বস্তুতে জগদম্বার অস্তিত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি কলুর চোক ঢাকা বলদ দেখিয়া গাহিলেন,—

"মা আমায় আর ঘুরাবে কত,
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত।"

তিনি ঘুড়ী উড়াইতে দেখিয়া গাহিলেন,—

"মা আমার উড়াচ্ছেন ঘুড়ী সংসার বাজারের মাঝে।"

তিনি জেলেকে জাল ফেলাইতে দেখিয়া গাহিলেন,—

"জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে,
ভবে আমার কি হবে মা।"

তিনি কৃষককে হল চালনা করিতে দেখিয়া গাহিলেন,—

"মন তুমি কৃষি কাজ জাননা,—
এমন মানব জমী রইল পতিত, আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোণা।"

মাতৃভাবের উপাসনার পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল। ধনীর মন্দিরে, গৃহস্থের বৈঠকে, কৃষকের শস্যক্ষেত্রে, নির্দ্ধনের পর্ণশালায়, রাখালের গোষ্ঠে, সংসারের ভাবে ভরা ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ রামপ্রসাদের সঙ্গীত সকল শ্রুত হইতে লাগিল। শিক্ষিত সমাজে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া রামপ্রসাদের বাণী উঠিতে লাগিল। বহুদিন ধরিয়া শ্রীচৈতন্য উপদিষ্ট ধর্ম্মের ও তান্ত্রিক মাতৃভাবের উপাসনার বিরোধ চলিতে লাগিল। উভয় পথের গ্লানি নিবারণের জন্য শাক্ত ও বৈষ্ণব কবিকুল জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ১১৯৯ সালে সাধক কবি রাম প্রসাদ সেন পরলোক গমন করেন। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া সংসার বিরাগী,

সন্ন্যাসীবেশী সাধক কমলাকান্ত বীণা হস্তে বিবিধ তাল মান সংযুক্ত অপূর্ব্ব সঙ্গীত সকলে কেবল ভক্তি ও প্রেম ভরা মাতৃভাবের.উপাসনা মার্গে নৃত্য করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুমধুর কণ্ঠে লোকালয় প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"কালীনাম তীক্ষ্ণ অস্ত্রে মায়ার লাগাম কেটে ফেল।"
"কালীনামে সত্বর হও, নামের গুণে তরে যাবে।"
ত্যজিয়া বসন বিভূতি ভূষণ, মাথায় লও কালী নামের ডালি।"

নবজলধরবরণীর ভুবন মোহিনী রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি গাহিলেন,—

"একি পরমাদ্ভুত পদনখ চন্দ্রে হৃদয় কমল পরকাশে।"

দ্বৈতভাব পরিত্যাগ করিয়া সুমধুর কণ্ঠে চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে লাগিলেন,—

"জাননারে মন, পরম কারণ, শ্যামা ত শুধু মেয়ে নয়,
মেঘের বরণ, করিয়া ধারণ, কখন কখন, পুরুষ হয়।"

লোক বিমোহনে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া মহাপুরুষ সাধক কমলাকান্ত স্থান বিচার, কাল বিচার, অবস্থা বিচার না করিয়া উর্ব্বর ও উদার হৃদয়ে কালীনাম স্থাপন করিতে লাগিলেন। লোক শিক্ষা ও ধর্ম্মস্থাপন তাঁহার জন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য। সেই জন্য মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ছিলেন, তিনি

লোক বিচার, অবস্থা বিচার, না করিয়া সকল লোকের সহিত মিলিত হইবেন।

মহারাজা তেজ-চন্দ্র বাহাদুরের বৰ্দ্ধমান গমনের জন্য রথাদি সজ্জিত হইল। অশ্বযান, নর যান, গো যান সকল গমনার্থ প্রস্তুত হইতেছে। দাস দাসীগণ সজ্জিত হইয়া .ব্যস্ত সহকারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; মহারাজা ইতি পূৰ্ব্বেই সাধককে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য তাঁহার নিকট জনৈক নিজ অমাত্য পাঠাইয়া ছিলেন। সাধক এক্ষণে অম্বিকার সমুদয় শিষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া বিশুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ধনাঢ্য শিষ্যের সহিত বৰ্দ্ধমান গমনোদ্যত মহারাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অমাত্য, ধনাঢ্য ও কৃতবিদ্য প্রজাগণ পরিবৃত মহারাজা বাহাদুর যুবরাজ প্রতাপ চাঁদের সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা পূৰ্ব্বক কহিলেন, "আপনার সঙ্গীত শ্রবণের পূৰ্ব্বে আপনার দর্শন মাত্রেই আমার মন আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কল্য রাত্রে নিদ্রাকর্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে মন হইতে অপসারিত করিতে পারি নাই, মন হইতে স্থানান্তরিত করিতে প্রবৃত্তিও জন্মে নাই। জগদম্বাই জানেন, আপনার মূৰ্ত্তিতে, আপনার বাক্যে, আপনার কণ্ঠস্বরে, কি মোহিনী শক্তি আছে, অদ্যাবধি আমি আপনাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিব, প্রতিদিন আপনার চরণ দর্শন করিয়া সুখী হইব, প্রার্থনা করি,—আপনি আমার বাসনা পূর্ণ করিবেন।" সাধক কহিলেন, "মহারাজ! সারবান বীজ সকল অনভিজ্ঞ কৃষক কর্তৃক উৰ্ব্বর ক্ষেত্রে বিপর্য্যস্ত ভাবে রোপিত হইলেও ক্ষেত্রগুণে ফলবান হয়। আমার কর্কশ

কণ্ঠ উচ্চারিত শক্তিসম্পন্ন কালীনাম বীজ আপনার উদার হৃদয়ে পতিত হইয়া কার্য্যকর হইয়াছে। মহারাজা বাহাদুর পার্শ্ববর্ত্তী বিশুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"এটী কে! সাধক গুড়গ্রামের ডাঙ্গার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলে সমাগত সকলের চক্ষু বিশুর মুখমণ্ডলের দিকে পতিত হইল ও সকলে অতিশয় কৌতূহলের সহিত সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। সাধক কহিলেন,—"বিশুর ভক্তি, বিশ্বাস ও বৈরাগ্য অচল, এখন আত্মগ্লানি দ্বারা ইহার পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষয় হইতেছে।" মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আমি দেখিতেছি, আপনার সঙ্গীতের কি এক মোহিনী শক্তি আছে। এ ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মের বিস্তর সুকৃতি ছিল, সেই জন্য আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে ও আপনার অনুচর হইয়াছে।" মহারাজা বাহাদুরের কথা অবসান হইবামাত্র বিশু গদ গদ কণ্ঠে কহিল, "রাজা বাহাদুর! আমি ডাকাত, আমি খুনেরা, তোমার রাজত্বে বাস করে অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ করেছি, তুমি পাপীদের দণ্ডের কর্ত্তা, আমাকে শাস্তি দাও। মহারাজা বাহাদুর বিশুর কথা শুনিয়া কহিলেন, "বিশু! তুমি স্থির হও, আমি দেখিতেছি,—তোমার গুরুতর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, কৃপাময়ীর কৃপা পাইবার জন্য তোমার ব্যাকুলতা আসিয়াছে। তুমি ভক্তির ভিখারী হইয়াছ,—ভক্তিমান সন্ন্যাসী গুরুতর পাপ করিলেও তাহার শাস্তি দিবার শক্তি রাজার নাই। রাজা যাহার কৃপাদৃষ্টির জন্য লালায়িত, ভক্ত সেই ভগবানের কিঙ্কর।" সাধককে নির্দ্দেশ করিয়া রাজা বাহাদুর কহিলেন, "তুমি এই যে—ব্যক্তির আশ্রয় লইয়াছ,—

ইনিই তোমার পাপক্ষয়ের উপায় বলিয়া দিবেন। তুমি সত্বর দিব্য চক্ষু লাভ করিবে। চক্ষুষ্মান তেজস্বী ব্যক্তি যেমন দর্পের সহিত রাজপথে গমন করে, তেমনি তুমি মোক্ষের পথে অগ্রসর হইবে। অন্ধের ন্যায় আমাদের পদস্খলন হইবে। চারি দিক অন্ধকারময় দেখিয়া আমরা সংসার মধ্যে জটিল পথে ভ্রমণ করিব।” ইহা কহিয়া মহারাজা বাহাদুর অমাত্যগণের সহিত সাধক ও বিশুকে সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন।

বর্দ্ধমান অতি প্রাচীন নগর। এই নগর কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। অনুমান হয়, মুসলমানদিগের রাজত্বের পূর্ব্বে ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ইতিহাসে বর্দ্ধমানের নামোল্লেখ পাওয়া যায়,—মেহর-উন্নেসা নাম্নী পরম রূপবতী তাতার দেশীয়া একটি কুমারী তাহার পিতার সহিত দিল্লিতে আগমন করেন। ঐ কুমারীর পিতা আকবর বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইয়া দিল্লিতে বাস করেন। যুবক জাহাঙ্গীর ঐ কন্যার রূপ মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় নিজ পিতা আকবরের নিকট প্রকাশ করেন। কিন্তু সের আফ্‌গান নামক তাতার দেশীয় এক যুবকের সহিত সেই কুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ তৎপূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। সেই জন্য ন্যায়দর্শী আকবর পুত্রের প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া সের আফ্‌গানের সহিত সেই কুমারীর বিবাহ দিয়া সের আফ্‌গান্‌কে সস্ত্রীক বঙ্গ দেশে পাঠাইয়া দেন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইয়া সের আফ্‌গান্‌কে বর্দ্ধমানে হত্যা

করান। এই মেহের-উন্নেসা জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী হইয়া ছিলেন। এই সের-আফ্‌গানের কবর বর্দ্ধমানে আছে। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে ইতিহাসে বর্দ্ধমানের নাম ও বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে বাঙ্গলার তৎকালিক নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ একদা বর্দ্ধমানের নিকট বর্গীগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বিপন্ন হন। আলিবর্দ্দিখাঁর সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক আলিবর্দ্দিখাঁর বহু অনুনয়েও যুদ্ধে নিরুদ্যম হইলে তিনি বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন। কথিত আছে বর্দ্ধমান রাজার দেওয়ান বাহাদুর ঐ সন্ধির প্রস্তাবে দূতের কার্য্য করিয়া ছিলেন। বর্গীসেনাপতি সেই প্রস্তাবে বিপুল অর্থসহ বর্দ্ধমান রাজের সমুদয় হস্তি উপহার স্বরূপ চাহিয়া ছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ তাহাতে সম্মত না হইয়া বর্দ্ধমানরাজের সাহায্যে হস্তি পৃষ্ঠে অতিকষ্টে পলায়ন পূর্ব্বক কাটোয়ায় আসিয়া নিরাপদ হন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয়, বর্দ্ধমান রাজাদিগের হয় হস্তি বিস্তর ছিল ও তাঁহাদের মুরশিদাবাদ রাজদরবারে সম্মান ও কৃতিত্বও বিস্তর ছিল। ইতিহাসে আরও দেখা যায়, বর্গীগণ মুরশিদাবাদে জগৎশেঠের বাটীর ন্যায় বর্দ্ধমান কোষাগার লুণ্ঠনের চেষ্টা করে। তাহারা পুর প্রবেশ পূর্ব্বক জনৈক রমণীর অঙ্গের অলঙ্কার মোচনের চেষ্টা করিলে বীরাঙ্গনা এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা একটী সেনাপতির প্রাণ বিনাশ করেন। বাণিজ্যাদির সুবিধা বিষয়ে বর্দ্ধমানের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। দিল্লির বাদসাহ সেরশা গঠিত ভারতের এক প্রান্ত

হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অবস্থিত বিপুল বর্ত্ম অনেক নগরকে আলিঙ্গন করিয়া দিল্লি পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। বর্দ্ধমান এই রাজপথ মধ্যে অবস্থিত ও দামোদর নদীর তীরবর্ত্তী; দামোদর ছোট নাগপুরের পর্ব্বত সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। দামোদর বর্ষার সময় অতি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। কখনও ৩।৪ ক্রোশ উভয় কূল প্লাবিত করিয়া অনেক লোকালয় ও জীব কুল গ্রাস পূর্ব্বক ভীষণ বদনে প্রবাহিত হন। সম্প্রতি দামোদরের জল নালী হুগলী জেলার আমতা প্রভৃতি স্থানে অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়াছে। জল প্রবাহ কোন কোন গ্রাম প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়। অত্রস্থ অধিবাসীগণ স্তূপাকার মৃত্তিকার উপর উচ্চ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। বর্ষাকালে আবাস গৃহ দ্বীপের ন্যায় বোধ হয়। এই দামোদর নদী বর্দ্ধমানের পণ্য বহনের সাহায্য করিয়া বর্দ্ধমানের সৌষ্টব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এখন রেল পথ দ্বারা প্রায় সমুদয় পণ্য বহন কার্য্য সম্পন্ন হয়! বর্দ্ধমান রাজবংশও অতি পুরাতন। কোন কোন বৃদ্ধ লোকের মুখে শোনা যায়, বাবুরাম নামক জনৈক ক্ষত্রিয় পঞ্জাব হইতে বাণিজ্য উদ্দেশে বর্দ্ধমানে আসেন। তিনি ক্রমে ধনশালী ও ক্ষমতাপন্ন হন। মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রাজা বীরসিংহের নাম উল্লেখ আছে। বীরসিংহের বংশ লোপ হইলে বাবুরাম রাজোপাধি ধারণ করেন ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হন, ইনিই বর্ত্তমান বর্দ্ধমান রাজবংশের আদি পুরুষ। বর্দ্ধমান রাজবংশের কীর্ত্তি বিস্তর। হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি মহকুমার অনেক বৃহৎ বৃহৎ

জলাশয় ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধমান রাজবংশের অনুকম্পাতেই হইয়াছিল। মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র ও মহারাজা তেজ চন্দ্র বাহাদুরের কীর্ত্তি স্বরূপ ভূম্যাদির দান পত্র তৎপ্রদেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ গৃহে দেখা যায়। মহারাজা মহাতাব্ চন্দ্ বাহাদুরও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ ও সাধক কমলাকান্তের গীতাবলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করান। মহারাজ আপতাব্ চাঁদ বর্দ্ধমানের উন্নতি কল্পে উচ্চ বিদ্যালয়, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে তাঁহার অল্প জীবন কাল মধ্যে সাধারণের প্রিয় হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভূপতি বিজয়চাঁদ বাহাদুর অশেষ গুণালঙ্কৃত, বিদ্বান, কবি, গুণগ্রাহী। তিনি ভারত সম্রাট কর্ত্তৃক বিবিধ রূপে সম্মানিত হইয়া বংশ উজ্জ্বল করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় বর্দ্ধমানে মেডিক্যাল স্কুল ও বিজলীবাতী সংস্থাপিত।

সাধক বর্দ্ধমানে আগমন পূর্ব্বক মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ও তাঁহার ভক্তিমান পুত্র প্রতাপচাঁদ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা বাহাদুর ও যুবরাজ তাহাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করেন ও সময়ে সময়ে তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ ও তাঁহার সহিত সুখালাপে সুখী হন। অম্বিকা কাল্‌নার ন্যায় বর্দ্ধমানেও তিনি কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন সকলের পরিচিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন। সাধক গুণবান, তাঁহার অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই, স্বার্থ নাই, সকলের দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। সাধারণ তাহাকে পিতার ন্যায় গ্রহণ করিল। গুণগ্রাহী লোক তাহার গুণে আকৃষ্ট। ভক্তিমান তাহার ভক্তির

পরাকাষ্ঠার অনুরক্ত। মহারাজা বাহাদুর জানিতেন, ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ, সম্মান, যশ, প্রভৃতি সংসারের রস সকল সংসারীর পক্ষে সরস ও সুখ সেব্য হইলেও মহাত্মাদিগের অন্তরে পাষাণ নিপতিত বারি ধারার ন্যায় নিষ্ফল। ঐশ্বরিক প্রেম ভিন্ন আর কোন বস্তুই তাঁহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। প্রেমাসক্তি ভিন্ন আর কোন আসক্তিই তাঁহাদের মনকে বদ্ধ রাখিতে পারে না। সেই জন্য তিনি সাধককে অধিকাংশ সময় বর্দ্ধমানে রাখিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সাধকের মুখে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভধারিণীর আদেশ আছে, তিনি দেশত্যাগ করিবেন না। তিনি দেশে থাকিয়া জগদম্বার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবেন। রাজা বাহাদুর সাধককে বর্দ্ধমানে রাখিবার এই এক সুন্দর উপায় অবধারণ করিয়া বর্দ্ধমানে কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাধক তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া সত্বর কালীবাড়ী নির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন, অঙ্গীকার করিলেন।

সাধক বিশুকে কহিলেন, "বিশু! মহারাজা বাহাদুর বর্দ্ধমানে মায়ের অভয়-বরদামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। তুমি বর্দ্ধমানের প্রায় সকল স্থানই সম্যকরূপে অবগত আছ, কোন্ স্থানে তোমার অবস্থানের অভিরুচি হয়?" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমি ভাব্ছি, যদি আমার মা কালী মানুষগুলোকে একেবারে সৃষ্টি না কর্ত্তেন, তা হ'লে তার কি ক্ষতি হ'ত। মা আমার এই সব গাছ পালা, পশু, পাখী, নদী, পাহাড়, দিন রাত্, সূর্য্য চন্দ্র

১৭

সৃষ্টি করে, রাজার মত পা হাত ছড়িয়ে বসে থাকতেন, তা হ'লে মাকে আমার কোন জ্বালাই সইতে হত না।"

মা আমার কখন কলি কলি পাতার দিকে চেয়ে থাকতেন, কখন পাখীর স্বর শুনতেন, কখন ফুলের হাঁসি দেখ্‌তেন, কখন চাঁদের আলোতে বসে চাঁদের হাঁসি দেখ্‌তেন। দেখুন,—মানুষের জন্য তাঁকে বড় ঝঞ্ঝাট সইতে হচ্ছে। আপনি সেদিন শুম্ভ নিশুম্ভ, চণ্ড মুণ্ড, আরও কত অসুরের কথা শোনালেন, বলুন দেখি মাকে কত করে তাদের নিপাত কর্ত্তে হয়ে ছিল, তাই আমি ভাব্‌ছি, মানুষ-গুলোকে সৃষ্টি না কল্লেই কোন আপদ থাক্‌তো না। আমি একটা অসুর, আমি মায়ের কাছে দিনরাত কাঁদছি, আমার মত কত লোক আছে, তারাও মায়ের কাছে কাঁদছে। দেখ্‌ছি মানুষের জন্যে মাকে আমার কত কাণ্ডই কর্ত্তে হয়েছে। অসংখ্য মানুষ সবাই তাঁর কাছে নালিশ কচ্ছে, একি কম ঝঞ্ঝটের কথা। তাই ভাব্‌ছি, তাঁর মানুষ সৃষ্টি করাটা ভাল হয় নাই। যেখানে মানুষ, সেই খানেই গোলমাল। দৌড়াদৌড়ি, মারামারি, কাটাকাটী, কান্না, চিৎকার, রোগ শোক, এ কি ব্যাপার ঠাকুর। আমি এমন যায়গা চাই, সেখানে কেউ থাকবে না, থাকবো কেবল আমি, তুমি, আর আমার মা কালী। এই সহরটার দিকে চেয়ে দেখুন, কি কাণ্ড, পয়সার জন্য সব লোকই ব্যস্ত।" ইহা কহিয়া শিশু নীরব হইল। সাধক শিশুর কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "শিশু বিশ্ব জননী তোমার মত চিন্তাশীল মানুষ সৃষ্টি না করিলে তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যে কি কর্ত্তব্য এ বিচার কে করিত। মানুষকে ঘৃণা

করিও না। মানুষ সৃষ্টির সুন্দর, বিচিত্র, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেখ বিশু! একজন গৃহস্বামী আছেন, তাঁহার নিবাস বিশাল অট্টালিকা, বিচিত্র বিবিধ বস্তুতে পরিপূর্ণ। তাঁহার পশুশালা, পক্ষীশালা, কুসুম কানন, আম্র কানন, শস্যক্ষেত্র বিস্তর, কিন্তু তিনি একা। তাঁহার পুত্র, দাস, অনুজীবী কেহই নাই। আচ্ছা বল দেখি? তিনি একা কি ঐ সকল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন ও সম্ভোগ করিয়া সুখী হইতে পারেন। তাঁহার সন্তান, দাসদাসী, অনুজীবিগণ ব্যতীত ঐ সকল সম্পদ বৃথা হয়। জানিবে জগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও অসংখ্য পুত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার দেখ বিশু! যদি সেই গৃহস্বামীর কয়েকটী পুত্র সন্তান থাকে ও তাহাদের মধ্যে কেহ দুষ্ট ও ভক্তিহীন হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই দুষ্ট সন্তানের অনেক উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। সেই দুষ্ট সন্তানকে সুশীল করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। গৃহস্বামীর অন্য সন্তান সুশীল থাকিলে তিনি সেই উপদ্রবের ভিতর শান্তি লাভ করিতে পারেন। বিশু জননী এক হস্তে বরাভয়, অন্য হস্তে অসি ধারণপূর্ব্বক সংসার প্রতিপালন করেন। আরও দেখ বিশু! যদি সেই গৃহস্বামীর কোন সন্তান ভ্রাতার অসৎ কর্ম্মে ও অসৎ বুদ্ধিতে দুঃখিত হইয়া তাহাকে সৎকর্ম্মী ও ভক্তিমান করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে সন্তান গৃহস্বামীর বড় প্রীতিভাজন হয়। আমি বলি, তুমি জনপদে থাকিয়া সৎকর্ম্মে ও সদানুষ্ঠানে তোমার মা কালীর বিপথগত সন্তানগণকে সৎপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি জগদম্বার ভক্ত ও প্রিয় হইবে। মানুষ

জগদম্বার বড় সাধের জিনিস। তুমি তাহাকে ঘৃণা করিও না। জগদম্বার ইচ্ছাতেই মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। দেখ, মানুষ পশুরাজ সিংহের উপর বিচরণ করে, মানুষ মহাবল করী সকলকে দাসত্বে নিয়োগ করে। মানুষ অপার জলধি মার্গে ও অনন্ত আকাশে বিচরণ করে। তুমি নির্জ্জন স্থান প্রয়াসী, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তুমি এই জনপদের নিকটে নির্জ্জন স্থান নির্ব্বাচন কর।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমি মানুষকে ঘৃণা করি না, আমি সকল লোকের অধম। আমি মানুষের উপর কত অত্যাচার করেছি, আমার মানুষের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ হয়।" সাধক কহিলেন, "বিশু! এখন তুমি মানুষের উপকারে জীবন সঙ্কল্প কর, তাহা হইলে তোমার পাপের ক্ষয় হইবে। মানুষের সংশ্রবে না থাকিলে আমাদের মত লোকের যথাসাধ্য মানুষের উপকার করা অসম্ভব।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আপনার ইচ্ছা যা তাই হবে, যেখানে থাক, আমি তোমাকে পেলেই সন্তোষ। যেখানে তুমি, সেই যায়গায় আমার স্বর্গ। আমি এই সহরের সব যায়গাই জানি, তাহার মধ্যে কোটাল হাটই আমার মনোমত। কোটাল হাট রাজবাড়ীর পশ্চিম, অতি নিকট, বাঁকা নদীর ধার, গাছপালা ফল ফুলে ভরা, কোন গোলমাল নাই।" বিশুর নিকট এই কথা শুনিয়া সাধক বিশুর সহিত কোটাল হাট দর্শন করিতে চলিলেন।

বর্ত্তমানের কোটাল হাটও অতি নির্জ্জন স্থান, অল্প সংখ্যক শ্রমজীবী লোকের বাস। সাধকের কালী গৃহের নিকটে কতকগুলি

পশ্চিম দেশীয় মুসলমান বাস করিয়াছে। চারিদিকে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের উদ্যান বাটী। প্রকৃতি দেবী সৌরভে গৌরবে, পত্র পুষ্প ফলে নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক জগদম্বার অপূর্ব্ব রচনার চিত্র খুলিয়া প্রেমানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। অদূরে বাঁকা নদীর তীরবর্ত্তী মহীরুহগণ তরল কোমল পল্লবে আকাশের কোলে উঠিয়া দর্শনীয় হইয়াছে। কালী বাটীর নিকটস্থ মুসলমানগণও কালী বাটীকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহাদিগকে তৎস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "ও বাবা! ও বড় শক্ত যায়গা, পীরের আস্তানা, হাঁটু গেড়ে ছেলাম।"

সাধক বিশুর সহিত কোটাল হাট পরিদর্শন করিয়া সুখী হইলেন। ধীর সমীর সংযুক্ত বাঁকা নদীর তীরে বৃক্ষছায়ায় বসিয়া সহাস্য বদনে বিশুকে কহিলেন, "বিশু! উত্তম স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছ। স্থানটী নীরব, অথচ জনপদের নিকটবর্ত্তী। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের প্রদর্শনী ক্ষেত্র। এই ক্ষুদ্র কেদারবাহিনী বাঁকা নদী এস্থানে জননীর ন্যায় বিদ্যমান থাকিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রচুর রসামৃত সম্প্রদান পূর্ব্বক দেখ কিরূপ হরিৎ বর্ণ, নেত্র তৃপ্তিকর দৃশ্যের আবির্ভাব করিয়াছে। এই বাঁকা নদী বর্দ্ধমান নগরের ১০।১২ ক্রোশ পশ্চিমে নোয়া নামক গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের প্রাঙ্গণ হইতে উৎপন্ন হইয়া নানাবিধ বক্র গতিতে খড়ী নদীর সহিত সম্মিলনে কাটোয়ার নিকট সুরতরঙ্গিনীর আলিঙ্গন লাভ করিয়াছে। ইহা কহিয়া সাধক বর্দ্ধমানে প্রত্যাগমন করিয়া কোটাল হাটে শ্যামা গৃহ নির্ম্মাণের অভিপ্রায় মহারাজা বাহাদুরের নিকট প্রকাশ

করিলেন। রাজা বাহাদুর অমাত্যগণের সহিত স্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক সত্বর কোটাল হাটে একখানি কাঁচা গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। জগদম্বার করাল বদনামূর্ত্তি গৃহ মধ্যে স্থাপিত হইল। দেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, দীন দরিদ্রদিগের ভোজনের জন্য বহু আয়োজন আরম্ভ হইল। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর যুবরাজ প্রতাপ চাঁদ, দেওয়ান বাহাদুর ও অমাত্যগণ দেবীর পার্শ্বে পবিত্র আসনে উপবেশন করিলেন। সাধক দেবীর সম্মুখে উপবেশন করিয়া পূজারম্ভের পূর্ব্বে স্তোত্ররূপে গাহিলেন :—

শঙ্কর উরে বিহরে শ্যামা রঙ্গিণী ।।
সৌদামিনী সহিত, সুধাংশু মিলিত, নীল কাদম্বিনী ॥
(মা আমার) না বাঁধে চিকুর না পরে বাস,
ও বিধু বদনে মধুর হাস,
চিন্তামণি নিলয়ে প্রকাশ,
সশিব শিব নিতম্বিনী।
(তারা) তারণ কারণ চরণ যন্ত্র,
যে জন না জানে সে জন ভ্রান্ত,
নিতান্ত শান্ত করে কৃতান্ত, কমলাকান্ত বন্দিনী॥

পূজারম্ভের পূর্ব্বে সাধক মায়ের অনুপম রূপ নিরীক্ষণ করিয়া বলিতেছেন, "আজ জননীর নব জলধর বর্ণের মধ্যে ব্রহ্মজ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, জ্যোতি রমণীয়, সুধাংশু কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ, মনোমুগ্ধকর। মা আমার তন্ত্রোক্ত চিন্তামণি পুরে

জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়াছেন, মঙ্গলময়ী দিগ্‌বসনা এলোকেশে, সর্ব্বাসক্তি শূন্য হইয়া উদয় হইয়াছেন। মা আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের একমাত্র যন্ত্র। মা আমি এ কথা বলিব না "যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব।" মরণ শঙ্কটেও যেন আমার চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, যাবজ্জীবন তোমাকে দেখিতে পাই।"

সাধক তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে পূজারম্ভ করিলেন। দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হইলে সাধকের অনুরোধে রাজা বাহাদুর অমাত্যবর্গের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্য গৃহের বাহিরে আসিলেন। প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইলে সকলে পুনর্ব্বার গৃহ প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলেন। প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মহারাজা বাহাদুরের অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু তিনি তৎকালে মনোভাব প্রকাশ করিলেন না। পূজা, বলিদান, ব্রাহ্মণাদির ভোজন ক্রিয়া মহানন্দে সমাপ্ত হইলে মহারাজা বাহাদুর অমাত্যবর্গের সহিত প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সাধকের সহিত সুখালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা বাহাদুর কহিলেন, "গুরুদেব! প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। মৃত্তিকা রচিত কল্পিত দেবীর শরীরে রক্তমাংসময় দেহীর মত প্রাণ সঞ্চার কি আপনার উপলব্ধি হয়, না শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কর্ত্তব্য বোধে করিয়া থাকেন। সাধক মৃদুহাস্যে কহিলেন, "মহারাজ! শাস্ত্র অপ্রকৃত, অসম্ভব ও অকর্ত্তব্য বিষয়ের বিধান কর্ত্তা নহেন। সকল বস্তুতেই মহাশক্তির অস্তিত্ব আছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই মহাশক্তির অবস্থান উপলব্ধি করা বহু

পুণ্যের ফল, জন্ম জন্মান্তরের বহু ভাগ্য সাধ্য। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সোহং ভাবের উদয় হইলে মহাশক্তির আবির্ভাব সকল বস্তুতেই প্রতীতি হইয়া থাকে।" শ্রদ্ধাবান মহারাজা সাধকের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "সাধারণ পূজার সকল স্থলে দেবীর আবির্ভাব না হইতে পারে, কিন্তু আপনার মত ভক্তিমান মহাপুরুষের পূজায় দেবীর আবির্ভাব ও পূজা গ্রহণ অসম্ভ। নহে।" প্রবাদ আছে, দেওয়ান বাহাদুর সাধকের বাক্যে সান্দহান হইয়া বলিলেন, "বশিষ্ঠ মুনি সহস্র বৎসর উপাসনা করিয়া ভগবতীর দর্শন পান নাই, তাঁহার প্রতি আকাশবাণী হইয়াছিল, "কালী তারা মহাবিদ্যা।" প্রাণ প্রতিষ্ঠায় দেবীর আবিভাব আকাশ কুসুমমাত্র। শাস্ত্রে অনেক বিষয় আছে, বাক্যেও অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। দেওয়ান বাহাদুরের এই কথা শুনিয়া সাধক কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া কহিলেন, দেওয়ান বাহাদুর। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তি মচিরেণাধিগচ্ছতি॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

শ্রদ্ধাবান ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই জ্ঞান ও পরম শান্তি লাভ করেন, কিন্তু সন্দেহ যুক্ত ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে কোন সুখই প্রাপ্ত হন না। জ্ঞান জ্ঞাতব্য এ জগতে বিশ্বাসই অমূল্য বস্তু।

বিশ্বাস হইতে জ্ঞান জন্মে। এ জগতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থের সহিত অসংখ্য পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের অস্তিত্ব জ্ঞান দ্বারা অনুভব করিতে হয়। নানাবিধ জীব, জন্তু, ভূত, প্রেতাদি আমাদিগের চারি দিকে অবস্থান করিতেছে, সে সকল আমাদিগের দর্শন যোগ্য নহে। ঘোর অন্ধকারে আমরা কোন বস্তুই দেখিতে পাই না, তাহা বলিয়া আমাদের কি সিদ্ধান্ত করা উচিত এ জগতে আমিও অন্ধকার ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই। প্রজ্ঞা চক্ষু ভিন্ন এ জগতকে প্রকৃত ভাবে দর্শন করা যায় না। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও জন্মান্তরের সুকৃতি, সাধনা প্রভৃতি ভিন্ন প্রজ্ঞা চক্ষু লাভ করা অসম্ভব। সাধকের এই কথা শুনিয়া দেওয়ান বাহাদুর কহিলেন, আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমরা কোন কার্য্যের কারণ অবধারণ করিতে না পারিলে অদৃষ্ট ও জন্মান্তরের অবতারণা করিয়া থাকি।

এ জগতের সুখ দুঃখাদি জন্মান্তরের কর্ম্মফল মাত্র, এই অন্ধ বিশ্বাসে আমার বিবেচনায় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। সাধক কহিলেন, "এ জগতের সমুদয় বস্তুই কি বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অনেক বিষয়ের তথ্য অবধারণ করিতে হয়। সেই জন্য মহাশক্তি মানবের মনকে অতীব শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন। দেহ ধ্বংশ হয়, মন কর্ম্মরূপী আবরণ লইয়া দেহান্তরকে অবলম্বন করে। মনের উৎকর্ষ্য লাভে কখন কখন জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার জন্মান্তরের কথাও স্মরণ হয়। দিবসের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবস যত সত্য, এক জন্মের পর পুনর্জ্জন্ম তত সত্য। মহর্ষি চরক সংহিতায় বলিয়াছেন, যাহার মতে

জন্ম নাই, জন্মান্তর নাই, কর্ম্ম নাই, কর্ম্মফল নাই, সে মহাপাপী অপেক্ষাও মহাপাপী, সুবৈদ্য যেন তাহাকে ঔষধ প্রদান না করেন। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ জন্মান্তরের সুকৃতির ফল। রাজা বাহাদুর ভক্তিমান ও বিশ্বাসী, ইঁহার পক্ষে মৃত্তিকা নির্ম্মিত দেহে দেবীর অস্তিত্ব অনুভব করা অসম্ভব নহে। সাধকের এই কথা শুনিয়া রাজা বাহাদুর দেবীর আবির্ভাব অনুভব করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রবাদ আছে, সাধক দেবীর আবির্ভাব প্রদর্শন করাইয়া রাজা বাহাদুরের চিত্ত চাঞ্চল্য দূর করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে দুই প্রকার জনশ্রুতি আছে। প্রথম প্রবাদ এই— দেওয়ান বাহাদুর কহিলেন, "যদি আপনি দেবীর অঙ্গ ক্ষত করিয়া রক্ত দর্শন করাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা প্রাণ প্রতিষ্ঠায় দেবীর আবির্ভাব বিশ্বাস করিতে পারি।" সাধক বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি রক্ত দর্শন করাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে আপনাদের মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, আপনারা নিঃসন্তান হইবেন।" দেওয়ান ও রাজাবাহাদুর উত্তর করিলেন, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে, আপনি আমাদিগকে রক্ত দেখান। সাধক তথাস্তু বলিয়া বিল্ব কণ্টক দ্বারা দেবীর দক্ষিণ [illegible] বিদ্ধ করিয়া রক্ত দর্শন করাইলেন। কেহ কেহ বলেন, "এই জন্য রাজাবাহাদুর ও দেওয়ান উভয়ে নিঃসন্তান হইয়াছিলেন।" এই প্রবাদ সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। সাধক যে ভুবন মোহিনী ধ্যানে সর্ব্বদা বিভোর, যাঁহার চরণ তলে বসিয়া মা মা বলিয়া আত্মজ্ঞান শূন্য হন, জগৎ ভুলিয়া যান, তাঁহার পক্ষে স্বহস্তে দেবীর অঙ্গ ক্ষত করা নিতান্ত

অসম্ভব। সাধক সংসারের দুঃখে সর্ব্বদাই কাতর, বিশেষতঃ তিনি মহারাজা বাহাদুরের আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছেন, যে কর্ম্মে মহারাজা বাহাদুরের মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তাঁহাকে সে কর্ম্মে নিয়োগ করা তাদৃশ মহাত্মার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। মহারাজা বাহাদুর সাধকের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি সাধকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কোন কর্ম্মে অনুরোধ করিবেন না। রাজা বাহাদুর দেবীর অঙ্গ ক্ষত করিয়া রক্ত দর্শন করাইবার অনুরোধ করিলে তিনি নিশ্চয়ই তাদৃশ রাজসঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন। এই সকল কারণে পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয় প্রবাদ এই—দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা, পূজাদি সম্পন্ন হইলে মূর্ত্তিতে দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে রাজা বাহাদুরের সমক্ষে জল্পনা উপস্থিত হয়। সাধক বলেন, দেবীর আবির্ভাব অনুভব করিবার শক্তি থাকিলেই অনুভব করা যায়। সেই শক্তি সম্বন্ধে দেওয়ান বাহাদুর ও সমাগত অনেকের সহিত বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সাধক বলেন, রাজা বাহাদুর বিশ্বাসী, শ্রদ্ধাবান, ভক্তিমান, তাঁহার জন্মান্তরের সুকৃতিও বিস্তর, তাঁহার পক্ষে দেবীর আবির্ভাব অনুভব করা অসম্ভব নহে। রাজা বাহাদুর জানিতেন, সাধকের মুখে কখনও অসত্য বাক্য বাহির হয় না, দেবীর আবির্ভাব উপলব্ধি করিবার আশা তাঁহার বলবতী হইল। রাজা বাহাদুর কহিলেন, "গুরুদেব! আমি সংযম ও সাধনাহীন, কামাত্মা, আমার এরূপ অভিলাষ বাতুলের আকাশ ভ্রমণের ন্যায়, অন্ধের চিত্র দর্শনের ন্যায়, কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকিলে সকলই সম্ভব, আমি

জানি মহাত্মাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। পাপী-তাপীদিগের উদ্ধারই তাঁহাদিগের কীর্ত্তি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যবন হরিদাসকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহাত্মারা ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইহা শুনিয়া সাধক মহারাজার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেবীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা বাহাদুর করযোড়ে নতজানু হইয়া দেবীর পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণ নয়নে দেবীর চরণ-পদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সাধক দেবীর সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন,—

এতদিনে জানিলাম দয়াময়ী কালী গো।
কাতর দেখিয়ে দীনে দরশন দিলি মা ॥
এই মনে ছিল ভয়, অমি অতি দুরাশয়,
অধম দেখিয়ে বুঝি আমারে ত্যজিলে গো ॥
কমলাকান্তের বাণী, হেন মনে অনুমানি,
বুঝি শ্রীনাথের কথা সফল করিলি মা ॥

সঙ্গীত শেষ হইলে সাধক করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তন্ত্রোক্ত দেবীর কর্পূরাদির স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। মহারাজা বাহাদুর করযোড়ে তদবস্থায় সাধকের পার্শ্বে উপবিষ্ট। সুর ও ছন্দ সংযুক্ত স্তোত্র সাধকের মূলাধার হইতে ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইয়া কালী গৃহের প্রাঙ্গণস্থ ব্যক্তিবর্গের শ্রুতি যুগলকে পরিতৃপ্ত ও তাহাদিগকে নিশ্চল ও নীরব করিল। মহারাজা বাহাদুরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। নতজানু, যোড়কর, নিশ্চল নয়নে দেবীর

দিকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার অশ্রুপাত হইতে লাগিল, যেন তিনি কোন্ দেশে কোথায় আসিয়াছেন। কি এক পরমানন্দের স্রোত তাঁহার প্রেম পূর্ণ হৃদয় সাগর হইতে উত্থিত হইতে লাগিল, তিনি আত্মজ্ঞান ও অহঙ্কার শূন্য হইলেন। স্তব পাঠ সমাপ্ত করিয়া সাধক রাজা বাহাদুরকে দেবীর চরণ স্পর্শ করিতে বলিলেন। রাজা বাহাদুর রক্তমাংসময় দেহীগণের পদদ্বয়ের ন্যায়, দেবীর পদ যুগলের কোমলত্ব অনুভব পূর্ব্বক আনন্দে অধীর ও সংজ্ঞাহীন হইয়া দেবীর চরণ তলে পতিত হইলেন। সাধক তাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার জ্ঞান লাভ হইল, তিনি পুনর্ব্বার দেবীর চরণ স্পর্শ করিবার অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসারণ করিলেন। সাধক তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তিনি গদ গদ কণ্ঠে কহিলেন, "আজ আমি আপনার কৃপায় ধন্য হইলাম। আপনার সঙ্গীত শ্রবণের পর হইতেই আমি কি এক আনন্দ অনুভব করিতে ছিলাম। সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য ভোগ অপেক্ষা মুহূর্ত্তকাল এরূপ আনন্দ উপভোগ করা সহস্র গুণে ভাল।" ইহা কহিয়া মহারাজা বাহাদুর যাহা দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন, অমাত্যবর্গের নিকট আনন্দের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই প্রবাদ অনেক বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ লোকের মুখে শোনা যায় এবং ইহাই বিশ্বাস যোগ্য। দেবীর প্রতিষ্ঠা মহাসমারোহে সম্পাদিত হইল। সাধক মহারাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বিশুর সহিত কোটাল হাটে কালী বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অংশ।

সাধক, যুবরাজ প্রতাপচাঁদ, মহারাজ বাহাদুর, বিশু ও তাহার পত্নী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তি যুবরাজ প্রতাপ চাঁদের প্রকৃতি গত ছিল। তিনি সন্ন্যাসী ও সাধু সহবাসে বড় আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি শাস্ত্রালাপে অনেক সময় অতি বাহিত করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মগ্লান, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি রাজ-শক্তিকে অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, মহাত্মাদিগের শক্তি অসীম। এই অসীম শক্তি সম্পন্ন সংসার যন্ত্রে সাধক ও ভক্তিমান লোকই বলবান ও কর্ম্মী। তাঁহারাই অশেষ শুভ দায়ক সুফলের প্রসব করিয়া থাকেন। অহঙ্কারী, অজ্ঞানী ও আত্মজ্ঞান বিহীন ব্যক্তিরা সংসার যন্ত্রে জীবহীন ছবির ন্যায় বিবিধ ভঙ্গীতে ঘূর্ণ্যমান হইয়া থাকে। তাঁহার ধারণা হইল, বিষয় সম্ভোগ ও লোক-সম্মান পরম পথের কণ্টক। তিনি আর বিষয় কর্ম্মে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। যিনি বর্দ্ধমান রাজসংসারের রাজস্ব আদায়ের অষ্টম আইন বিধিবদ্ধ করান, যিনি রাজপুরুষদিগের নিকট বুদ্ধিমান, কর্ম্মী ও ন্যায় দর্শী বলিয়া সম্মানিত হইতেন, যিনি বিচারে প্রজাবর্গের অতিপ্রিয় হইয়াছিলেন, যিনি তাহার অধিকার মধ্যে অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিবামাত্র অত্যাচারের মূলচ্ছেদ করিতেন, সেই প্রতাপ চাঁদ আজ অনেক কর্ম্মে উদাসীন। আত্মার উৎকর্ষ

লাভ করিয়া কি উপায়ে চিরশান্তি লাভ করিবেন, তিনি এখন সেই চিন্তায় ব্যাকুল। বুদ্ধিমান বিশ্বাসী মানব যেমন পরমাত্মীয় ঈশ্বরকে দুঃখের সময়, শোকের সময়, মনের যাতনা জানাইয়া শোক দুঃখের লাঘব করেন, চিত্ত চাঞ্চল্যের সময় তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার চিন্তায় শান্তি পান, প্রতাপচাঁদও সেইরূপ সাধকের নিকট আসিয়া প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলিতেন, প্রাসাদে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ সকল স্মরণ ও তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া শান্তি লাভ করিতেন। একদা যুবরাজ কোটাল হাটে আসিয়া সাধকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শীতকাল, তুষার মণ্ডিত উত্তরায় পবন তীব্র বেগে প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্যরশ্মি ক্ষীণ দীপ্তিতে সুখস্পর্শ ও রমণীয় বোধ হইতেছে, শিশির সিক্ত তরুরাজি শ্রীহীন হইয়াছে, শীত ঋতুর প্রখর কটাক্ষে সঙ্কুচিত, জড়ীভূত ও বিবর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছে। সাধক কালী গৃহের পৃষ্ঠদেশে ও পবনের আবরণ স্থলে, অর্দ্ধ অঙ্গে সূর্য্যরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক আহারান্তে উপবেশন করিয়া বিশুর সহিত বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে সুখী হইতেছেন। রাজপুত্র উপস্থিত হইবামাত্র বিশু আসন প্রদান করিল ও সাধক সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন। প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "গুরুদেব! আমার বেশ প্রতীতি হইয়াছে, এই সকল বিচিত্র-বর্ণ-বস্ত্র-সজ্জিত আজ্ঞাধীন দাসগণ, হস্তী, অশ্ব, অট্টালিকা, রজত, স্বর্ণ, মণি, মুক্তা পূর্ণ কোষাগার অতি অকিঞ্চিৎকর, ক্রন্দন শীল বালককে ভুলাইবার জন্য মাতৃ প্রদত্ত কাষ্ঠ পুত্তলিকা মাত্র। সম্পদ হইতে শান্তি পাওয়া যায় না, এই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ সংসারে সুখী কে? সাধক

কহিলেন, "যুবরাজ আমি তোমাকে দেখিয়া সুখী হইতে পারিতেছি না।" মহারাজা বাহাদুরের মুখে শুনিয়াছি, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগ করনা। কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলায় সর্ব্বলোকের প্রত্যবায় আছে। যদি তুমি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাসাধ্য ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে প্রতিপালন কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে সুখও শান্তি তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। কর্ম্মভূমি এই ভূমণ্ডলে সকল শ্রেণীর লোকেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে, সেই সকল কর্ম্ম যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি সম্পাদন করেন, বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। হংসগণ যেমন জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া আহার অন্বেষণ পূর্ব্বক জলের সহিত আহার গ্রহণ ও জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া রুচির আহার উদরস্থ করে, তেমনি এই সংসার সরোবরে কর্ত্তব্য পরায়ণ মানবগণ নিজ কর্ত্তব্য অনুসন্ধান ও সম্পাদন পূর্ব্বক অতি বাঞ্ছনীয় সুখ ও শান্তির আস্বাদন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ বিষয়ের আলোচনা ও উপার্জ্জন চেষ্টা সংসারীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি তুমি অর্থ উপার্জ্জন ও কাম্য বস্তুর সম্ভোগে বিমুখ হও, সংসারে থাকিয়া তুমি সুখ লাভে বঞ্চিত হইবে। এই স্থলে তোমাকে এক পৌরাণিক ইতিবৃত্তের কথা বলিতেছি শোন। মহাভারত বন পর্ব্বে কথিত আছে, একদা বনবাস পীড়িত রাজা যুধিষ্ঠির পিপাসায় নিতান্ত-কাতর হইয়া অনুজ নকুলকে জল অন্বেষণ করিতে বলিলেন। নকুল নিকটে এক দিব্য সরোবর দেখিয়া তাহার জলপান করিবামাত্র গতাসু হইলেন। জল আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া সহদেব, ভীম,

অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে ঐ সরোবরে গমন ও জলপান করিবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরিশেষে যুধিষ্ঠির তথায় গমন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া নিতান্ত শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে কারণ অনুসন্ধান করিয়া সরোবরে পদার্পণ করিবামাত্র আকাশ বাণী হইল, রাজপুত্র! এই সরোবর আমার রক্ষিত, আমি যক্ষ, আমি নিষেধ করিতেছি, তুমি জল পান করিও না। তোমার ভ্রাতৃগণ আমার বাক্য অবহেলা করিয়া এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, যদি তুমি আমার বাক্যে অবহেলা কর, তোমাকেও তাহাদের অনুগমন করিতে হইবে। তুমি অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তাহার পর জলপান করিও। যদি তোমার উত্তর আমার মনোমত হয়, তুমি জলপান করিতে পারিবে, তোমার ভ্রাতৃগণও জীবন লাভ করিবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আপনি কে?' এবং দেখিলেন, বিরূপাক্ষ সম মহাকায় এক যক্ষ একটা বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন "হে মহাবাহো? আমি যথাসাধ্য আপনার প্রশ্নের উত্তর করিব। আপনি প্রশ্ন করুন। যক্ষ বহুবিধ প্রশ্ন করিয়া সেই সকলের যথার্থ উত্তর পাইয়া সন্তোষের সহিত এই চারিটী প্রশ্ন করিলেন সুখী কে? আশ্চর্য্য কি? পথ কি? বার্ত্তা কি? যুধিষ্ঠির কহিলেন, অঋণী অপ্রবাসী হইয়া যে ব্যক্তি দিবসের পঞ্চম কি ষষ্ঠ ভাগেও শাকান্ন মাত্র ভক্ষণ করে, সেই সুখী। প্রাণীগণের জন্ম ও অকাল মৃত্যু দেখিয়া মানবের চৈতন্য হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য। মহাজন যে পথে গমন করেন, সেই পথ। অনন্ত কালসহ মায়া মোহ জড়িত প্রাণীগণের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনই

বার্ত্তা। যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে জলপান করিতে অনুমতি দিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণকে জীবন দান পূর্ব্বক বকরূপে সরোবর মধ্যে এক পদে দণ্ডায়মান হইলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পুরুষ প্রবর! আপনি কে? বকরূপী ধর্ম্ম উত্তর করিলেন, "তাতঃ! আমি যক্ষ কিম্বা বক নহি, আমি তোমার পিতা, ধর্ম্ম, আমি তোমার দর্শন জন্য এই সরোবরে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে চলিলাম, আমার আশীর্ব্বাদে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে"। ইহা কহিয়া বকরূপী ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলেন। সাধক পুনশ্চ কহিলেন, যুবরাজ সুখী কে? তোমার এই প্রশ্নের উত্তর যাঁহার মুখে কখনও অসত্য বাহির হয় না, সেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দিয়াছেন। তুমি অঋণী, অপ্রবাসী, দাস দাসীগণ পরিবৃত হইয়া যথাসময়ে প্রশস্ত পান ভোজন ভোগ করিতেছ, এ সংসারে তুমিই সুখী। তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণ মহাজন মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুর অনেক অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তোমার পিতা ধার্ম্মিক গুণগ্রাহী, লোকপ্রিয়, তুমি তাহাদিগের পথ অনুসরণ পূর্ব্বক সংসারে যশস্বী হইয়া পরম সুখ ভোগ কর। অর্থ চিন্তায় অবহেলা করিও না। অর্থ অধার্ম্মিকের হস্তে বিষময় ফল উৎপাদন করে, কিন্তু ধার্ম্মিকের হস্তে অর্থ অমৃত স্বরূপ। ধর্ম্ম ও অর্থ উভয় চিন্তাই যথা সময়ে করিবে। বৎস! সংসারীর পক্ষে অর্থশূন্যতা অতিশয় বিড়ম্বনা। যুবরাজ কহিলেন গুরুদেব! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সংসারীর পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু যে ব্যক্তি পরমার্থ প্রার্থনা করেন, যে ব্যক্তি সংসারের দুঃখ জাল হইতে চিরশান্তি লাভের প্রয়াসী, আমার বোধ হয়, তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থা অন্যরূপ।

সংসার সুখভোগে থাকিয়া আত্মার উৎকর্ষ লাভ, চিরশান্তি উপার্জ্জন, জন্মান্তর সাধ্য। মন প্রাণ একেবারে ঈশ্বরে সমর্পণ সম্ভোগ ও বিলাস প্রয়াসী সংসারীর পক্ষে অসম্ভব। সংসারে থাকিয়া মায়া, মোহ, ভোগ, বিলাস একেবারে বর্জ্জন নিতান্ত কঠিন। সেই জন্য প্রথমে তীর্থ পর্য্যটন ও সাধুসঙ্গ, পরে সংসার পরিত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণই উপযুক্ত উপায়। সাধক কহিলেন, "প্রতাপ দেশত্যাগ করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন ও আত্মার উৎকর্ষ লাভের বাসনা নিজ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর-গৃহবাসে সুখের প্রত্যাশার ন্যায় বিফল হয়। স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সংশ্রব ত্যাগের নাম সংসার ত্যাগ, কিন্তু যদি তোমার মনের উপর বল না থাকে, তুমি যেখানে যাইবে যে বেশে থাকিবে, সংসার তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না, বরং ছদ্মবেশী মন লইয়া তুমি বিদেশে বিকৃত বেশে অশেষ ক্লেশে অধিকতর সংসারী হইবে। যদি তুমি সংসারে থাকিয়া মনকে মনের মত করিতে পার, মনকে বিলাইয়া না দিয়া দেহ মধ্যে সচ্চিদানন্দকে সমর্পণ করিতে পার, তবে তোমার দেশ-ত্যাগের, বেশত্যাগের প্রয়োজন? সংসারে থাকিয়া মনকে স্ববশে রাখিবার অনেক উপায় আছে। তোমার মত লোকের দেশত্যাগ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কথিত আছে, একদা রাজর্ষি জনক তাঁহার মহিষীর নিকট সংসার ত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেন। মহিষী কহিলেন, "প্রভো! সংসার ত্যাগে কি পরাধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন? ক্ষুন্নিবৃত্তি হেতু যবমুষ্টির জন্য আপনাকে পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে। ইহা শুনিয়া তিনি বিবেচনা করিয়া সংসার

ত্যাগের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, সংসারে থাকিয়া মহর্ষি জনক মহামুনিঅষ্টাবক্রের নিকট যোগ শিক্ষা দ্বারা অক্ষয় স্বর্গ লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। জগদম্বার অপরাধ ভঞ্জন স্তবে লিখিত আছে, "দারিদস্থ ক ধর্ম্মঃ, কচ ভজন বিবিঃক্বশ্চিতিঃ সাধুসঙ্গে" বৎস। ভিক্ষান্ন ত দ্বারা জীবন ধারণ অতি হীন কর্ম্ম সাধক কবি তুলসীদাস বলিয়াছেন, "মান থাতির ধরম করম সব গেই, যব বল হামারে কুচ দেহ।" ছি ছি যুবরাজ, সংসার পরিত্যাগের বাসনা পরিত্যাগ কর, প্রকৃতিস্থ হও, সর্ব্ব সন্তাপহারিণী, ভবভয়হারিণী সর্ব্ব মঙ্গলাকে হৃদয়ে চিন্তা কর, তোমার সব জ্বালা দূর হইবে। ইহা বলিয়া হাতে তাল দিয়া মৃদুস্বরে গাহিলেন,—

শ্যামা শিব মন মোহিনী।
একবার করুণা নয়নে চাও গো॥
ত্রিতাপে তাপিত তনু হেরিয়ে জুড়াও গো।
কি কায্য ভ্রমণে মাগো, গয়া গঙ্গা কাশী।
যার অন্তরে বিরাজ করেন, ব্রহ্মময়ী এলোকেশী॥
কারে দিলে ইন্দ্রপদ হেম হার মাণ,
কমলাকান্তেরে দাও ওরাঙ্গা চরণ দুখান॥

সঙ্গীত শেষ হইবামাত্র বিশু কহিল, যুবরাজ! তুমি বল্‌ছ মাকে পাবার জন্যে রাজত্ব ছেড়ে যাব, কৌপীন পরবো, ভস্ম মাখ্‌বো, দণ্ড ধরে তীর্থে তীর্থে বেড়াবো, হায় হায়! তা হলে মানুষ মারা বিশে কি কর্ব্বে! বিশের কি ব্যবস্থা হবে। রাজপুত্র! তুমি বল্‌ছ

তোমার আত্মা পাপী, তা হলে আমার আত্মা কি ? তোমার এমন রূপ, যেমন পূর্ণিমার চাঁদ, দেবতার ছেলে। তুমি আকাশের মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য, পুকুরের মাঝে পদ্মফুল, বাগানের মাঝে গোলাপ, পাখীর মধ্যে পায়রা ,ময়ূর, তুমি রূপে গুণে মায়ের ছেলে, কার্ত্তিকের মত, তুমি যদি মায়ের কাছে বসে, কেঁদে কেঁদে তার মুখ পানে চাও, মা তোমার পানে না চেয়ে থাক্‌তে পার্ব্বে না, আমার মত পাপ কিছু কর নাই, ভাবনা কিসের।" বিশুর এই কথা শুনিয়া প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "বিশু ! তাঁহার নিকট কুরূপ সুরূপ নাই, ধনী নির্ধন নাই, দুর্ব্বল সবল নাই, যিনি তাঁর ভক্ত তিনিই তাঁর প্রিয়। আমি দেখিতেছি, রূপবান, ধনবান, বলবান দাম্ভিক অপেক্ষা কুরূপ নির্ধন, দুর্ব্বল, বিনীত ব্যক্তি সহজে তাঁহার কৃপা কটাক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, কারণ শেষোক্ত ব্যক্তিগণ অহঙ্কার শূন্য ও নিষ্পাপ হন ও সহজে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতে পারেন। বিশু কহিল, যুবরাজ আমি নীচ কুলে জন্মেছি, তোমার কিছুমাত্র পাপ নাই, আমি মহাপাপী। আমার নিস্তারের উপায় কিছু দেখি না।" সাধক বিশুর মুখ পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, হায় ! হায় ! "বিশুর জন্য আমি দুঃখিত। ক্ষিপ্ত কুকুর কিম্বা শৃগাল দষ্ট মানব যেমন বিষাক্ত কলেবর হইয়া মৃত্যুকালে কুকুর কিম্বা শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিয়া চিরকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করে, বিশুও তেমনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পাপ পাপ করিয়া প্রাণ বায়ু বহির্গত করিবে। বৃক্ষ তলে দাঁড়াইয়া করতালি দিলে যেমন বৃক্ষ আশ্রিত পাখী সকল সভয়ে পলায়ন করে এবং মাঝে মাঝে বৃক্ষতলে আসিয়া আঘাত করিলে ও

করতালি দিলে পাখী সকল আর সে বৃক্ষে আশ্রয় করে না, সেইরূপ পাপস্মৃতি মনোমধ্যে বসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলে হৃদয় ভরিয়া কালীনাম উচ্চারণে সে স্মৃতি কোন দিকে চলিয়া যায়, কালীনাম কোলাহলে মাতিলে পাপ আর হৃদযকে আশ্রয় করিতে পারে না। একথা আমি বিশুকে অনেকবার বলিয়াছি, কিন্তু বিশু মনকে বশীভূত করিতে পারিতেছে না। আমি বুঝিয়াছি, বিশুর চিত্ত শুদ্ধি হয় নাই। আমি তোমাদিগকে চিত্ত শুদ্ধির উপায় বলিব। সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া চিত্ত চাঞ্চল্য দূর হইলে দেখিবে তোমাদের এক শান্তিভাব আসিবে। তোমরা তোমাদিগের হৃদয়ে ও বাহিরে প্রেম ও আনন্দ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইবে না। আগে মনকে হৃদয়ে রাখিতে শিক্ষা কর, এই বলিয়া আবার মৃদুস্বরে গাহিলেন,—

শিখেছ যতনে যত চাতুরী মন! হয়েছ রিপু আপনার।
ধরেছ ভকত বেশ, না দেখি ভকতি লেশ,
কদাচ কপট রীত গেলনা তোমার ॥
ওরে মন দুরাচার! তুমি হলে কর্ণধার, ডুবাইতে তরণী আমার,
কমলাকান্তের প্রতি কঠিন হয়েছ অতি,
না মজিলে সুধাময় চরণে শ্যামার ॥

সঙ্গীত শেষে সাধক কহিলেন, "প্রতাপচাঁদ তোমার চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তোমার তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় নাই। দীন ভাবে তীর্থ পর্য্যটনের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। তুমি কৃতদার ও

পিতার একমাত্র পুত্র। সংসার পরিত্যাগে তুমি সুখী হইতে পারিবে না। সংসারে থাকিয়া যাহাতে তোমার আত্মার উৎকর্ষ লাভ হয়, তাহার চেষ্টা আমি করিব।” যুবরাজ কহিলেন, “গুরুদেব! বিশুর ন্যায় আমিও আপনার শরণাগত। আমি কখনও আপনার উপদেশ অবহেলা করিব না।” ইহা কহিয়া যুবরাজ মৌনাবলম্বন করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে দিবসপতি জ্যোতিঃ জাল সঙ্কুচিত করিয়া জীবগণের নেত্র পথ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। বসন্ত কালের কুজ্ঝটিকা জালের ন্যায় অন্ধকার দ্বিগুণ, আকাশ মণ্ডল আবরণ করিয়া অবনীর উপর পড়িতেছে। বিহঙ্গমগণ তরুবর শিরে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যা বন্দনছলে মানবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। যুবরাজ প্রতাপচাঁদ সাধকের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন।

দিন আসিতেছে, দিন যাইতেছে, জীবন কালের একদিন চলিয়া গেল। আজ পরকালের সম্বল কিছু হইল না, একথা বোধ হয়, অতি অল্প লোকেই ভাবিয়া থাকেন। সংসার চক্রে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণ্যমান জীব সমূহ কালকে উপেক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু মোক্ষ প্রয়াসী মহাত্মারা মুহূর্ত্ত কালও অপব্যয় করেন না। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে ভগবৎ চিন্তা করিয়া সংসারের সৎকর্ম্মে ব্রতী হন। মহাত্মা কমলাকান্ত বর্দ্ধমানে আসিয়া, রাজভোগে জীবন অতিবাহিত করেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লোক শিক্ষা তাঁহার জন্ম-গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য! তিনি বর্দ্ধমানে আসিবার পূর্ব্বে মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরকে বলিয়া ছিলেন, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্দ্ধমানে

অবস্থান করিবেন। সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিলিত হইবেন। এখন তিনি মধ্যে মধ্যে অম্বিকায় গমন করেন কখনও বা চান্নার যাইয়া দেবী বিশালাক্ষীর চরণ দর্শন করিয়া সুখী হন। প্রতিবৎসর শ্যামা পূজার পর অমরার গড়ে তাঁহার অনুগত কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে গমন পূর্ব্বক তৎস্থানীয় লোকদিগকে সুখী করেন। ভক্ত ও অনুগত ব্যক্তিগণ যেরূপ অবস্থাপন্নই হউন, তিনি তাঁহাদের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের বাটীতে আগমন পূর্ব্বক তত্ত্ব কথায় সকলকে ভক্তিরসে সিক্ত করিতেন। বর্দ্ধমানে থাকিতে সময় ক্রমে রাজ-দরবারে যাইতেন, মনোহর সঙ্গীত দ্বারা সমাগত লোকদিগকে বিমুগ্ধ করিতেন। কথিত আছে, সাধক একদা পীড়িত থাকায় রাজ সভায় যাইতে পারেন নাই। মহারাজা বাহাদুর তাঁহার সহিত কোটাল হাটে সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। রাজা বাহাদুরের ধারণা হইল, তাঁহার গুরুদেব মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ মধ্যে অবস্থান করেন, সেই জন্যই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে সময় সংক্ষেপ হেতু রাজাবাহাদুর কোটাল-হাটের কালী বাড়ী ও সাধকের বাসগৃহ ইষ্টক নির্ম্মিত করাইতে পারেন নাই। এখন তিনি দেবীর মন্দির ও সাধকের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইবার সঙ্কল্প করিয়া কোটাল হাটে গমন করিলেন। রাজা বাহাদুর গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সাধক যোগমায়ার সম্মুখে কুশাসনে উপবেশন করিয়া জপ করিতেছেন। সাধকের সম্মুখে একটী সছিদ্র কোশা, তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া

মৃত্তিকা আর্দ্র করিতেছে। বিশু গৃহের একপ্রান্তে উপবিষ্ট। গৃহমধ্যে অন্য কোন বস্তু নাই। পরম বস্তু জগদম্বার প্রতিমূর্ত্তি। গৃহের একপ্রান্তে জলপূর্ণ একটী কাষ্ঠের কমণ্ডলু, আর একখানি কুশাসন, অন্য প্রান্তে মৃগচর্ম্ম ও কম্বল শয্যা। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র বিশু সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা বাহাদুরের উপবেশন জন্য আসন প্রদান করিল। মহারাজা বাহাদুর নতজানু হইয়া করযোড়ে দেবীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক পিপাসু ভ্রমরের ন্যায় চরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাধকের জপ সমাপ্ত হইলে রাজা বাহাদুর সাধককে প্রণিপাত পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, শুনিলাম আপনার শরীর অস্বচ্ছন্দ আছে। আপনি এখন কিরূপ অনুভব করিতেছেন। সাধক কহিলেন, "মহারাজ। গত দুই দিবস সামান্য জ্বর অনুভব হইয়াছিল। লক্ষ্মণ দাদা আজ সুস্থ বোধ করিতেছি।" মহারাজ বাহাদুর কহিলেন, আমার বোধ হয়, এই মৃত্তিকাময় গৃহমধ্যে শয়ন জন্যই আপনার শারীরিক পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকিবে, আপনি এ স্থানের কি অভাব দেখিতেছেন!" সাধক কহিলেন, "মহারাজ। আমি কম্বল ও মৃগচর্ম্মের উপর শয়ন করি, এ গৃহও তাদৃশ শীতল নহে, আপনি যাহা আশঙ্কা করিতেছেন, আমার বোধ হয় তজ্জন্য আমার শরীর অসুস্থ হয় নাই। আপনি আশ্রমের অভাব জানিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু আমি অভাব কিছু দেখিতেছি না। পূর্ণানন্দময়ী হাস্যমুখে আশ্রম মাঝে বিরাজ

করিতেছেন। ওই দেখুন! আশ্রম মধ্যে জবাকুসুম সকল মায়ের চরণ-পদ্মের জ্যোতিতে আশ্রম প্রাঙ্গণ উজ্জ্বল করিয়াছে। স্থল পদ্ম সকল নতমুখে প্রফুল্লবদনে মায়ের ধ্যানে রত। দেখুন! মল্লিকা দল আশ্রম গগনে নক্ষত্র মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। মহারাজ! বিল্বদলের কোমল কান্তি অবলোকন করুন, নব জলধর-বর্ণে নয়ন আকর্ষণ করিতেছে। আশ্রম বাহিরে বিটপী সকলও বিবিধ ফল পুষ্পে পরিপূর্ণ। বিহঙ্গমগণও হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ, তাহারা সকল সময়ে বিশেষতঃ সকাল সন্ধ্যায় কলধ্বনিতে কালী কালী বলিয়া কোটাল হাটকে কৈলাস সদৃশ রমণীয় করিয়া তোলে। আমি আশ্রমের কোন অভাব দেখিতেছিনা। যেখানে সদানন্দময়ী বিরাজ করেন, সেখানে কিসের অভাব, কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য! এই বলিয়া মৃদুমধুর হাস্য করিয়া গাহিলেন,—

"কিছু নাই সংসারের মাঝে শ্যামা মা মোর সার রে।
মন কালী ধন কালী আমার, প্রাণ কালী আমার রে।"

যিনি জগদম্বার নিতান্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার কোন দুঃখ, কোন অভাব থাকা সম্ভব নহে, তিনি রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও সুখী এই ভাবিয়া পুনশ্চ গাহিলেন,—।

কেহ সংসারে এসেছে, বড় সুখে আছে,
পেয়েছে রাজ্য ভার রে।
আমার গরীবের ধন, ওরাঙ্গা চরণ,
গলায় করিছি হার রে।

নিজের শারীরিক অসুখের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

এতনু ধারণে, এতিন ভুবনে,
যাতনা নাহিক কার রে।
কিন্তু হেরিলে এমুখ, দূরে যায় দুখ,
এই গুণ শ্যামা মার রে।

কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত, আসিতেছে বাবে বার রে।
এবার অভয় চরণ, করেছে শরণ,
অনায়াসে হবে পার রে॥

সঙ্গীত শেষে সাধক কহিলেন, "আমি আমার ও আপনার কালী বাটীর কোন অভাব দেখিতেছিনা। রাজা বাহাদুর কহিলেন, "আজ কয়েক দিন আপনার মধুময় কণ্ঠস্বর ও অমৃত তুল্য বাক্য শ্রবণ না করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি সুস্থ হইয়াছেন, দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। গুরুদেব! সত্বর দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হেতু এই গৃহ মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে দেবীর মন্দির, রন্ধন গৃহ, আপনার বাসগৃহ ইষ্টক নির্ম্মিত, প্রাঙ্গণ বিস্তৃত ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত করাইবার বাসনা করিয়াছি।" সাধক কহিলেন, "রাজা বাহাদুর! মা আমার বিবসনা, অলঙ্কার দেখুন, গলে নরশির হার, মুক্ত কেশ, মায়ের বাহন শবশিব, মা আমার শ্মশান বাসিনী,. এমন মায়ের মণি কোটার কি প্রয়োজন।" একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "মা রাজার ঘরে আসিয়াছেন, চারি দিকে অট্টালিকা, মণি কাঞ্চন দেখিয়া বোধ হয়, বেশভূষা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, রাজার ঘরে থাকিয়া রাজার মা হইবার ইচ্ছা হইয়াছে, নচেৎ আপনার এরূপ

ইচ্ছা হইবে কেন? দেবীর কৃপায় আপনার পুণ্যফলে আশ্রমের কোন অভাব নাই।" রাজা বাহাদুর কহিলেন, "সংসারী লোক দেব দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও সেবাদির যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেন। মণিমুক্তাদিদ্বারা দেব দেবী অঙ্গ সজ্জিত করিয়া চক্ষুর তৃপ্তি লাভ করেন। সংসারী লোক যে বস্তুর প্রিয়, সেই বস্তুই আপন উপাস্য দেবতাকে প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাও ভালবাসার লক্ষণ। আপনি সন্ন্যাসী, আপনার দেবীও তদনুরূপ ভূষণ প্রিয়া হওয়া সম্ভব। গুরুদেব। আপনি ফল পুষ্পাদি প্রিয়, সেই জন্যই দেবীকে ফল পুষ্পাদি প্রদান দ্বারা সুখী হন।" সাধক কহিলেন' "মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন, "তাহা সত্য। মানুষ যে সকল বস্তুর প্রিয়, সেই সকল বস্তু নিজ উপাস্য দেবতাকে নিবেদন করিয়া সুখী হয়। নিজ শরীর ও মন অপেক্ষা মানুষের অন্য কোন বস্তুই অধিকতর প্রিয় হইতে পারে না। শরীর ও মনের নিতান্ত সমর্পণেই উপাস্য দেবতা সন্তুষ্ট হন। নিজ শরীর ও মন ব্যতীত অন্য বস্তুর সমর্পণে তাঁহার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা দেখান হয় না." সাধকের এই কথা শুনিয়া মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা সত্য, তিনি ভাবগ্রাহী, মানুষের বদান্যতার প্রার্থী নন। বাস্তবিকই মানুষ ভ্রম বশত মণি মুক্তাদি সম্প্রদান দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করে। আমি পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি, আমি আপনার ইচ্ছার বশবর্ত্তী থাকিব। কোটাল হাটের কালী বাড়ীর বর্ত্তমান অবস্থা বিদ্যমান থাকা যদি আপনার

অভিপ্রেত হয়, তাহাই হইবে।” সাধক কহিলেন, “যদি আমি অট্টালিকা বাস ও ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করি, মণি মুক্তাদি দ্বারা দেবীর অঙ্গ ভূষিত করিয়া সুখী হই, এই সকলের প্রতিক্রমে আমার আসক্তি জন্মিতে পারে, অতএব এ বাসনা পরিত্যাগ করুন। আপনি আমার অভাব বিমোচনের বাসনা করিয়া আগমন করিয়াছেন, আপনাব অভাব দূর করিবার সঙ্কল্প সার্থক হউক। আমি একটী বস্তুব অভাব অনুভব করিতেছি, আপনি সেই অভাব দূর করিয়া সুখী হ’ন!” রাজা বাহাদুর আগ্রহের সহিত কহিলেন, “অনুমতি করুন, আপনার কি অভাব, যদি সে অভাব বিমোচনের আমার শক্তি থাকে, আমি আপনার অভাব দূর কবিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।” সাধক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “আমার অভাব মোচন আপনার সাধ্যায়ত্ত নহে, আমি একখানি কোশার অভাব অনুভব করিতেছি, এই কোশা খানিতে জল পড়িতেছে, এই কোশাখানি সারাইয়া দিবেন।” সাধকের এই কথা শুনিয়া রাজা বাহাদুব সহাস্যে কহিলেন, “আমার গুরুদেবের এ অভাবনীয় অভাব, এ অভাব মোচন করা আমার ক্ষমতা-সাধ্য হইবে কি? হায়! হায়! আপনি এরূপ ত্যাগ শীল, বাসনা শূন্য না হইলে কি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন, সর্ব্ব লোকের প্রিয় হইতে পারেন, জগদম্বার বরপুত্র হইতে পারেন!” এই বলিয়া রাজা বাহাদুর সাধকের সম্মুখ হইতে কোশা খানি নিজ হস্তে লইয়া কহিলেন এই কোশা খানি সারাইয়া দিব, এই কোশাখানির অনুরূপ এক খানি নূতন

কোথাও পাঠাইব, বোধ হয়, তাহাতে আপনার কিছু আপত্তি নাই।"

সাধক কহিলেন, "মহারাজ! আপত্তি কিছুই নাই, পুরাতনকে কেহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না, ইহাই আসক্তি। এ সংসারে একেবারে আসক্তি শূন্য হওয়া বড়ই কঠিন।" মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "গুরুদেব! প্রতাপের মানসিক উদ্বেগ দেখিয়া আমাকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে। প্রতাপ পূর্ব্বের ন্যায় বিষয় কর্ম্মে মনোযোগ করেন না, সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকেন। প্রতাপ আমার একমাত্র পুত্র। আমার সংসারের শ্রেয় ও শান্তি তাঁহার কর্ম্ম কুশলতা ও বিষয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে সাধক মহারাজের বাক্য শ্রবণান্তর কহিলেন, "আমিও প্রতাপ চাঁদের মানসিক চাঞ্চল্য পরিদর্শন করিয়াছি। সংসার পরিত্যাগের বাসনা প্রতাপচাঁদ আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। যাহার বৈরাগ্যের উদয় হয়, তিনি কখনও নিজ অভিপ্রায় অন্যের নিকট প্রকাশ করেন না। তিনি প্রেমানন্দে, হাস্য বদনে, কোন দিকে না চাহিয়া কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া পরম পুরুষের উদ্দেশে সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আমার বিশ্বাস প্রতাপের প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই। তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য ও ধর্ম্ম বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে মাত্র। কাহারও ধর্ম্ম বুদ্ধি ও ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রতিবন্ধক না হইয়া সাহায্যকারী হওয়া উচিত। প্রতাপ ভক্তিমান ও বিশ্বাসী। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়াছি, সংসারে থাকিয়া মোক্ষলাভ হইতে পারে। জনকাদি ঋষিগণ সংসারে থাকিয়া জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। আমি প্রতাপচাঁদের আত্মার

বিশুদ্ধতা লাভ বিষয়ে চেষ্টা করিব। যথাসাধ্য তাঁহাকে ধর্ম্ম ও অর্থচিন্তায় নিবিষ্ট রাখিব। প্রাণায়াম আদি রাজ-যোগ দ্বারা তাঁহার চিত্ত শুদ্ধির উপায় অবলম্বন করিব। প্রতাপ আমার জীবদ্দশায় সংসার পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা আমার বিশ্বাস। মহারাজ! সকলেই আপন আপন অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। পুরুষকার অদৃষ্টের অনুগামী। অদৃষ্ট মানবের চক্ষে সমীরণের ন্যায়, অনুমান দ্বারা অদৃষ্টের ভাবী ক্রিয়ার উপলব্ধি করিতে হয়। প্রতাপচাঁদের বাক্যে, কার্য্য কলাপ চিন্তা প্রভৃতি দ্বারা আমার অনুমান হয় তাঁহার বৈরাগ্য স্থায়ী ও কার্য্যকর হইবে না।" সাধকের মুখে এই কথা শুনিয়া মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আপনার বাক্য বেদ ও বসুমতীর ন্যায় সত্য, যুবরাজ আপনার উপদেশে শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইবেন।" বিশু কহিল, "মহারাজ, আমি যুবরাজকে বলেছি, আমাদের এই ঠাকুর প্রেমের সাগর। যুবরাজ তুমি জলের তৃষ্ণায় সাগর ছেড়ে কোথায় নদী খুঁজে বেড়াতে যাবে। তোমার ঘরে মাণিক জ্বল্‌ছে, তুমি মাণিকের চেষ্টায় দেশে দেশে বেড়িয়ে সাপের মাথায় মাণিক খুঁজে বেড়াবে! যুবরাজ আমাকে বলেন, "বিশু! তোমার কথা ঠিক। তোমার মনটী আমাকে দিতে পার। আমি আমার মনকে সোঝা কর্ত্তে পাচ্ছিনা। যাহক যুবরাজের শীঘ্র মনের গোলমাল যাবে। বর্দ্ধমান ছেড়ে যুবরাজ কোথাও যাবে না।" মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আমারও বিশ্বাস তাই।"

এইরূপ কথপোকথন হইতেছে, এমন সময় কালী বাটীর প্রবেশ

দ্বারে একটী বালকের ক্রন্দন শব্দ শ্রুত হইল। জনৈক দ্বার রক্ষক মহারাজা বাহাদুর ও সাধকের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল, "একটী স্ত্রীলোক একটী বালককে সঙ্গে লইয়া আপনাদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিলাম, স্ত্রীলোকটী এই বিশু বাবার পত্নী ও বালকটী তাঁহার পুত্র।" এই কথা শুনিবামাত্র বিশু মুখ, চক্ষু ও নাসিকা বিকৃত করিয়া ঘৃণিত বস্তুর দর্শনের ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক মস্তক অবনত করিল ও পরক্ষণেই মুখ উত্তোলন পূর্ব্বক দ্বার রক্ষককে কহিল, "যাও স্ত্রীলোকটীকে বল বিশুর পরিবার নাই, পুত্র নাই, বিশুর কেবল আছে মা কালী, আর এই ঠাকুর। বিশু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায় না।" ইহা শুনিয়া সাধক বিশুর পানে চাহিয়া মৃদু হাস্যে কহিলেন, "বিশু! তুমি তোমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না চাহিতে পার, কিন্তু তোমার পত্নী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়, এখন তোমার বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবরণ পূর্ব্বক গৃহের ঐ কোণে বসিয়া থাকা ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতেছি না।" মহারাজ বাহাদুর সহাস্য বদনে সাধকের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দ্বারবানকে কহিলেন, "বিশুর পত্নীকে এখানে লইয়া আইস।" বিশুর পত্নী শ্যামা গৃহের প্রাঙ্গণ দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সাধক তাহাকে তাঁহাদের অদূরে আহ্বান করিয়া প্রাঙ্গণে বসিতে আদেশ করিলেন ও ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিলেন। বিশু নিজ মুখ মণ্ডলের আবরণ ছলে দক্ষিণ হস্ত মস্তক পর্য্যন্ত উত্তোলন পূর্ব্বক দেবীর পাদ পদ্মের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া

রহিল, পত্নী বা পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিল না, রাজা বাহাদুর বিশুর পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মা! তোমার স্বামীর বৈরাগ্য হইয়াছে, এখন তাহার পুত্র, পরিবার সংসার কিছুই মনে স্থান পাইতেছে না, যিনি এই সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তোমাকে আমাকে সকল জীব জন্তুকে প্রতিপালন করিতেছেন, যাঁহার দয়া হইলে মানুষ স্বর্গে যায়, বার বার জন্মিতে মরিতে হয় না, কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, তোমার স্বামী তোমাদিগকে ছাড়িয়া সেই মা কালীর শরণ লইয়াছে।" ইহা শুনিয়া বিশুর পত্নী গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "বাবা! তুমি দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা, লোক তোমার কাছে বিচার চায়, আমার স্বামী এই সব ছোট ছোট ছেলেদিগকে ফেলে চলে এসেছে, আমি এসব কি করে মানুষ করবো, যদি আমার স্বামীর এ রকম মনে ছিল, তা হলে বিয়ে করেছিল কেন। আমাকে কাঁদালে কি ভাল হবে! না মা কালীর দয়া হবে।" রাজা বাহাদুর কহিলেন, "বিশু শুনিতেছ, তোমার পত্নী কি বলিতেছে, তুমি তাহার কথায় উত্তর দাও।" ইহা শুনিয়া বিশু জগদম্বার মুখ পানে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "মা নিস্তারিণি! যে দিন ডাকাতী করে কিছু না পেতাম, ভয়ে ভয়ে কুকুর বেড়ালের মত পাটী পাটী করে ঘরে ঢুকতে হত। চুপ করে জড় সড় হয়ে মুখ চুপ করে বসলে আমার পত্নী বুঝতো আমি সেদিন কিছু পাই নাই। সেই রাক্ষসী একমুঠো ভাত কি এক ঘটী জলও দিত না, বলতো সারা রাত মাতাল শালে পড়ে থেকে ভোর রেতে জ্বালাতে এসেছে। যে দিন ডাকাতী করে

গহনা এনে দিতাম, সে দিন কত আহ্লাদ করে গহনা পরে এ ধার ও ধার করে বেড়াত, রাত তিন প্রহরে কখন বা রাত্ত ভোরে আলো জেলে ঘরে যা থাকতো খেতে দিত, খাবার জন্যে কত জিদ কর্ত্তো বল্‌তো মদ খেয়ে গেছ, কত কুস্তি কর্ত্তে হয়েছে, খাও। জগদম্বা! আব না, নিস্তার কর, তোমার নাম, ঠাকুরের কথা ছাড়া যেন আমি আর কিছু শুনতে না পাই।" বিশুর কথা শেষ হইবামাত্র রাজা বাহাদুব বিশুর পত্নীকে কহিলেন, "মা তোমার স্বামীর কথা, শুন্‌লে, স্ত্রীর কর্ত্তব্য তাহাব স্বামীর ধর্ম্মে কর্ম্মে সাহায্য করা, স্বামী কুকাজ করিলে তাহাকে নিষেধ করা, তুমি তাহা কর নাই, বরং তাহার পাপেব কাজে সাহায্য করিয়াছ, সেই জন্য তোমাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। বিশুর মনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে বোধ হয়, সে আব সংসারী হইবে না। শাস্ত্রে বলে পত্নী স্বামীব পুণ্যেব ভাগ পায়। তোমাব স্বামী পুণ্য করিতেছে, তুমি পুণ্যের ভাগ পাইবে।" সাধক কহিলেন, "বিশু! তোমাকে অনেক বার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, তোমাব পত্নী পুত্র, বর্ত্তমান আছে, তুমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিবে না। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি গৃহে গমন কর। তুমি সৎকর্ম্মে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক ইহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া সুখী হও, তোমার মা কালীর চরণে মন প্রাণ রাখিয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। বিশু সাধকের বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া সাধকের পদতলে পতিত হইল! বিশু কহিল, "ঠাকুর!

আমি তোমাকে ছেড়ে কোথা শান্তি পাব! উহাদের কথা দিন রেতের মধ্যে আমার একবারও মনে হয় না। আমি দেখ্‌ছি, আমি রাক্ষস ছিলাম, রাক্ষসীর সঙ্গে মানুষ খেয়ে বেড়াতাম। আমি কি এক যায়গায় এসেছি, যেখানে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই। একি আনন্দ ঠাকুর। এ আনন্দ পেলে রাজার ছেলে রাজত্ব চায় না। আমি কোন মতে এখান হতে যাব না। যদি রাজা বাহাদুরকে বলে তুমি জোর করে আমাকে তাড়িয়ে দাও আমি জানি তা তুমি কখনও কর্ব্বে না, তুমি দয়াল ঠাকুর। আমি চির কালের পাপী যদি আমার ভাগ্যে তাই ঘটে, তা হলে আমি বাঁকা নদীর ধারে, গাছ তলায় পড়ে থাকবো, দিনরাত ঠাকুর! ঠাকুর! বলে ডাকবো, তোমাকে দেখা দিতেই হবে, যদি দেখা না দাও, আমি ঠাকুর ঠাকুর বলে বাঁকা নদীর জলে ঝাঁপ দেব।" বিশুর কথা শুনিয়া ঠাকুর কি বলিবেন, তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগিল। রাজা বাহাদুর বিশুর পত্নীকে বলিলেন, "মা! তুমি তোমার স্বামীর কথা শুনিলে। তুমি স্বামীর আশা পরিত্যাগ কর। আমি তোমার অন্ন বস্ত্রের অভাব মোচন করিতে পারি।" ইহা কহিয়া রাজা বাহাদুর কয়েকটা গোপ্য মুদ্রা বিশুর পত্নীর হস্তে দিয়া কহিলেন, "রাজ সংসার হইতে তোমাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা হইবে।" বিশুর পত্নী মুদ্রা গ্রহণ করিল। তাহার নয়নে আনন্দ বারি দৃষ্ট হইল। সে রাজা বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সাধককে কহিল, "বাবা! আমার স্বামীর যে

দশা আমারও সেই দশা, আমি ঘরে যেয়ে কি কর্ব্বো! আমি তোমার কালী বাড়ীর ধুলো গুঁড়ো মুক্ত কর্ব্বো, মা কালীর চরণ দর্শন করে এখানেই পড়ে থাকবো।" বিশু পত্নীর কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ঠাকুর সর্ব্বনাশ হল, স্বীকার হবেন না, মতলব খারাপ, ঘটী বাটী চাল চিঁড়ের বোঝা মাথায় করে শ্রীক্ষেত্র যাওয়া হয় না। আমাদের কাজের বিঘ্ন হবে।" রাজা বাহাদুর বিশুর পত্নীকে কহিলেন, "ইঁহারা সন্ন্যাসী, নির্জ্জনে সাধনা ইঁহাদের কাজ, তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, তুমি নিজ ঘরে যাও।" ইহা কহিয়া তিনি বিশুর পত্নীকে বিদায় দিলেন। বিশুর পত্নী দেবী, সাধক ও রাজা বাহাদুরকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। সাধক বিশুকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, "বিশু এ সংসারে উপদ্রব অনেক, তুমি পত্নীর সঙ্গ অভিলাষ করনা সত্য, আমি কাহারও গুরু হইতে চাহি না, সত্য কিন্তু জগদম্বার কি ইচ্ছা জানি না, দেখ ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় কি এক ব্যাপার ঘটাইয়া রঙ্গিণী তোমাকে আমার নিতান্ত শরণাপন্ন, করিয়া সঙ্গে দিলেন, যদি তোমার পত্নী মধ্যে মাঝে এখানে আইসে তাহাতে ক্ষতি কি! মানুষ জগদম্বার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী! ইহা কহিয়া বিশুর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে গাহিলেন,—

কেন চঞ্চল হইলে মন! অকারণ।
হবে পূর্ণ আশা, দুঃখ নাশা,
ভাব মায়ের শ্রীচরণ॥
অপার শঙ্কটে, কতবার পড়েছ বটে,

যখন বিপদ ঘটে, কালী কবে নিবারণ।
কমলা কান্তেব মন, সদা থাক সচেতন,
তুমি জ্ঞানহীন, বুদ্ধি তোমার সাধাবণ ॥

সঙ্গীত শেষে সাধক কহিলেন, "চাঞ্চল্যই মানুষেব দুঃখ। আমরা বেশ বুঝিতেছি উপদ্রব ব্যতীত এ সংসাবেব অস্তিত্ব অসম্ভব। উপদ্রবকে উপেক্ষা করিতে হইবে। সেই উপদ্রবকে উপেক্ষা কবিবাব একমাত্র ঔষধি জ্ঞান। জ্ঞানদাত্রী আমাব জ্ঞানময়ী। কৃষ্ণবর্ণেব কাচ খণ্ডদ্বাবা দর্শনেন্দ্রিয়, দুর্গন্ধময় বস্ত্র খণ্ড দ্বাবা ঘ্রাণেন্দ্রিয় আববণ কবিয়া যেমন কুসুম কাননে প্রবেশ ও ভ্রমণ করিলে কাননেব সৌন্দয্য ও মাধুর্য্য অনুভব কবা যায় না, তেমনি সংসাবে উপদ্রব ও অশান্তিকে উপেক্ষা না কবিলে শান্তি সুখ ভোগ করা যায় না।" বাজা বাহাদুব কহিলেন, "কালের নিয়মে সময়ে সময়ে মহাত্মাদিগেরও জীবনপটে কত অকল্পিত ঘটনা সজ্ঘটিত হইয়া তাঁহাদের নয়নে নূতন দৃশ্য খুলিয়া দেয়, কিন্তু সে সকল তাঁহাদের প্রজ্ঞা চক্ষুকে প্রতাবণা কবিতেপাবে না। তাঁহারা সেই সকল বিপদ ও দুঃখের ছবি হৃদয়স্থ নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে দর্শন করাইয়া হাস্যমুখে অবস্থান করেন। বিশু তুমি তাহাই কর।" এইরূপ কথোপকথনে কিয়ংক্ষণ অতিবাহিত হইল। দিবাকর দিবসের প্রথম মান পূর্ণ কবিয়া উজ্জ্বল গতিতে নভস্তলে গমন করিতেছেন। ভুবন মণ্ডল প্রভাতেব বালকত্ব ও কোমলত্ব অতিক্রম করিয়া যৌবনেব ভাবে বলদর্পে বিবিধ কর্ম্মকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কোলাহল করিতেছু করিতেছে। রাজা বাহাদুব দেবীর চরণে প্রণিপাত ও

সাধকের পদস্পর্শ পূর্ব্বক নিজ বাস ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনুরাগ ব্যতীত এ সংসারে কিছু হয় না, মানব যে কর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাতেই সাফল্য লাভ করিতে পারে। অনুরাগ স্বভাব সিদ্ধ, তাহা কোন কারণকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় না। পিতৃ মাতৃ হীন নিবাশ্রয় বালক জ্ঞানের উন্মুখে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী ও আসক্তিপর হইলে তাহাকে প্রকৃত বিদ্যানুরাগী বলা যায় না, কিন্তু যে বালক ভবিষ্যতের বিষয় না ভাবিয়া নিজের পরিণাম ও শুভাশুভের বিষয় চিন্তা না করিয়া, বিদ্যালাভে মনোযোগী হয়, বিদ্যা আলোচনায় আনন্দ লাভ করে, কেন আনন্দ পায়, সে বুঝিতে পাবেনা, বুঝিবার চেষ্টাও করেনা, তাহারি যথার্থ বিদ্যানুরাগ। প্রকৃতি, স্থান, কাল, সমাজ তাহাব অনুরাগের সাহায্যকারী হয়। সাধক কমলাকান্ত শৈশব হইতেই জলদবরণী, মুক্তকেশী, মুণ্ডমালিনীর রূপে মুগ্ধ। শৈশব হইতেই ভুবন মোহিনীর ধ্যানে অনুরাগ, তাহাতেই সুখ শান্তি অনুভব। কেন অনুরাগ, তিনি তাহা বুঝিতেন না। বালক যেমন জননীর রূপগুণ ভালবাসার বিচাব না করিয়া জননীকে দেখিবা মাত্রই সুখী হয়। ব্যাকুলতার সহিত হাস্য মুখে কোলে যাইতে চায়, সাধকেরও তদ্রূপ হইত। অন্তবে বাহিবে শ্যামা রূপ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত। সেই শ্যামারূপে মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেন, পবমানন্দ অনুভব করিতেন। শ্যামারূপ দর্শনে তাঁহার কেন ভাবান্তর হইত, তিনি তাহা বুঝিতেন না। তাঁহার অধিকাংশ গানেই

সেই অনুরাগ ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কখন গাহিতেছেন,—

"কেন মন ভুলিল শ্যামা রূপ নিরখিয়ে আমিত কিছুই জানিনা।"

তিনি কখনও গাহিতেছেন,—

"জানিনা কেমন তব রূপ নিরুপম,
নিরখিয়ে না বুঝি দিন যামিনী।"

কখন বা গাহিতেছেন,—

"ইন্দীবর নিন্দি তনু সজল জলদ যিনি কায়া,
নীলাম্বুজ, নীল মরকত হিমকর দিনকর কিবা হর জায়া।"

তিনি আবার নিন্দাছলে ভাল বাসিয়া বলিতেছেন,—

"সদাই শ্মশান বাস, এলায়ে চিকুরপাশ,
তথাপি যে ভোলে মন কি লাগি জানিনা।"

ভাল বাসার আর একটী লক্ষণ এই যে যাহাকে ভাল বাসে, সে কাল হইলেও পরের মুখে কাল এই কথা শুনিলে তাহার মর্ম্মে বেদনা উপস্থিত হয়। সাধক তাই কখন গাহিতেছেন,—

"কেন রে আমার শ্যামা মারে বল কাল,
যদি কাল বটে তবে কেন করে ভুবন আলো।"

সাধক আবার বলিতেছেন,—

"তেই শ্যামারূপ ভাল বাসি, কালি!
জগমনমোহিনী এলোকেশী,
সবাই বলে কাল, আমি দেখি অকলঙ্কশশী।"

সাধক অনুরাগের ভরে জগদম্বায় আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন,

সমুদয় কর্ম্ম ও কর্ম্ম ফল তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়া ছিলেন। রূপে ব্রহ্ম জ্যোতিঃ অবলোকন করিয়া সমস্ত জগৎ সেই জ্যোতিঃ ব্যাপ্ত ধ্যান করিয়া তিনিও তন্ময়াবাপন্ন হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ দায়িনী প্রথম হইতেই তাঁহাকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তন্ময়ভাব অভ্যাস ও স্থায়ী করিবার অধিকারী করিয়া ছিলেন।

সাধক জগতের দুঃখে দুঃখিত হইতেন। কোটাল হাট কালী বাটীতে ধর্ম্ম পিপাসু অনেক লোকের সমাগম হইত। তিনি সকলের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন, নিজ উদারতার গুণে সকলকেই আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। যুবরাজ প্রতাপচাঁদ প্রতিদিনই সাধকের নিকট গমন করিতেন ও মনের কথা খুলিয়া বলিতেন। যুবরাজ সাধু সন্ন্যাসী, দার্শনিক পাইলেই কি প্রকারে পাপ মুক্ত হইয়া সংসারে চির শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেন। বিভিন্ন দার্শনিক দিগের মত সমুদায় অবগত হইয়া অনেক সময় দর্শনবিৎ দিগের সহিত তর্কে, বিতর্কে অতি বাহিত করিতেন। সেই সকল তর্ক দ্বারা তিনি সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন না। বহু পথের সংযোগ স্থলে দাঁড়াইয়া পথ ভ্রান্ত মানব যেমন কোন্ পথে যাইলে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিব, ভাবিয়া ব্যাকুল হয়, যুবরাজও তেমনি কোন্ পথ অবলম্বন করিলে মুক্তিলাভ সুলভ হইবে, চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইতেন। আত্মার উন্নতি কল্পে কোন কর্ম্মে ব্রতী না হইয়া তাঁহার মন অনির্দ্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত বায়ুর ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিল। একদা যুবরাজ কোটাল হাটে সাধকের সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া কহিলেন, গুরুদেব! আমি নানাবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা ও সেই সকল শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সহিত তর্ক করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছি না। সংসারে শান্তি লাভের পথও নির্ব্বাচন বিষয়ে অক্ষম হইয়াছি। সংসার ও সংসার স্রষ্টা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপত্ব নিরূপণে অক্ষম হইয়াছি। শাস্ত্রের কথা সকল আমার নানা রকমের বোধ হইতেছে। সাধক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "রকমের লোক হইলেই রকমারী দেখিতে পায়। তুমি নানা রকমের হইয়াছ, কাজেই নানা রকম দেখিতে পাইতেছ, দেখ যাত্রা, কবি, পাঁচালী ইত্যাদিতে ঠাকুর দেবতারই কথা হইয়া থাকে, তবে রকম ভেদ মাত্র। যাত্রাতে যেমন একই ব্যক্তি কখন রাজা, কখন মন্ত্রী, কখন রাণী, যখন যেমন প্রয়োজন হয়, সেই ভাবে সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, শাস্ত্র ও তেমনি এক ঈশ্বরকে নানা রূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। যুবরাজ কহিলেন, "গুরুদেব! শাস্ত্র ঈশ্বরকে নানা ভাবে বর্ণন করিলেও চিন্তাশীল মানব তাহার স্বরূপত্ব নিরূপণ করিবার চেষ্টা করে। আমি কয়েক দিন ধরিয়া দর্শনবিৎ দিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেছি কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দেখিতে পাই। তাঁহাদের সকলের মতে জ্ঞানই সংসারে চির দুঃখ হইতে মুক্তির একমাত্র উপায়, সেই চিরশান্তিকে কেহ মোক্ষ, কেহ নির্ব্বাণ, কেহ বা অপবর্গ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহারা সকলেই আত্মার রক্ত মাংস দেহে আবির্ভাব স্বীকার করেন। কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহাকে স্রষ্টা

বলিয়া স্বীকার করেন না। দেখুন! বেদান্ত একমাত্র পরম ব্রহ্মকেই শাশ্বত, সর্ব্বশক্তিমান ও সচ্চিদানন্দ বলিয়া স্বীকার করেন। বেদান্তের মতে জগতের দৃশ্যমান সমুদয় পদার্থই মায়াময় ও স্বপ্নবৎ। বেদান্ত বলেন, সমুদয় পদার্থেই ব্রহ্মশক্তি বিদ্যমান আছে। যেমন সূর্য্য অস্ত হইলে জ্যোতিঃ সকল তাহাতেই বিলুপ্ত হয়, নশ্বর পদার্থের ধ্বংশে সেই ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মেই লীন হয়। সেই ব্রহ্মশক্তি বা আত্মা অবিনশ্বর, নশ্বর দেহ ধ্বংশ হইয়া পঞ্চভূতে মিশাইলে আত্মা ঈশ্বরে লীন হন, কিন্তু সকল আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন না। নশ্বর দেহে কর্ম্মানুসারে আত্মা বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিয়া পুনঃ পুনঃ নশ্বর দেহ অলবম্বন করেন। সৎকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, যজ্ঞ, উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ লাভ হয়। এইরূপ আত্মা বিশুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিলে তাহার মুক্তি হয়। আর উৎকর্ষের চরম অবস্থায় উপস্থিত হইলে সচ্চিদানন্দ ভাব আসে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পিতা নাই, মাতা নাই, জাতি ভেদ নাই, ইচ্ছা নাই, বাসনা নাই, তিনিই পরম ব্রহ্ম। সাংখ্যবাদীরা বলেন, জগতে দুটী বস্তু নিত্য ও অবিনশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি। আত্মা অসংখ্য। আত্মার উৎপাদিকা শক্তি নাই, প্রকৃতির উৎপাদিকাশক্তি আছে। তাঁহারা জগতের অন্তর্নিহিত শক্তিকেই প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। কাষ্ঠের দাহিকা শক্তির ন্যায় জ্ঞান ও বুদ্ধি আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। আত্মা কর্ম্মানুসারে প্রকৃতি শক্তি দ্বারা পুনঃ পুনঃ দেহান্তর প্রাপ্ত হন। সৎকর্ম্ম দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধতা আসে, উৎকর্ষের চরম

অবস্থায় উপস্থিত হইলে আত্মা প্রকৃতির সহিত মুক্ত হন, তাহাই মুক্তি বলিয়া কথিত হয়। সাংখ্য বাদীরা ইহা ও বলেন, কোন ব্যক্তি বিশেষেব দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। ইচ্ছা ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না। ইচ্ছা থাকিলে অভাব থাকে, অভাব থাকিলে পূর্ণ বলা যায় না, অতএব জগতে কোন ব্যক্তিই সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিশুদ্ধ আত্মা দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়া দেবতা বাচ্য হন। ঈশ্বরও সেই রূপ। কেবল মাত্র দেবগণের বা ঈশ্বরেব উপাসনা দ্বারা আত্মার মুক্তি হয় না। বিবিধ সৎকর্ম্ম দ্বারা আত্মাব উৎকর্ষ লাভ হয়। জ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র উপায়। প্রকারান্তরে তাঁহারা প্রকৃতি, পুরুষ বা আত্মাকেই, আদিভূত, নিত্য, অবিনশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ সৃষ্টি কল্পনায় এক নূতন বস্তুর আবির্ভাব করেন, তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম, আত্মা, প্রকৃতি ও পরমাণু কেবল মাত্র নিত্য ও অবিনশ্বব। তাঁহাদেরও মতে জন্মান্তর আছে, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। চার্ব্বাকগণ কিছুই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জন্মান্তর নাই। দেহের তৃপ্তি সাধনই পরম ধর্ম্ম। ইহা কহিয়া যুবরাজ কহিলেন, গুরুদেব! এই সকল আলোচনা করিয়া সদাসৎ কর্ম্ম কি! কোন্ মতে চলিলে সংসারে দুঃখ জাল হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহা ভাবিয়া আমাকে বিচলিত হইতে হইয়াছে। যুবরাজেব বাক্যাবসানে সাধক দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন, এই যুবা পুরুষ মীমাংসাদি দর্শন শাস্ত্রের তর্কে জড়ীভূত হইয়া স্বরূপত্ব নিরূপণে অক্ষম ও নিজ বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়াছে এবং

প্রকাশ্যে কহিলেন, "প্রতাপচাঁদ। দর্শনবিৎগণ নিজ নিজ মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য বেদ বাক্য প্রমাণ দিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই শ্রুতি বাক্যের বিরোধী নহেন। প্রতাপ? তোমার ভ্রম হইতেছে, কালী যে আমার বেদমাতা গায়ত্রী। মা আমার স্বাহা, স্বধা, বেদের তেজোময়ী শক্তি, বেদান্তের পরম ব্রহ্ম, সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি, ন্যায়ের ব্রহ্ম, আত্মা, প্রকৃতি ও পরমাণু। মানুষের যখন ভ্রম হয় তখন সে কাঁদে কুঠার রাখিয়া কুঠার অন্বেষণে সমুদায় বন ভ্রমণ করিয়া অবসন্ন ও বিষণ্ণ হয়। এই বলিয়া সাধক মৃদু স্বরে গাহিলেন।

কত রঙ্গ জান গো শ্যামা।
সুমতি কুমতি গতি তুমি সে কারণ॥
প্রকৃতি পুরুষাকারে, নিরঞ্জনী নিরাধারে,
যেরূপ যে জনা ভাবে সে পাবে তেমন গো।
কমলাকান্তের মনে, কি আছে তারিণী বিনে,
যাকর আপন গুণে লইলাম শরণ॥

সঙ্গীত শেষে সাধক কহিলেন, "ব্রহ্ম নিরূপণ চিন্তা বিফল। যিনি অচিন্ত্য ও নিরুপম, চিন্তা দ্বারা তাহার স্বরূপত্ব নিরূপণ অসম্ভব। তুমি তাঁহাকে যে ভাবে ভাবিবে তুমি তাঁহাকে সেই ভাবে পাইবে, তাঁহার গুণ সকল তোমাকে আশ্রয় করিবে, তুমি তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইবে। মানুষের মনের ক্রিয়া অসীম। ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া দৃঢ় ভক্তির সহিত ব্রহ্মশক্তিদায়িনী জগদম্বাতেই মন ও বুদ্ধি সন্নিবেশ কর, কর্ম্মকর,

তর্কে জীবন অতিবাহিত করিও না। বিশ্বাসী আত্মাকে অনেক উপদেশের প্রয়োজন হয় না।" একমাত্র উপদেশে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইতে পারে। প্রতাপচাঁদ, "গুরু বহুৎ মিলে, চেলা না মিলে এক," ঈশ্বরে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কর্ম্মী হও, ক্রমে কর্ম্মফল লাভে উপেক্ষা আসিবে, তুমি জ্ঞান লাভ কবিবে, পরমা শান্তি তোমাকে আশ্রয় করিবে। যুবরাজ কহিলেন, "গুরুদেব! ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রণিধান কবিতে পারি না বুদ্ধিমান মানব অন্ধ বিশ্বাস করিতে পারে না, সেরূপ বিশ্বাসও তাহার পক্ষে উপযুক্ত নহে।" সাধক কহিলেন, প্রতাপ! তুমি দেখিতেছ, সূর্য্য হইতে মহৎ তেজ সমুৎপন্ন হইযা জগৎ আলোকিত করিতেছে। বিচার আবন্ত হইল, সূর্য্য কি? কেহ বলিলেম, সূর্য্য মহাপুরুষ, ঈশ্বরেব জ্যোতিতে দীপ্তিমান হইয়া এই বিশ্ব প্রতিপালন কবিতেছেন। কেহ বলিলেন, সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায়, ইহাতেও পৃথিবী ন্যায় জীব জন্তু আছে, দিবসে পৃথিবী হইতে তেজ নির্গত হইয়া ইহাকে দীপ্তিমান করে। কেহ বলিলেন, সূর্য্য একটী আগ্নেয় পর্ব্বত। তুমি ইহাদের মধ্যে যাহার মীমাংসায় বিশ্বাস করিবে, তোমাকে অন্ধ বিশ্বাস করিতে হইবে, কারণ সূর্য্যের স্বরূপত্ব নিরূপণ তোমার বুদ্ধি ও ধারণার অতীত। তুমি কেবল এই মাত্র বিশ্বাস করিতে পার, সূর্য্য হইতে তেজোরাশি সমুদ্ভূত হইয়া সমুদয় জগৎ জ্যোতির্ম্ময় হইতেছে। সেই জ্যোতি মহাশক্তি সম্পন্ন ও জীবগণের জীবন স্বরূপ। তুমি যদি সেই তেজোরাশিকে ব্রহ্ম জ্যোতিঃ বলিয়া মনে কর ও তাহাই ধ্যান কর, তাহা হইলে তোমার

অন্ধ বিশ্বাস করা হইবে না, দেখিবে তুমি ব্রহ্মশক্তি লাভ করিবে। প্রতাপ! তুমি দেখিতেছ, জগতের প্রত্যেক সজীব পদার্থে শক্তি আছে। নির্জীব পদার্থে শক্তি থাকিলেও তাহা তোমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। সজীব পদার্থের বর্দ্ধন, রস গ্রহণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা তুমি এক মহৎ শক্তি অনুভব করিতেছ, প্রতাপ! যদি তুমি সেই শক্তিকে ব্রহ্মশক্তি বল, তাহা হইলে তোমাব অন্ধ বিশ্বাস হয় না। তুমি যদি তন্ময় হইয়া সেই পবমাশক্তিব উপাসনা কবিতে পাব, তুমি নিশ্চয় জানিবে, তুমি তদ্ভাব ও তৎশক্তি প্রাপ্ত হইবে। তোমাব আত্মা নিষ্কাম হইয়া মোক্ষলাভ করিবে। ইহা বলিয়া ধাধক গাহিলেন,—

মন! ভ্রমে ভুলেছ কেনে, তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে।
শ্রীনাথ দত্ত, প্রধান তত্ত্ব, দাঢ্য কব সেই চবণে॥
যখন যাবে, ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে।
তোমার দ্বৈত দ্বৈত ভাবে দিবস গেল, চিদানন্দবয় কেমনে॥
তন্ত্র তন্ত্র করি মোলে, কি পেলে ছয় দরশনে।
তুমি বিদ্যা অবিদ্যাবে জান, মহাবিদ্যাব আবাধনে॥
কমলাকান্ত কালীব তত্ত্ব, অনুমানে কেবা জানে।
যার আদি অন্ত মধ্য নাই, সে নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥

বিশু এতক্ষণ বিশেষ মনোযোগেব সহিত সৃষ্টি ও ব্রহ্ম নিরূপণ সম্বন্ধে দার্শনিকদিগেব মতভেদ শ্রবণ করিতে ছিলেন, এক্ষণে সাধকের বাক্যাবসান হইবামাত্র ঈষৎ হাসিয়া কহিলেম, "ঠাকুব! আমি দেখছি, মানুষ বুদ্ধির জোবে, বিদ্যাব বলে, আসলকে নকল, নকলকে আসল করে তোলে। মানুষ উপদ্রব ঝঞ্ঝাট ছাড়া থাকিতে

পারে না। এক কথায় যা ঢুকে যায়, সেখানে হাজার কথা বলে। মানুষ হাজার কথা বোঝে, কিন্তু একটা সোঝা কথা বোঝে না। আমার মা কালী জীব, জন্তু গাছ পাতা, যা কিছু সব সৃষ্টি করেছেন, রক্ষা কচ্ছেন, পালন কচ্ছেন, এ সোঝা কথা মানুষ বুঝ্‌বে না। আমার বোধ হয়, বাপ মা যেমন তাদের ছোট ছোট ছেলেদের কথার তর্ক বিতর্ক শুনে খুসী হন, ছেলেরা সাহস পেয়ে বাচালের মত বকে, দুটো একটা জ্ঞানের কথা কয়, মা বাপ শুনে হাসেন, আমার মা কালী ওই সব বিদ্বান ছেলেদের কথার লড়াই লাগিয়ে বসে বসে মজা দেখেন, আর হাঁসেন। ঠাকুর এখনি গাহিলেন। "কত রঙ্গ জান গো শ্যামা" এই কথাই ঠিক! আমার রঙ্গিণী রঙ্গ না করে থাকতে পারে না। রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমি মূর্খ মানুষ। আমি এত কথা বুঝি না, আমি বুঝি মানুষ কত কথা বলে, কত করে, সব ধর্ত্তে নাই, মানুষে কি আছে, মানুষ আসছে, আর যাচ্ছে। রাজপুত্র! তুমি চিরকাল যে থাকে, এমন লোক খুঁজছ? আমি দেখ্‌ছি বেশ বুঝ্‌ছি, আমার মা কালী ভিন্ন আর কিছুই চির কাল থাকবে না। দেখ তুমি, আমি, কেউ চিরকাল থাকবোনা। কিন্তু মা আমার যেমন তেমনি থাকবে। আমার বাপ দাদা মাকে যেমন দেখেছে, আমিও তেমনি দেখ্‌ছি। আমার ছেলরাও মা কালীকে তেমনি দেখ্‌বে। তাহলেই বোঝ, আমার মা কালীর চেয়ে চিরকালের জিনিস আর কিছুই নাই। তুমি মনের গোলমাল ছেড়ে দাও। আমার বোধ হচ্ছে

মা যেমন ছেলেকে পুঁতুল দিয়ে ভুলোন, তেমনি মা কালী তোমাকে কতকগুলি পুঁথি দিয়ে ভুলিয়েছেন। তুমি বইগুলি ছুড়ে ফেলে দাও, আর বল, "আর ভুলালে ভুলবো নাকো।" আড় হয়ে মায়ের কাছে পড়, আর কাঁদ, মা তোমার মনটাকে ঠিক করে দেবেন। আমি ঠাকুরের কথা শুনে ঐ রকম করে পাপের জ্বালা অনেক ভুলেছি। যুবরাজ কহিলেন,, "বিশু! তোমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, শুনিয়াছি বিশ্বাসে লভয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার সে বিশ্বাস এখনও আসে নাই। ঠাকুরের বাক্যে আমার বিশ্বাস আছে। ঠাকুরই আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সক্ষম জানিয়া আমি তাঁহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলি। দেখ, কোন কোন ব্যক্তি স্থল বিশেষে দিশে হারা হয়। তাহার অন্য কোন স্থানে দিগ্‌ভ্রম হয় না, কেবল মাত্র সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিলেই সে দিক্‌নির্ণয়ে অক্ষম হয়। আমি যখনই করালবদনাকেই পরমা শক্তি, ব্রহ্ম সনাতনী বলিয়া অনুমান করিতেছি, তখনই পুরাণোক্ত বহু দেব দেবীর বিষয় মনোমধ্যে উদয় হইতেছে, সাকার উপাসনার সম্বন্ধেও ভ্রম জন্মিতেছে।" বিশুকে ইহা কহিয়া যুবরাজ সাধককে কহিলেন, "গুরুদেব! আমার বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, শাশ্বত আত্মা কিম্বা নিরাকার পরম ব্রহ্মের ধ্যান, ধারণা, নিরস বলিয়া কি পুরাণোক্ত সাকার দেব দেবী উপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এ তিন মূর্ত্তির প্রয়োজন কি? নিরাকারকে রূপ রসাদি দ্বারা ধ্যান করিবার প্রয়োজন হইলে একটী মূর্ত্তির কল্পনা করিলেই ত হইত?

প্রত্যেক পুরাণে এক এক দেবতাকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল কারণে শৈব শক্তি বৈষ্ণব, প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এক ধর্ম্ম বহু সম্প্রদায় ভুক্ত হইলে ধর্ম্ম ও সমাজ বন্ধন ক্ষীণ হইবার সম্ভাবনা। আপনি আমার এই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করুন। সাধক কহিলেন, "প্রতাপচাঁদ? মনের সন্নিবেশ জন্য সাকার রূপের কল্পনা। নিরাকাব উপাসনা জ্ঞান যোগ ব্যতীত হয় না। জল হইতে বাষ্প হয়, আবার সময়ে বাষ্পই জলরূপে পরিণত হয়। বিজ্ঞান সংযোগে সাকাররূপ অনির্ব্বচনীয়, নিরাকার রূপ ধারণ করেন।" প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "গুরুদেব! বিবিধরূপ কল্পনার প্রয়োজন কি? ঐ দেখুন, মায়ের মুক্তকেশ, গলে মুণ্ড মালা, করে অসি। আবার দেখুন, কৃষ্ণ মূর্ত্তি, শিরে শিখি চূড়া, গলে বন মালা, কটীতটে ধড়া, চরণে নূপুব। কেহ বা কালী মূর্ত্তির উপাসক, কেহ বা কৃষ্ণ মূর্ত্তির উপাসক। সাধক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমাদের এ প্রদেশে এক গুড় হইতে তুবরাজ পুরের বাতাসা ও মানকরের কদমা প্রস্তুত হয়। কেহ বা বাতাসা ভাল বাসেন, কেহ বা কদমার প্রিয়, কিন্তু বাবা? বাতাসা কি কদমা গুড়ের রূপান্তর ভিন্ন কিছুই নয়। ব্রহ্ম শক্তি এক, প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পূজিত হন মাত্র।" এই বলিয়া সাধক হাতে তাল দিয়া আহ্লাদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন—

জাননারে মন! পরম কারণ, শ্যামা ত কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়॥

মা কভু বাঁধে চূড়া, কভু পরে ধড়া,
ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তায়।
ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥
মা ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন,
করেন সৃজন পালন লয়।
মা আপনার মায়ায় আপনি আবদ্ধ, যতনে এ ভব যাতনা সয় ॥
যে রূপে যেজনা, করয়ে সাধনা,
সেই রূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে কমল মাঝারে উদয় হয় ॥

সঙ্গীত শেষে প্রতাপচাঁদ বিমোহিত হইয়া সাধকের মুখ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া ভাবিলেন—এই মহাপুরুষের সর্ব্বদাই প্রসন্ন বদন, আমি কখনও ইহার ভাবান্তর দেখিলাম না। ইঁহার বাক্য সকলের কি এক আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি। মনের বিকার নাশ করে। প্রতাপচাঁদ প্রকাশ্যে কহিলেন, "গুরুদেব! অরুণ উদয়ে কুজ্ঝটিকা জালের ন্যায় আপনার বাক্য শ্রবণে আমার সন্দেহ জাল দূরীভূত হইতেছে। অতঃপর আমি ব্রহ্মশক্তিকে মাতৃভাবে উপাসনা করিব। আমি জানি, মায়ের তুল্য বাক্য নাই, মায়ের তুল্য স্মৃতি নাই, মাতৃভাবে ভাবান্তর নাই। সাধক কহিলেন, "মাতৃ ভাব, পিতৃভাব, যাঁহার যে ভাবে ইচ্ছা হয়, উপাসনা করিতে পারেন, ভাবের ভাবান্তর না হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। জপ করিতে বসিয়া নিজকৃত কর্ম্ম কি সংসার চিন্তা যাহাতে মনোমধ্যে

না আইসে তজ্জন্য অভ্যাস যোগ করিতে হয়। অভ্যাস যোগ দ্বারা ক্রমে চিত্ত শুদ্ধি হয়। তুমি এখন সুষুম্নাতে উপাস্য দেবতার সহিত প্রাণের সন্নিবেশ করিতে চেষ্টা কর, কিন্তু নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিও না, তাহাতে অধর্ম্ম আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চিন্তার সময় নির্ব্বাচন কর। তুমি মোক্ষ চিন্তার কাঠিন্য যাহা অনুভব করিবে, তাহা আমাকে কহিবে।" ইহা কহিয়া সাধক যুবরাজ প্রতাপচাঁদকে কহিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত, হোম, যজ্ঞ, প্রভৃতি দ্বারা দেবগণ প্রীত হন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়, তুমি কুল ক্রমাগত প্রজাপালন ও ঐ সকল কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া চিত্তের শান্তি লাভ কর। তুমি যোগাসন অবলম্বন পূর্ব্বক ষোল, বত্রিশ, চৌষট্টি ক্রমে দেবীর বীজ মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম অভ্যাস কর। রেচক ও পূরক অতি ধীর ভাবে করিবে, যেন নাসিকায় হস্ত প্রদানে শ্বাস প্রশ্বাসের অনুভব না হয়।" যুবরাজ কহিলেন, "গুরুদেব আপনার উপদেশ আমি যথা সাধ্য প্রতি পালন করিব, কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের কাঠিন্য আপনার নিকট নিবেদন করিব, ইহা কহিয়া যুবরাজ দেবী ও সাধককে বন্দনা পুর্ব্বক নিজ বাস ভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

কথাই আছে, "অনেক মানুষ মিলে কিন্তু মন মিলেনা।" মনের মত মানুষ পাওয়া বড় কঠিন। আত্মার একভাব না হইলে মনের মিলন হয় না। সত্ত্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির, তমোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তমোগুণ প্রধান ব্যক্তির মিলন হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল গুণের

কর্ম্মানুসারে প্রকার ভেদ থাকায় সমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত তদ্‌গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরও সর্ব্ব সময়ে সমান ভাবে মিলন হয় না। সেই কারণেই মনের মানুষ পাওয়া কঠিন আত্মার বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ অবস্থার সমান ভাব না হইলে উভয় আত্মার মিলন হয় না। বর্দ্ধমান রাজসভায় অনেক গায়ক ও বাদ্য যন্ত্র বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত মনের আনন্দে সঙ্গীত করিতে সাধক অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতেন। আমি বড় গায়ক, আমি বড় যন্ত্রী, এইরূপ অহঙ্কারের বীভৎস মূর্ত্তি সাধক কখন কখন সভাস্থলে দর্শন করিতেন। শিষ্টতার অনুরোধে তিনি মনোভাব গোপন করিতেন। সাধক সভাস্থ হইলে মহারাজা বাহাদুর অনেক সময় তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন ও তাঁহার ভাবান্তর অবলোকন করিতেন। সাধকের অন্তর সরস ও বালকের ন্যায় কোমল, তিনি নির্দ্দোষ হাস্য পরিহাস প্রিয় এ কথা রাজাবাহাদুর বিদিত ছিলেন। সঙ্গীত সময়ে জগদম্বার গুণ কীর্ত্তনে তাঁহার তন্ময় ভাব হইত, তখন তিনি কাহার দিকে ও কোন বিষয়ে লক্ষ্য করিতেন না, কিন্তু সঙ্গীত শেষে কখন কখন অহঙ্কারের ছবি তাঁহার চক্ষে পড়িত ও তাঁহার আনন্দের বিঘ্ন হইত। মহারাজা বাহাদুর তাঁহার বিমর্ষ ভাব দর্শন করিতেন। সভাস্থলে হাস্য পরিহাসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে সমাগত জনের চারু বদন, দন্তরুচি কৌমুদী সুধামণ্ডিত গৃহমধ্য আলোকিত করিত, কিন্তু সাধক কখন কখন অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতেন। মহারাজা বাহাদুর কারণ জানিবার

জন্য উৎসুক হইলেন। একদা তিনি একান্তে সাধককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব কখন কখন সভাস্থলে হাস্য প্রসঙ্গে আপনার পবিত্র বদনের হাস্য দৃষ্ট হয় না, সঙ্গীত অবসানেও কখন কখন আপনাকে আমি বিমর্ষ অবলোকন করি, কারণ কি? যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আপনি আমাকে আপনার চিত্ত বিকারের কারণ জানাইয়া সুখী করিবেন। সাধক কহিলেন, "মহারাজ! মানব সর্ব্বদাই আপন আপন মুখপ্রিয় বস্তুর আস্বাদনে আনন্দ অনুভব করে। যে ব্যক্তি তিক্ত আস্বাদন করিতে পারে না, তিক্ত স্বাদ যুক্ত বস্তুব আস্বাদনে তাহার মুখ বিকার স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন হাস্য প্রসঙ্গ ও সঙ্গীত সময়ে কখন কখন আমার রুচি বিকাব ঘটিবার কারণ উপস্থিত হয়। সমুদয় জীব জন্তুর মধ্যে মনুষ্যই কেবল মনের আনন্দ হাস্যে প্রকাশ করিতে পারে, হাস্য বড় উপাদেয় রস। যে লেখনীতে হাস্য রস নাই, তাহা শুষ্ক ফলেব ন্যায় অপ্রীতি কর। যে বচন প্রণালীতে হাস্য নাই তাহা কাক কলরবের ন্যায় শ্রুতিকটু। নির্দ্দোষ হাস্য নির্ম্মল সরোবরে প্রভাত প্রস্ফুটিত কমল সকলের ন্যায় প্রীতিপ্রদ। কিন্তু আমি দোষ-দুষ্ট হাস্যকে চপলা চমকের ন্যায় অবলোকন করি। এই জগতীতলে সকলেই জগদম্বার ইচ্ছায় সৃজিত ও পরিচালিত, কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। ব্যক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ, ধর্ম্ম বিশেষকে অবলম্বন করিবা যে হাস্য রসের আবির্ভাব হয়, তাহা দুষিত, অতএব পরিত্যাজ্য। সঙ্গীতের পর কখন কখন আমার বিমর্ষভাব হয়, তাহারও কারণ আছে।

সঙ্গীত শেষে জগদম্বার প্রসন্নময়ী মূর্ত্তি চারি দিকে অবলোকন করিয়া বাদ্যকারের মুখপানে চাহিবামাত্র, যখনই অহঙ্কারের ছায়া অবলোকন করি, তখনই অধোমুখে অন্তর্বাসিনী প্রসন্নবদনা রঙ্গিনীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শীতল হই। মহারাজ! অহঙ্কারের মূর্ত্তি বীভৎস, তাই আমার বিমর্ষ ভাব ঘটে। সুর ব্রহ্ম, বাক্য ও যন্ত্র সকল সেই ব্রহ্মের আসন স্বরূপ, তাল মান সহ সেই ব্রহ্মের উদ্বোধনই সঙ্গীত বা উপাসনা। যদি গায়ক ও বাদ্যবিৎ নির্ম্মল ভক্তিসহ মন প্রাণকে সুরের সহিত মিশাইয়া সঙ্গীত ধ্যানে মগ্ন হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের সুর ও যন্ত্রের সাফল্য হয়, অন্যথা অহঙ্কার সহ অযথা চীৎকারে চিত্ত চাঞ্চল্য কিম্বা তামসিক আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই উপস্থিত হয় না। মাঠে, গোষ্ঠে, লোকালয়ে, দেবালয়ে, যেখানে সেখানে প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভুবনেশ্বরীর মহিমা গানে পরমানন্দ ভোগ করা যায়, কিন্তু যদি যন্ত্র দেবতার আরাধনা হেতু ব্যক্তি বিশেষকে সেই সঙ্গীত উপাসনায় সহযোগী করিতে হয়, তাহা হইলে গায়ক ও বাদ্যকারের সমভাবাপন্ন হওয়া উচিত। বাদ্যকার অহঙ্কার শূন্য ও প্রেমিক না হইলে উপাসনার হানি হয়। দেখুন, মন্ত্র সকল স্বতই পবিত্র, তথাপি যজ্ঞকালে কাষ্ঠ ও হবি উভয়েরই পবিত্রতা আবশ্যক করে, অন্যথা যজ্ঞ বিঘ্ন ও হবির্গন্ধ দূষিত হয়। সঙ্গীত সময়ে গায়ক ও বাদ্যকার উভয়েরই পবিত্রতার প্রয়োজন। আমি অনেক স্থলে অনেক বাদ্যকারের সহিত সঙ্গীত আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু অমরার গড় নিবাসী কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সঙ্গীত উপাসনায় যেরূপ

আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি, সেরূপ কুত্রাপি আনন্দ অনুভব করিতে পারি নাই।" ইহা শুনিয়া মহারাজা বাহাদুর সাধককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনারাম চট্টোপাধ্যায় কে? তাঁহার পরিচয় আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" সাধক কহিলেন, "কেনারামের নিবাস মানকরের নিকট অমরার গড়। তিনি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, প্রেমিক, উদার, পরদুঃখ কাতর, বাদ্যযন্ত্র পারদর্শী, গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী। আমি চান্নায় থাকিতে তিনি আমার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি এখানেও ইতিপূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, আপনি তৎকালে কালনায় ছিলেন। আমি প্রতি বৎসর শ্যামা পূজার পর তাঁহার গৃহে গমন করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। কার্ত্তিক মাস শেষ হইল। আমি সত্বর অমরার গড়ে গমন করিব। কেনারাম নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠার সহিত আমার গমন প্রতীক্ষা করিতেছেন!" মহারাজ বাহাদুর কহিলেন, "কেনারাম চট্টোপাধ্যায়কে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ সহ আমি আপনার সহিত তাঁহার নিকট লোক পাঠাইতে ইচ্ছা করি। বোধ হয়, তিনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন।" সাধক কহিলেন, 'শ্রদ্ধার সহিত আহ্বান করিলে তিনি সর্ব্বত্রই আহ্লাদের সহিত যাইয়া থাকেন। তিনি আপনার অধিকার মধ্যে বাস করিতেছেন। আপনার রক্ষিত দ্রব্য সমূহে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আপনার নিমন্ত্রণ তিনি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিবেন। আমার সহিত তাঁহার নিকট কোন লোক পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। আমিই আপনার অভিপ্রায় তাহার নিকট প্রকাশ করিব।

আমার বর্দ্ধমান প্রত্যাগমন সময়ে সম্ভবতঃ তিনি আমার সঙ্গে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" ইহা কহিয়া সাধক মহারাজার নিকট কিয়দ্দিবসের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অষ্টম অংশ।

সাধকের অমরার গড়ে গমন ও দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে তাঁহার গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ।

সাধক বিশুর সহিত পুনর্ব্বার অমরার গড়ে যাইতেছেন। সাধক এখন রাজদ্বারে বিশিষ্টরূপে সম্মানিত হইলেও তাঁহার বেশ পূর্ব্বের ন্যায়। পরিধান গেরুয়া বসন, গিরিমাটী রঞ্জিত, উত্তরীয় গল দেশে লম্বিত। গাত্র মার্জ্জনী বদ্ধ তৃতীয় বস্ত্রখণ্ড বগলে। তাঁহারা বড় রাস্তায় (গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে) চলিতেছেন। অমরার গড় বড় রাস্তার অদূরে অবস্থিত, বর্দ্ধমান ঐ রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী, অতএব বর্দ্ধমান হইতে অমরার গড় গমনের বড় রাস্তাই সুন্দর ও সহজ পথ। অগ্রহায়ণ মাস, রবিকর জাল প্রচণ্ড নহে। প্রকৃতি পুঞ্জ শিশির মণ্ডিত। পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে অনতি-দূরবর্ত্তী থাকিয়া অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বনস্পতিগণ প্রকাণ্ড শাখা জাল বিস্তার পূর্ব্বক অতি দর্শনীয় হইয়াছে। নভস্তলে রজত কান্তিতে দিবসপতি কিয়ৎদূর উত্থিত হইলেও পত্রাবলি হইতে শিশির বিন্দু ধীরে ধীরে নিপতিত হইতেছে। বর্দ্ধমানের রাঙ্গামাটী বিখ্যাত। কাঁকর চূর্ণ রাঙ্গামাটী দ্বারা প্রতি বৎসরই বড় রাস্তার অঙ্গ সংস্কার করা হয়, সেই জন্য রাস্তাটী লাল ধূলায় পরিপূর্ণ। এখন ধূলিজাল শিশির সিক্ত হইলেও গমনে জানু পর্য্যন্ত উত্থিত

হইতেছে। বিশু কহিল, "ঠাকুর! রাস্তার রাঙ্গা ধূলা আপনার কোমর পর্য্যন্ত উঠছে, আপনি আমার কাঁদে চড়ুন। আপনার পা দুখানি আমার বুকের মাঝখানে ধরে আমি শীতল হই।" সাধক কহিলেন, "বিশু! তুমি কি আমাকে রাস্তায় সং সাজাইতে চাও। তোমার কাঁদে আমাকে যে দেখিবে, সেই জিজ্ঞাসা করিবে এ ঠাকুরটি কে? ইহার কি হইয়াছে? তুমি কত লোকের কথায় উত্তর দিবে।" ঠাকুর আবার হাসিয়া কহিলেন, "বিশু যদি তুমি আমাকে লইয়া রোজগার করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাকে কাঁদে করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ফের, আর বল এই ঠাকুর বড় গুণী, সব রোগ ভাল করিতে পারে, আমি বলি, তোমার এ ব্যবসা কিছু দিন মন্দ চলিবে না, তুমি এই মতলবই ঠিক কর।" বিশু হাসিয়া কহিল, "ঠাকুর! যে সব লোক মঙ্গলচণ্ডী মাথায় করে, লোকের বাড়ী বাড়ী ফেরে, তারা আমার চেয়ে ভক্তিমান। তারা মঙ্গলচণ্ডীকে স্নান করায়, চন্দন মাথায়, কাপড় পরায়, পায়ে মাথায় ফুল দিয়ে সাজায়, প্রাণভরা হৃদয় খোলা কথায়—মহামন্ত্রে পূজা করে, ভাল যা কিছু খাবার পায়, তাঁরে নিবেদন করে, প্রসাদ পায়, লোকের বাড়ী বাড়ী মাথায় করে তাঁরি গুণ গেয়ে ভিক্ষে করে, মাথার কাছে রেখে শোয়, মনের কথা, প্রাণের কথা, চোকের জলে জানায়, আবার তারি ধ্যান করে সকালে উঠে, ঠাকুর! আমি বলি, তারা আমার মাথার মণি। আমি ত আপনার ওরূপ ভাবে সেবা কর্ত্তে পাই না।" সাধক কহিলেন, "বিশু তাহাদের ভক্তি ভাল, ভক্তির

সহিত কপটতা থাকিলেই গোল। ঠাকুর আবার হাসিয়া কহিলেন, "আমার প্রতি তোমার অতি বড় ভক্তি দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে, পাছে তুমি আমাকে মঙ্গলচণ্ডীর মত সজ্জিত করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ফের, কিন্তু তুমি জাননা ভক্তির ক্ষমতা অসীম। দেবতারাও ভক্তের অধীন। আমি জানিনা আমার কপালে কি আছে।" বিশু হাসিয়া কহিল, "ঠাকুর কত রঙ্গ জান। আমি মায়ের রঙ্গও বুঝতে পারি না, আমি আপনার রঙ্গও বুঝতে পারি না, ঠাকুর আমি কিছু চাই না, ঠাকুর ভক্তি দেন, আপনার উপর ভালবাসা দেন। আপনার কষ্ট দেখে আপনাকে কাঁদে কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছিল। মহারাজ বাহাদুর সঙ্গে পাল্‌কী, লোক লস্‌কর দিতে চাইলেন, আপনি হাতীর পিঠে চড়তে স্বীকার কল্লেন না। আমার ইচ্ছা, আপনার পাল্‌কীতে আসিলেই ভাল হত, আমি পাল্‌কীর একধার একা বইতাম।" সাধক কহিলেন, "বিশ্ব জননীর এই সংসারে সকলেই আপনার লোক, কেহ ভ্রাতা, কেহ পুত্র, কেহ কন্যা, কেহ অমাত্য। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জগদম্বার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, অতএব কাহার স্কন্ধে চড়িব। মানুষের মধ্যে কর্ত্তা, প্রভু, দাস দাসী প্রভৃতি ভেদ জ্ঞান মায়া ও অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়, অহঙ্কারই আত্মাকে কলুষিত করিয়া অধোগামী করে। তুমি কি হাতীর পিঠে ঘাড় উঁচু করিয়া অহঙ্কারে চারি দিককে ক্ষুদ্র দেখিয়া গমন করিতে ইচ্ছা কর? তুমি কি হাতীর গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া মহাহট্টগোলে গমন করিতে ইচ্ছা কর? তুমি কি দল বল সঙ্গে লইয়া, রাজার লোক বলিয়া

পরিচিত হইতে ইচ্ছা কর, যদি তাহাই তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে এ বেশ পরিত্যাগ কর। দেখ বিশু! লজ্জা নিবারণের জন্য এই বস্ত্র খণ্ড। যে দিন লজ্জা ত্যাগ করিতে পারিব, দিগ্‌বসনে লোকালয়ে, সস্মিত বদনে চারিদিকে কেবল জগদম্বার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিব, বিশু সেই দিনই জানিবে মা আমার সব জ্বালা ঘুচাইয়া প্রিয় সন্তান বলিয়া চরণে স্থান দিবেন। ধূলি আমার অঙ্গ রঞ্জিত করাতে তুমি ব্যথিত হইতেছ, কিন্তু এই সকল রঞ্জিত ধূলিকে আমার রাগ বস্ত্র বলিয়া বিবেচনা হয়। বিশু! দেখ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, তাহার মধ্যে এই প্রশস্ত রঞ্জিত বর্ত্ম, হরিদ্রা রঞ্জিত ব্রাহ্মণ গলে উপবীতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পথ পার্শ্বে এই প্রকাণ্ড বট বনস্পতি, ইহার পাদদেশ কি সুন্দর। কিন্তু তুমি রাজ ভবনে বিবিধ সুন্দর বস্তু দেখিয়াছ, সজ্জিত দাস দাসীগণ দেখিয়াছ, প্রাসাদ শ্রেণী দেখিয়াছ, সেই রাজসভা দেখিয়াছ, সুগন্ধ জাল জড়িত বৃন্ত জালের চপলতা নিরীক্ষণ করিয়াছ, এস এক্ষণে আমরা এই বনস্পতির তলে রমণীয় তৃণাসনে ক্ষণেক উপবেশন করি। দেখ, এই বনস্পতি শাখাজাল বিস্তার পূর্ব্বক সরস বল্লী দলকে ক্রোড় দেশে স্থান দিয়া কি অপূর্ব্ব আবাসের সৃজন করিয়াছে। সমীরণ লতা জালের প্রস্ফুটিত সুরভি সংযুক্ত কুসুম সকলকে চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ওই শোন পক্ষীগণের কলধ্বনি, ওই দেখ, বিচিত্র বর্ণের বিহঙ্গমগণ আহ্লাদের সহিত নৃত্য করিয়া শাখা হইতে শাখান্তরে গমন করিতেছে। কিন্তু বল দেখি, সেই রাজভবন আর এই বৃক্ষতল

তোমারি কোন স্থান রমণীয় বোধ হয়। পরমা প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব শোভা, অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া কি তোমার হৃদয় প্রেমরসে পূর্ণ হয় না?" প্রকৃতির এইভাবকে মায়ের রূপের ভাবে দেখিতে ইচ্ছা হয়না? ইহা কহিয়া সাধক সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন,—

কালি! আজু নীল কুঞ্জ, তেজঃপুঞ্জ লতা শোণিত নূতন মঞ্জরী।।
কিঙ্কিনী কলরব, মধুকর গুঞ্জরে, কোকিল বচন সুমাধুরী॥
মুকুট শিখণ্ডী, শ্রবণ বিহঙ্গী, নাভি সরোজহি পুণ্ডরী।
লোচন খঞ্জন, শ্রীবদন ভ্রমরী, পিয়ে মকরন্দ কাদম্বরী॥
চরণ তমাল ব্যালম্বয় নূপুর, শিব রজতাচল তছুপরি।
কমলাকান্ত দেখরে পরমাদ্ভুত, শঙ্কর উরু পরে শঙ্করী॥

বিশু এতক্ষণ তন্ময় হইয়া সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছিল, সঙ্গীত শেষে কহিল, "ঠাকুর! রাজার ঘরে সকলি ধন দৌলতের মেলা, সকলি মানুষের করা, মানুষের বাহাদুরীর বাজার, কিন্তু এখানে সব মা কালীর খেলা, তাঁর গড়া জিনিস, তিনি এ সকলকে কত ভাবে, কত রঙ্গে যে সাজিয়ে রেখেছেন, তা মুখে বলা যায় না। এই গাছের তলাটিকে আমার স্বর্গ বলে বোধ হচ্ছে। এখানে রোগ নাই, চিৎকার নাই, অহঙ্কারের হাঁক ডাক নাই, আছে কেবল নয়ন ভরা মনের মত জিনিস, শান্তি, আনন্দ, চারি দিকে আনন্দময়ীর নৃত্য।" বিশু আবার কহিল, "ঠাকুর! দেখুন! এই বট গাছটী কতদূর পর্য্যন্ত ডাল পালা মিলেছে, এক একটী নামল নেমে থামের মত ডাল গুলিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ধরে

রেখেছে। গ্রীষ্ম কালে এই গাছ তলাটী বড় মনোরম স্থান। মাঠের হাওয়া সরস পাতায় লেগে ঠাণ্ডা হয়ে, পথিকের মাথায় লাগে। আমার মা কালীর এত ভালবাসা, এত বন্দোবস্ত দেখেও লোকের চৈতন্য হয় না, ভক্তি আসে না, ই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি আর একটী দেখছি, ওই দেখুন, বাব্‌লা গাছ, খেজুর গাছ, কাঁটার বন, গায়ে কাঁটা, মাথায় জটা, কিম্ভুৎকি-মাকার, হাঁ ঠাকুর, গাছ প্‌ালার মধ্যেও সত্ত্ব, রজঃ তমঃ আছে নাকি? এদের কাছে কোন লোক আশ্রয় লয় না, পাখীরাও এদের ডালে বস্‌তে ভয় করে, দেখলেই বোধ হয়, এরা যেন রেগে চোক রাঙ্গিয়ে বসে আছে। বারোওয়ারীর জায়গায় যেমন নানা রকমের ছবি থাকে, আমার বোধ হয়, মা কালীর সংসারে মানুষ, পশু, পাখী, গাছ পালাও নানা রকমের। আমি রাস্তার দু-ধারে গাছ পালা দেখে আস্‌ছি, কেউ কুঁজো, কেউ দাঁত বার করে আছে, কেউ মাথা হেঁট করে গম্ভীর হয়ে ধ্যান কচ্ছে, আবার কেউ মাথা উচু করে, হাত পা ছড়িয়ে ফলে ফুলে সৌরভে গৌরবে চারিদিক আলো করে হাস্‌ছে।" সাধক একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বিশু! তুমি খেজুর ও বাবলা গাছ দেখিয়া ইহাদিগকে তমোগুণ বিশিষ্ট মনে করিতেছ, কিন্তু তাহা নহে। বৃক্ষ সকলের মধ্যে তোমার চক্ষে ইহারা কদাকার হইলেও ইহারা 'অতি বিনীত। ইহারা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ও বড় শ্রদ্ধাস্পদ। দেখ বাব্‌লার বীজ গো মহিষাদির প্রিয় খাদ্য। ইহার কাঠে সুন্দর হল প্রস্তুত হয়। ইহার রস ও আঠা মনুষ্যের বিশেষ উপকারে লাগে।

এই খেজুর গাছ দেখিতেছ, ইহাদের গাত্রাবরণ কঠিন হইলেও ইহারা রসের কূপ। 'ঝুনা নারিকেল ভিতরে রস।" মনুষ্যের রসনা তৃপ্তি কর অতি উপাদেয় রস ও শর্করা অন্তর্নিহিত রাখিয়া ইহারা কণ্টক শিরে অতি সুমিষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু বিশ্ব নিয়ন্তা হেমরত্ন সমুদয়কে ভূগর্ভে নিহিত রাখিয়াছেন। কণ্টকাকীর্ণ লতাজালের অভ্যন্তরে পরিমল পরিপূর্ণ প্রসুন সকলকে প্রস্ফুটিত করিয়া বচনাতীত রচনা কৌশল প্রকাশ করিতেছেন। জটাজুট সমাযুক্ত, ভস্ম কলেবর সন্ন্যাসীর হৃদয়ে প্রেমের কলসী স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার খেলা কে বুঝিবে? মানব, চতুষ্পদ, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ কাহাকেও ঘৃণা করিওনা। সকলেই জগদম্বার সৃজিত, তাঁহার পরম প্রিয়। সকলেই সৃষ্টি রক্ষার যন্ত্র স্বরূপ।" বিশু ও সাধক কিয়ৎক্ষণ বট বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়া অমরার গড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দেহ ধারণ করিলেই শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সাধক গাহিয়াছেন।

"এ তনু ধারণে, এ তিন ভুবনে,
যাতনা নাহিক কার রে।
কিন্তু হেরিলে ওমুখ, দূরে যায় দুঃখ,
এই গুণ শ্যামা মার রে।"

সেই দৈহিক যাতনা ক্ষুৎপিপাসা ও রোগ হইতে উৎপন্ন হয়। যিনি সেই যাতনাকে উপেক্ষা করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করিতে পারেন, তিনি যোগী। সন্তোষ হইতে শান্তি ও সামধি আইসে,

চাঞ্চল্য হইতে অশান্তি ও দুঃখ আইসে। লব্ধ ও ভোগ্য বস্তুর বিয়োগে ঔদাস্য যোগীর ধর্ম্ম, ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্য বদ্ধ জীবের প্রকৃতি। শান্তি ও সন্তোষ না থাকিলে শান্তিময় পরমেশ্বরে মনোনিবেশ নিতান্ত অসম্ভব। রোগাদি সংসারের দুঃখ জাল সন্তুষ্ট ব্যক্তির নিকটবর্ত্তী হইতে ভয় করে। পূর্ণিমার শশী পূর্ণানন্দময়ী পরমা প্রেম সুধা সহ সাধকের হৃদয় আকাশে বিরাজ করিতেছেন, তাহার মন চকোর সেই সুধা পানে সর্ব্বদাই প্রমত্ত। ক্ষুৎপিপাসা দৈহিক যন্ত্রণা তাঁহার মনকে ব্যথিত করিতে পারিত না। বর্দ্ধমান হইতে আসিবার সময় সাধক কালীনামামৃত ভিন্ন অন্য ভোগ্য বস্তু সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই। ক্রমে বেলা অধিক হইল। স্নান আহারের সময় উপস্থিত। পথ প্রান্তে এক দিব্য সরোবর দেখিয়া বিশু কহিল, "ঠাকুর! বেলা হয়েছে, দেখুন, এই পুকুরটীর কি সুন্দর জল! স্নানের ঘাটটীও পরিষ্কার, আসুন আমরা স্নান করে একটু জল খাই।" সাধক কহিলেন, "বিশু! তোমার মুখ দেখিয়া আমার অনুমান হইতেছে, তুমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছ। বর্দ্ধমান হইতে কোন আহারীয় সংগ্রহ করিয়া আনা হয় নাই, এখন কি প্রকারে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে?" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমি ক্ষুধা তেমন বোধ কচ্ছি না, কিন্তু আমার জল পানের ইচ্ছা হয়েছে।" সাধক কহিলেন, "বিশু! সংসার ত্যাগে কষ্ট বিস্তর। নিজের উদর পূরণের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। পরিব্রাজকের কষ্টও বিস্তর। যদি তুমি আমার সঙ্গে না আসিতে ও যদি তোমাকে দূরস্থ স্থানান্তরে যাইতে হইত,

তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার পল্লী বাসী ভাত, লবণ, লঙ্কা, পিঁয়াজ তোমার সঙ্গে দিত, তুমি এই ঘাটের ধারে সেই ভাত পেট ভরিয়া খাইয়া গায়ে জোর করিয়া রাস্তা চলিতে পারিতে। বিশু! ঠিক করিয়া বল দেখি, এখন তোমার সেই খাবার মনে করিয়া রসনায় জল আসিতেছে কিনা?" বিশু কিঞ্চিৎ হাসিয়া কহিল, "ঠাকুর! কত রঙ্গ জান, আমার মদ মাংস খাওয়া ধাত, লোকে বল্‌তে পারে বিশে বেটা চোরের যাশু, শুয়োর খেয়ে জন্ম গেছে, আজ গেরুয়া কাপড় পরে সাধু হয়েছে। কিন্তু ঠাকুর! তুমি ত অন্তরের কথা জান, আমার কুকাজ, কুখাদ্যে বড় ঘৃণা হয়েছে, স্মরণকে পাগল ভিন্ন কেহ পরিত্যাগ কর্ত্তে পারে না, সেই স্মরণই আমাকে মাঝে মাঝে বড় কষ্ট দেয়, যা' হক আপনার চরণের বলে আমি মনটাকে অনেক ঠাণ্ডা কর্ত্তে শিখেছি। মা কালীর স্মরণে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা বড় বেশী বোধ হয় না।" সাধক কহিলেন, "না হে বিশু! তুমি রাগ করিও না। অভ্যাস বড় প্রবল জিনিষ, মদ্য মাংস মৈথুন প্রভৃতিতে জীবের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি। যে ব্যক্তি একদিন মদ্য পান করিয়াছে, মদ্য দেখিলেই তাহার মদ্য পানের ইচ্ছা হয়; সেই জন্য ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিশ্চ মহাফলা।"

যাহা হউক আমি বুঝিতেছি তুমি নিবৃত্তি মার্গে উঠিতেছ। এস আমরা এই পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান পূজাদি সম্পন্ন করি।" ইহা কহিয়া সেই পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান পূজাদি সম্পন্ন করিলেন।

এই স্থলে একটী প্রবাদ আছে। সাধক স্নান পূজাদি সম্পন্ন

করিয়া বিশুকে কহিলেন, "বিশু! কিঞ্চিৎ জল পান করা কর্ত্তব্য, ইহা কহিয়া পুনরায় কহিলেন, তাইত হে! শুধু জল কি করিয়া খাইবে। ঐ আম ও আতা গাছ দেখা যাইতেছে, দেখ দেখি দুই একটা ফল পাওয়া যায় কিনা?" বিশু কহিল, "ঠাকুর! এ যে অগ্রাণ মাস, এখন কি আম পাওয়া যায়!" সাধক কহিলেন, "ভাল দেখই না। জগদম্বার ইচ্ছায় কিনা হয়! তাঁহার ইচ্ছায় শুষ্ক তরু মঞ্জরিতে পারে, ফলা গাছে ফল ফলা কি বিচিত্র কথা!" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আপনার বাক্য কখনও মিথ্যা হবার নয়। আপনি মা কালীর আদরের ছেলে, আপনি অসময়ে ফল চাইলে তিনি আপনাকে ফল দেবেন তার আর বেশী কথা কি! সে দিন ধর্ম্মপুরাণ পড়্‌ছিলাম, দেখলাম লাউ সেনের কথায় সূর্য্যি পশ্চিম দিকে উদয় হয়েছিল। মা চিরকালই ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই কথা বলিয়া বিশু সেই আম্রবৃক্ষ তলে উপস্থিত হইল, ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল কতকগুলি সুপক্ক ফল সুবর্ণকান্তিতে শ্যামল পল্লব মাঝারে, শোভা পাইতেছে। বিশুর হৃদয় বিচলিত হইল, প্রেমের তরঙ্গ ভক্তির উচ্ছ্বাসসহ হৃদয় প্লাবিত করিয়া নয়ন যুগলে উঠিতে লাগিল। বিশু বৃক্ষতলে জানু পাতিয়া ইচ্ছাময়ীর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কহিলেন, "মা! তুমি ভক্তের জন্য না কর কি, ঠাকুরকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিল, "ঠাকুর! তুমিই ধন্য!" ইহা কহিয়া বিশু আম্র বৃক্ষকে নমস্কার পূর্ব্বক বৃক্ষে আরোহণ করিল, নিজ অঞ্চলে ফল গুলি গ্রহণ করিয়া অবরোহণ করিল, বৃক্ষকে পূর্ব্ববৎ নমস্কার

পূর্ব্বক আতা বৃক্ষতলে গমন করিয়া দেখিল কয়েকটা আতা সুপক্ক অবস্থায় শ্যামসুন্দর বদনে শুভ্র দর্শন কান্তির শোভা বিস্তার করিয়া বৃক্ষটীকে পরম রমণীয় করিয়াছে। বিশু আতাগুলিকে গ্রহণ করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে সাধকের নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রেমাশ্রু নয়নে কহিল, "ঠাকুর! লোকে বলে ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভগবান মানুষকে কত ভাবে দেখা দেন, তা মানুষ বুঝতে পারে না। হায় হায়! যার ইচ্ছায় অসময়ে গাছে ফল ধরে, আঁধার রেতে চাঁদ উঠে, নদী পাহাড়, গাছ, পাতা, যার কথা শোনে, সেকি মানুষ? ঠাকুর! তুমি কে? আমাকে বল, তুমি দেবতার মধ্যে কোন দেবতা! না স্বয়ং ভগবান। সূর্য্যি উঠলে আঁধার থাকে না, তোমার দর্শনে পাপ থাকে না।" সাধক একটু হাসিয়া কহিলেন, "বিশু! আমি কিছুই নয়, আমি কমল ঠাকুর, আম গাছটা দুফলা গাছ হইতে পারে, তুমি জাননা অগ্রহায়ণ মাসেও আম পাওয়া যায়।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! মাঠের মাঝে গাছ, গাছের রাখা নাই, রাখালরা এর আম কাঁচাতেই খায়, তারা আম পাকৃতে দেয় না, আমিও রাখালি করেছি, আমি সব জানি ঠাকুর! আমাকে ভোলালে কি আমি ভুলি। বড় লোকের স্বভাব সহজে ধরা ছোঁয়া দেয় না। বিশে আপনার দাস, বিশের মন, বিশের প্রাণ, বিশের দেহ, সব তুমি। সাধক কহিলেন, বিশু! যদি তুমি আমাকে কৃষ্ণ, বিষ্ণু মনে কর। কৃষ্ণ বিষ্ণুর গুণময় ভাবিয়া আমাকে চিন্তা কর তাহা হইলে কৃষ্ণ বিষ্ণু স্বরূপ আমাকেই পাইবে। তাঁহাকে

সগুণ ভাবে যেমন নির্ম্মাণ করিবে তুমি তাঁহাকে সেই ভাবেই পাইবে।" ইহা কহিয়া সাধক কহিলেন, "এস বিশু! ফল গুলি মাকে নিবেদন করিয়া আমরা তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করি। এ সংসার তাঁহার, তাঁহার ফল, তাঁহার জল, তাঁহারি পুষ্প, তথাপি অন্তর্বাসিনীকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য উদরস্থ করা উচিত নহে।" বিশু কহিল, ঠাকুর! আমি দেখতে পাই লোকে ফল ফুল ভাল খাবার নিয়ে দেবস্থানে যায়, দেবতাকে সেই সকল দ্রব্য নিবেদন করে। মা যখন সকলের অন্তরে আছেন তখন তার একটী পৃথক স্থান রাখবার প্রয়োজন কি? আমাদের কালী বাড়ীরই বা কি দরকার?" সাধক কহিলেন, দেখ বিশু! মানুষ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ জীব মাত্রেরই একটী নির্দ্দিষ্ট আবাস আছে। বিশেষতঃ মানুষ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিতে বড় ভাল বাসে, তাই সব নিজ প্রিয়তম উপাস্য দেবতার জন্য মনের মত আবাস নির্ম্মাণ করাইয়া সুখী হয়। যদি তুমি তোমার মা কালীমাকে রূপ, রস, গন্ধ দিয়া মায়ের মত মা ভাবিয়া, হৃদয় মন্দিরে রাখিতে পার, তাহা হইলে তাঁহার তোমার পৃথক আবাস নির্ম্মাণের প্রয়োজন কি! কিন্তু সংসারী লোক অনেক সময় অর্থ চিন্তায় জড়ীভূত থাকেন, তাঁহাদিগকে কিয়ৎক্ষণের জন্য সংসার চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য দেবস্থান ও উপাসনা মন্দিরের প্রয়োজন হয়। দেখ বিশু! মানুষ যখন হাটে, বাজারে কি দোকানে দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য গমন করে, তখন তাহার তত্রস্থ বস্তু সকলের বিষয়ই মনে আইসে। যখন মানুষ

রঙ্গালয়ে গমন করিতে থাকে তখন তাহার রঙ্গালয়ের ভাব মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে। কিন্তু যখন মানুষ দেবালয় কি উপাসনা মন্দিরে যায়, তখন তাহার উপাস্য দেবতা মনোমধ্যে বিরাজ করেন। দেবস্থান ও উপাসনা মন্দিরের সঙ্গী ভক্তি, বিশু! ভক্তি দেবদত্ত সুধা, মানুষ ক্ষণেকের জন্য সেই ভক্তি সুধা পান করিয়া সুখী হয়। যেখানে ভক্তি সেই খানেই ভগবান। দেবস্থান বহু ভক্তিমান ও পুণ্যবান লোকের সমাগমে তীর্থ বলিয়া অভিহিত হয়। দেবস্থানে ও তীর্থস্থানে মনের বিকার থাকে না, মানুষ প্রেমানন্দ অনুভব করে। বিশু এই জন্য দেবস্থান ও উপাসনা মন্দিরের প্রয়োজন। বিশু! এস এখন আমরা এই ফল গুলি মাকে নিবেদন করিয়া দি।" সাধক পুনশ্চ কহিলেন, "তাইত বিশু! মিষ্টান্ন ব্যতীত কেবল ফল গুলি মাকে নিবেদন করিয়া দিতে আমার কেমন মন উঠিতেছে না।" বিশু ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "ঠাকুর! এখানে মিষ্টান্ন কোথায় পাবেন, অথবা আপনার খেলা কে বুঝিবে, এখনি হয় ত বলিবেন, যাও বিশু! দেখ ওই খেজুর গাছে সন্দেশ ফলেছে, ঠাকুর! তোমার মুখের কথাতে না হয় কি? আমি বুঝলাম তুমি কোন গাছে সন্দেশ ফলাবে।" সাধক কহিলেন, "বিশু! তোমার ভ্রম, খেজুর গাছে কি সন্দেশ ধরিতে পারে? আম গাছে আম হয়, খেজুর গাছে খেজুর ধরে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।" এমন সময় বিশু দেখিল দুইজন ভারবাহী মিষ্টান্নের ভারসহ গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া দুলিতে দুলিতে ঘাটের দিকে আসিতেছে। ভারবাহীদিগের সঙ্গে একজন ভদ্রলোক।

সাধকেরও তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বিশু কহিল, "ঠাকুর! কতই রঙ্গ জান, ওই দেখুন দুজন বাঁকীদার বর্দ্ধমানের মিহিদানা, সীতাভোগ, কাঁদে করে আস্‌ছে, একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বন। ঠাকুর! তুমি কি ভক্তিতেই মাকে বেঁধেছ, কি প্রিয় ছেলেই হয়েছ, যখন যা চাচ্ছ, তিনি তাই দিচ্ছেন। ইতি মধ্যে ভারবাহীরা সেই ঘাটে আসিয়া ভার নামাইয়া কহিল, পুকুরটীর বেশ জল, আপনারা কোথায় যাবেন? বিশু কহিল, "জগদম্বা যেখানে নিয়ে যান সেই খানেই যাব।" ভারবাহীরা কহিল, "আপনারা সন্ন্যাসী।" এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ভদ্রলোকটী সাধকের মুখ পানে চাহিয়া জানু পাতিয়া, পাদস্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি এভাবে কোথায় যাইতেছেন? আমি কোটাল হাটে আপনার সঙ্গীত শ্রবণ ও চরণ দর্শন করিয়াছিলাম, আজ আমার সুপ্রভাত, আজ আমি আমার গ্রামের নিকট আপনার দর্শন পাইলাম। এখান হইতে আমার বাড়ী এক ক্রোশ মাত্র। কাল আমার বাৎসরিক মাতৃশ্রাদ্ধ, তদুপলক্ষে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার বাসনা আছে, আপনাকে আমার বাটিতে পদার্পণ করিতে হইবে, আমার অতি বড় সৌভাগ্য, আমার পিতৃ মাতৃ পুণ্যফলে আমার মাতৃশ্রাদ্ধে আপনার গমনে আমি জানিব স্বয়ং শ্রীহরির শুভাগমন হইল, আপনাকে আমার বাসনা পূর্ণ করিতেই হইবে, আপনি আমার গৃহ পবিত্র করিতে স্বীকার না করিলে আমি আপনার পদ যুগল পরিত্যাগ করিব না। সাধক ভদ্র লোকটীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হস্ত ধরিয়া

উঠাইয়া কহিলেন, "আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব। ভদ্র লোকটীর সম্মুখস্থ আম গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আপনারা অসময়ে এ ফলগুলি কোথায় পাইলেন?" বিশু কহিল, "এ ফলগুলি এখানকার নয়। সাধক ইঙ্গিৎ দ্বারা এ বিষয়ে আর অধিক আন্দোলন করিতে নিষেধ করিলেন। ভদ্র লোকটী কহিলেন, "আপনারা বর্দ্ধমান রাজবাটি হইতে আসিতেছেন মহারাজা বাহাদুরের বাগানে অনেক তুফলা গাছ আছে।" ইহা কহিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, স্নানাহারের সময় উপস্থিত, দেখিতেছি আপনাদের স্নান হইয়াছে, অধীনের প্রতি দয়া করিয়া আপনারা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। মিষ্টান্ন গুলি শুদ্ধাচারে প্রস্তুত হইয়াছে। দেবতুল্য যোগী সন্ন্যাসী এই সকল মিষ্টান্ন প্রথমে গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।" ইহা কহিয়া ব্রাহ্মণ কতকগুলি মিষ্টান্ন বাহির করিয়া সাধকের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সাধক ব্রাহ্মণের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আপনারাও অবগাহন করুন, আমরা সকলে জগদম্বার প্রসাদ গ্রহণ করিব।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মিষ্টান্ন গুলি একটি শালপাত্রে ফলগুলির নিকট রাখিয়া স্নান পূজাদি সমাধা পূর্ব্বক সাধকের নিকট উপস্থিত হইলেন। সাধক ফল ও মিষ্টান্ন জগদম্বাকে নিবেদন করিয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণ ও স্বয়ং কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ফল আস্বাদন করিয়া কহিলেন, "দেব! আমি বোম্বাই, ন্যাংড়া, ফজলী, রাঢ়ী অপেক্ষা এই ফল গুলির মধুরত্ব অধিকতর অনুভব করিতেছি, আহা! ইহা কি স্বর্গের

সুধা? দেব! আপনার প্রসাদে আজ অমৃত আস্বাদন করিলাম। অতঃপর সকলে জল পান করিয়া স্নান ঘাটে উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ সাধককে তাঁহার গৃহ পবিত্র করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাধক পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকারে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিশুর সহিত ব্রাহ্মণের গৃহে গমন পূর্ব্বক একরাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া অমরার গড় গমন করিলেন।

সাধক বিশুর সহিত অমরার গড়ে কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে আগমন করিলেন। কেনারাম ও তাঁহার পরিবার বর্গের আনন্দের সীমা রহিল না। গ্রামবাসীরা তাঁহার পুনর্ব্বার দর্শন লালসায় দলে দলে আগমন পূর্ব্বক সাধকের চরণ স্পর্শ করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সাধক প্রসন্নবদনে পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের সহিত আলাপ ও পরিচয় করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। এক্ষণে সাধক মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর কর্ত্তৃক পূজিত হওয়াতে কেনারামের কালীগৃহে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের সমাগম হইতে লাগিল। কেনারাম সাধককে বর্দ্ধমান হইতে আগমনে পথের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে বিশু আম্র ও মিষ্টান্ন প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়াছিল। এক্ষণে যেখানে সেখানে সাধকের সেই অসাধারণ শক্তির গল্প হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—অমরার গড় রাজধানী ছিল। রাজা মহেন্দ্র রায় এই নগরের অধিপতি ছিলেন। তিনি নিজ ভুজবলে ও তাঁহার গুরু শিবরাম স্বামীর প্রসাদে তৎকালীন বঙ্গের রাজা

সুদর্শনকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। মহাত্মা শিবরাম স্বামীর দেহান্তে তাঁহার সমাধির উপর করাল-বদনা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, রাজা মহেন্দ্র তাঁহার গুরু শিবরাম স্বামীর নির্দ্দিষ্ট সমাধির পার্শ্বস্থিত আসনে বসিয়া যোগ সাধনা পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই করাল বদনা মূর্ত্তির নাম সিদ্ধেশ্বরী! ইহাও প্রবাদ আছে, রাজা মহেন্দ্রের পর অনেকে সেই সিদ্ধাসনে যোগ-সাধনা করিয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিবরাম ভট্টাচার্য্য, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, বৈদ্যনাথ সেন গুপ্ত, কেণারাম চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অমানুষিক কর্ম্ম সমন্ধে মানকর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে নানাপ্রকার জনশ্রুতি আছে। মহাত্মা শিবরাম ভট্টাচার্য্যের একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে নিরক্ষর ছিলেন, কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু উপবীত ধারণের পর হইতে শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। যৌবনে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য উদয় হয়। দার পরিগ্রহ না করিয়া তিনি কঠোর যোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। তিনি অল্পদিন মধ্যে যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন, যোগবলে এক মূর্ত্তিতে এক সময়ে নানা স্থানে বিচরণ করিতে পারিতেন, ইচ্ছা ভোজন করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার জননী ভিন্ন সংসারে অন্য কেহই ছিল না। তিনি একদা জননীর চরণ প্রান্তে বসিয়া কহিলেন, "মা! বিশ্বজননীর সংসার দেখিবার আমার বাসনা হইতেছে। আপনি আমাকে তীর্থ গমনে

অনুমতি দেন। আপনার অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে আমি নিশ্চয় আপনার চরণ দর্শন করিব। আপনাকে গঙ্গাতীরে অন্তর্জলী করিব।" পুণ্যস্বভাবা জননী পুত্রকে সত্যবাক্ বলিয়া জানিতেন। তিনি পুত্রকে তীর্থ পর্য্যটনে অনুমতি দিলেন। কথিত আছে, তিনি জননীর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎকালে জননীর অসুখ ছিল না। শিবরাম গৃহে আসিয়া কহিলেন "মা! আপনার গঙ্গাপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত। আপনি আমার সহিত মোক্ষদার তীরে চলুন। ইহা বলিয়া তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামবাসীদিগকে ইচ্ছা ভোজন করাইয়া পদব্রজে জননীর সহিত গঙ্গাতীরে গমন করেন। গঙ্গাতীরে তিন রাত্রি মাত্র অবস্থানের পর জননীর সাঙ্ঘাতিক পীড়া উপস্থিত হয়, তিনি তাঁহাকে অন্তর্জলী করেন ও জননীর শব দেহের সৎকার করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। কথিত আছে, তদবধি তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিছু দিন পরে সংবাদ পত্রে বদরিকা আশ্রমের প্রবন্ধ উপলক্ষে তাঁহার নাম ও অসাধারণ ক্ষমতার উল্লেখ হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, কেনারাম চট্টোপাধ্যায় সাধক কমলাকান্ত নির্দ্দিষ্ট দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরস্থ সিদ্ধাসনে বসিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

দেবী সিদ্ধেশ্বরীর পূর্ব্বতম মন্দির অনেক দিন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মন্দিরটী তাহার পরবর্ত্তী, বোধ হয় স্থানীয় লোকের চেষ্টায় গঠিত হইয়া থাকিবে, ইহাও এখন বিনষ্ট প্রায়। এখন এই স্থানটী জঙ্গলে পরিণত হইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে এই সিদ্ধ পিঠ স্থানে অনেক যোগী সন্ন্যাসী সমাগত হইতেন। দেবীর

মন্দির লোকালয়ের অনতিদূরে অবস্থিত। চারিদিকে শস্য ক্ষেত্র, পার্শ্বে শ্মশান ও একটি কেদার বাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী।

"এবার অমরার গড়ে অবস্থান কালে একদা সাধক কমলাকান্ত ভক্তবৃন্দের সহিত দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে গমন করিলেন। বেলা অবসান প্রায়। দিবসপতি জ্যোতি জাল সঙ্কীর্ণ করিয়া ঘোর লোহিত চক্রের রূপধারণ পূর্ব্বক অদৃশ্য হইতেছেন। লোহিত রেখা জাল নভস্তল ও প্রকৃতি পুঞ্জের মুখ মণ্ডলে পতিত হইয়া লোহিত বর্ণের ছবির অভিনয় খুলিয়াছে। শীত ঋতুর প্রথম মাস। শিশির সেবিত স্নিগ্ধ সমীরণ রবিশস্য সকলকে ধীরে ধীরে চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সাধক অনুগামীগণের সহিত দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক দেবীরদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মানুষ যাহার বিষয় চিন্তা করে, যাহার মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করে, তাহার দর্শন পাইলে যেমন আনন্দে বিভোর হয়, দেবীর দর্শনে সাধকেরও সেই ভাব হইল। তিনি উচ্চস্বরে গাহিলেন—

শঙ্কর উরে বিহরে শ্যামা রঙ্গিণী।
সৌদামিনী সহিত, সুধাংশু মিলিত,
নীল কাদম্বিনী ॥
(মা আমার) না বাঁধে চিকুর, না পরে বাস, ও বিধু বদনে মধুর হাস,
চিন্তামণি নিলয়ে প্রকাশ, সশিব শিব সিমন্তিনী,
তারণ কারণ, চরণ মন্ত্র, যে জন না জানে সে জন ভ্রান্ত,
নিতান্ত শান্ত করে কৃতান্ত, কমলাকান্ত বন্দিনী ॥

সঙ্গীত শেষে সকলেই প্রফুল্ল নয়নে বিমলার মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেনারাম অন্য অনুগামী দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাইরে আমাদের ঠাকুরের প্রত্যেক বাক্যই ভক্তিপ্রদ, সারগর্ভ, রমণীয়।" রঙ্গিনী শঙ্করের উপরে চরণ বিন্যাস করিয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছেন। নীল কাদম্বিনীর মধ্যে সুধাংশু ও বিদ্যুতের অপূর্ব্ব সন্নিবেশ। মায়ের চরণের রুধির ধারা বিদ্যুতের শোভা ধারণ করিয়াছে। সুধাংশু সম শব শিব কাল চরণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। মায়ের একি ভাব। এলোকেশ, দিগ্বসন, চারুদশনে অট্টহাস। ভাইরে! তোমরা মাকে আমার পাগলিনী ভাবিও না। একবার ধ্যানস্থ হইয়া চিন্তামণি পুরে মাকে দেখ, সৃজন পালন লয় কারণ শক্তি অভেদরূপে বিরাজ করিতেছেন। ভাইরে মায়ের এই চরণ ভব তারণ মন্ত্র, শমন ভয় নিবারণের একমাত্র উপায়। ইহা কহিয়া কেনারাম পুনশ্চ কহিলেন, "আজ আমরা পরম পবিত্র স্থানে আগমন করিয়াছি। মহাত্মা শিবরাম স্বামীর সমাধির উপর এই সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে, যে স্থানে স্বামীর বামপদ স্থাপিত হইয়াছিল সেই স্থানে সিদ্ধাসন আছে। তথায় সপ্তরাত্রি নিরাপদে সাধনা করিতে পারিলে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না। পঞ্চ রাত্রির জপে শিব লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিরাপদে একরাত্রি জপ করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ হয়। সংযম ও সাধনাহীন ব্যক্তি ঐ আসনে উপবেশন করিলে তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না, মহাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। সাধক কহিলেন, "মহাত্মারা পর হিতার্থেই

জীবন ধারণ করিয়া থাকেন।" যে ব্যক্তি নিজ উপার্জ্জিত সম্পত্তি কেবল মাত্র নিজ ভোগ সুখে ব্যয় করেন তিনিই বঞ্চিত হন। যে ব্যক্তি বহু পরিশ্রমে লব্ধ সম্পত্তি পরোপকারে ব্যয় করেন সেই সম্পত্তিই তাহার মোক্ষ পথের সম্বল হইয়া থাকে। সাংসারিকগণ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পান্থশালা নির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা পুণ্য উপার্জ্জন করেন। যোগী, সাধকগণ স্বোপার্জ্জিত পুণ্য অক্ষয় ভাবে সংসারে দান করিয়া থাকেন; কেহ তপদ্বারা সিদ্ধ মন্ত্রের সৃষ্টি, কেহ রোগ নিবারণের ঔষধ আবিষ্কার, কেহবা উপদেশ দ্বারা বিপথগামী মানবকে স্বধর্ম্মে স্থাপন, কেহবা স্থান বিশেষকে পরম পবিত্র করিয়া রক্ত মাংসময় মানব দেহ ধারণের স্বার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক ইহধাম পরিত্যাগ করেন। পিপাসু মানব যেমন দিব্য সরোবর দেখিয়া আহ্লাদিত হয়, শোক দুঃখ পীড়িত মানব এই স্থানে আসিয়া সর্ব্বসন্তাপ হারিণী জগদম্বার ঐ রাঙ্গাচরণ দুটি নিরীক্ষণ করিয়া সেইরূপ আনন্দিত হন। দেখ স্থানটী অতি নির্জ্জন, সাধনার উপযুক্ত। নানা তীর্থ পর্য্যটন অপেক্ষা এই পবিত্র স্থানে সাধনায় অধিক ফল লাভ হইতে পারে। ইহা কহিয়া সাধক আবার গাহিলেন,—

কেন! অকারণ কিসের চিন্তা কর মন।।
তুমি সাধিলে সাধিতে পার শিবের সাধের ধন॥
এস না বিরলে বসি, ভাবি শ্যামা মুক্তকেশী,
গয়া গঙ্গা বারাণসী, মায়ের শ্রীচরণ॥

ভাবিলে ভবানী ভবে, ভবের যাতনা যাবে,
তোর পাপ পুণ্য কোথা রবে, শমনের দমন।
কমলা কান্তের আশা, নাম ব্রহ্ম কর্ম্ম নাশা,
সে তো কঠিন নয়, কেবল মুখের ভাষা, সুসাধ্য সাধন॥

সঙ্গীত শেষে কেনারাম কহিলেন, 'ঠাকুর! কালীনাম মহামন্ত্র সাধনা অনায়াস সাধ্য আপনার একথা বেশ বুঝিতে পারিলাম না। আপনিই বলেন, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত মানব সাধনায় শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না, চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন।" সাধক মৃদু হাস্যে কহিলেন, "চিত্তশুদ্ধি ও অকস্মাৎ বৈরাগ্য জন্মান্তর সুকৃতিসাধ্য লৌহকে পোড়াইবা মাত্র তাহার ময়লা দূর হয়।" মনকে কর্ম্ম কাণ্ডে সত্বর বিশুদ্ধ করা যায়না। কিন্তু লৌহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা কর্ষণ করিলেও তাহার ময়লা দূর হইতে পারে। নাম জপিতে জপিতে চিত্ত ক্রমে প্রসন্ন হয়, উদার ভাব আইসে, সংসার হইতে ক্রমে ক্রমে মনকে পৃথক করা যায়। নাম সাধনা তাদৃশ কষ্ট সাধ্য নয়। সংসারী সহজেই সেই সাধনার পক্ষপাতী হয়। নাম গ্রহণের উপদেশ সর্ব্বত্র ফলবান না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সমাজ কি ধর্ম্মের গ্লানির সম্ভাবনা নাই, নাম গ্রহণে অকৃত কার্য্যে আত্ম বঞ্চনা আছে মাত্র। সুকৃতি বল, প্রকৃতি বিশেষে, সেই মহামন্ত্র ফলবান হয়। দেখ বৃক্ষের বীজ নানা স্থানে পতিত হয়, কিন্তু মৃত্তিকা বিশেষে দুই চারিটীর অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, দুইচারিটী বৃক্ষ হইয়া ফল পুষ্পে সুশোভিত হয়। কাহার অঙ্কুর হইবে, কাহার

না হইবে, এ কথা প্রকৃতি ভিন্ন কেহই বলিতে পারেন না। বহু বালক বিদ্যালয়ে যায়, শিক্ষক সকলকেই উপদেশ দেন কিন্তু সকলেই কি পণ্ডিত হইয়া থাকে। জয় কালী বলিয়া সর্ব্বত্রই নাম মহামন্ত্র ছড়াইবে, মৃত্তিকার বিচার করিও না। পুরুষের প্রকৃতি, স্বভাব, কর্ম্মের কাঠিন্য বিবেচনা করিয়া তান্ত্রিক কর্ম্ম কাণ্ডে নিয়োগ করা উচিত। কর্ম্ম কাণ্ডে অধিকারী নির্ব্বাচন করা কঠিন। অপাত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও তৎকর্ত্তৃক সেই কর্ম্ম অবিধিরূপে সম্পাদিত হইলে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত ইহবার সম্ভাবনা। কিন্তু কালী নাম মহামন্ত্র স্থাপনের পাত্রাপাত্র নাই। অপাত্রে পতিত হইলে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, তাই কালী নাম মহামন্ত্র সুসাধ্য সাধনা। ইহা শুনিয়া কেনারাম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর! এই স্থানে বসিয়া সাধনা করিবার আমার বড় বাসনা হয়। আমি অতি অধম, সংযম, সাধনা হীন। সিদ্ধাসনের নির্দ্দেশ আপনার কৃপা ভিন্ন হওয়া অসম্ভব। যোগ বিঘ্ন ভয়ে এই স্থানে সাধনা করিতে আমার সাহস হয় না। সাধক কহিলেন, "আপনার সন্দেহ সুসার নহে। তান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা দেহ বন্ধন পুর্ব্বক চিন্ময়ীর চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিবেন, আপনার কোন বিঘ্ন হইবে না।" এই কথা শুনিয়া কেনারাম সাধকের চরণ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আমার উদ্ধারের ভার আপনাকেই লইতে হইবে। অদ্য অমাবস্যা, দেব, সিদ্ধপুরুষ, ভূত, প্রেত, পিশাচগণের সন্তোষ সাধনের দিন। আমার ইচ্ছা অদ্যই আমরা নিশীথ সময়ে এই স্থানে আগমন

করিব। সাধক কহিলেন, "তাহাই হইবে।" ওই দেখ দিব-সপতি অদৃশ্য হইয়াছেন। ম্লানমুখী সন্ধ্যা সমাগত। বিহঙ্গমগণ তরুশিরোপরি বসিয়া অংশুমালীর অদৃশ্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া কলরব করিতেছে।"

এমন সময় পুরোহিত ব্রাহ্মণ আসিয়া দেবীর সন্ধ্যা বন্দন ও আরতি আরম্ভ করিলেন। ঘণ্টা ও কাঁসর শব্দ দেবীর মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ শস্য ক্ষেত্র সকলকে মুখরিত করিতে লাগিল। সাধক ও অন্যান্য সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। আরতি শেষে সাধকের সহিত সকলে করযোড়ে গাহিতে লাগিলেন,—

শঙ্করি শিবে শ্যামে ভীমে উমে ভবানি!
বরদে সারদে আশু হররাণি!
দুঃখ হর, ভয় হর, রিপু হর, স্মর হর, মন মোহিনি!
চরাচর নাগ নর সুর পালিনি!
ভবে অম্বিকে, অনুগত সুত বিহিত কারিণি!
মৃত্যুঞ্জয় হৃদয় চারিণি! শরণাগত কলুষ নাশিনি!
কমলাকান্ত হৃদয় বিহারিণি!

সঙ্গীত শেষে সকলে দেবীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া সাধকের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অমানিশা, ঘোর অন্ধকার, নিজের অঙ্গ পর্য্যন্ত সুন্দর দৃষ্ট হইতেছে না; দিবসের দৃশ্য স্মরণ করিয়া প্রকৃতি পুঞ্জের অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়। শীতকাল, আকাশ নির্ম্মল নহে, কিঞ্চিৎ

ঘন ঘটার আবির্ভাব হইয়াছে। দুই একটী নক্ষত্র মেঘের কোলে ম্লান মুখে দৃষ্ট হইতেছে, লোকালয় নীরব। মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষী, শিবা ও সারমেয় গণের শব্দ শ্রুত হইতেছে, তাহাও কঁচিৎ। সাধক, কেনারাম ও বিশু দেবীসিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে জপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কেনারাম কহিলেন, "নিবিড় অন্ধকার, দীপ ভিন্ন দেবীর মন্দিরে গমনে আপনার বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা।" সাধক কহিলেন, "দেখুন, ধর্ম্মকর্ম্ম অতি গোপনে করিতে হয়, দীপ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা অন্ধকারেই গমন করিব ও যথাসাধ্য সমুদয় কর্ম্ম গোপন রাখিব।" বিশু কহিল, "আমরা দেবীর মন্দিরে জপ কর্ব্বার কথা সকলের কাছে বলেছি, আজকার ব্যাপার কিছু গোপন কর্ত্তে পার্ব্বেন না। ঠাকুর! এ অন্ধকারে যেতে পার্ব্বেন না, আমি ঠাকুরকে কাঁদে করে নিয়ে যাব।" সাধক কহিলেন, "বিশু! যখন তখন তুমি ঐ কথাই বল, আমাকে কাঁদে করিয়া লইয়া বেড়াইতে তোমার বড় আনন্দ হয়।" বিশু করযোড়ে কহিলেন, "ঠাকুর এ কথা ঠিক! অপনার পা দুখানি আমি বুকের মাঝে ধল্লে আমার বুক ঠাণ্ডা হয়। পাপে আমার পাঁজর পোড়া, আপনার পায়ের এমনি গুণ, একবার বুকে ছোঁয়ালে সব জ্বালা যায়, তাই অনেক দিন সময় সময় আপনার পা টিপ্‌বার জন্য আমি ব্যাকুল হই" কেনারাম কহিলেন, "আল পথ, অন্ধকার রাত্রি, ঠাকুরকে কাঁদে করিয়া যাওয়া হইবে না, তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা, হাত পা ভাঙ্গিতে পারে।" ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন, "তাহা হইলে

বিশুর ভালই হয়। সর্ব্বদা আমাকে কাঁদে করিয়া লইয়া বেড়ায়, কোলে পিঠে করা ভালবাসার লক্ষণ, বিশু নিজের ছোট ছোট ছেলেদিগকে কোলে পিঠে করিয়া বেড়াইত, এখন তাহার সেই ভালবাসা আমার উপর পড়িয়াছে। দেখ বিশু, তুমি আমা অপেক্ষা তোমার মা কালীকে ভাল বাসিবে, তাঁহাকে বুকের মাঝে সর্ব্বদা রাখিয়া সব জ্বালা ভুলিবে।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! চাষা নিজের প্রাণ চেয়ে আবাদ করা ফসল গুলিকে ভাল বাসে, আবার দেখুন, যার সাহায্যে ফসল হয়, সেই বলদ গুলিকেও বড় ভালবাসে; ভাল করে খাওয়ায়, গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। আপনার দয়া না হলে কি আমার এ ভাব হত। আমি মানুষ মেরে বেড়াতাম! সাধক মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "শুন হে আমি বিশুর বলদ, বিশু এবার আমাকে তাহার চাষের কার্য্যে নিযুক্ত করিবে।" বিশু করযোড়ে ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, "ঠাকুর আমার অন্তর জমীতে অনেক ঘাস পাতা জন্মেছিল, তোমার তীক্ষ্ণ কথা কোদাল সে সব তুলে ফেলে দিয়ে কালী নাম বীজ পুতে দিয়েছে। এখন তোমার দয়া হলেই সে বীজে গাছ হবে, ফলও ধর্ব্বে।" কেনারাম কহিলেন, "বিশু উত্তম কথা বলিয়াছেন। আমি দিন দিন বিশুর বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। হীরক প্রস্তরও কয়লার সহিত থাকে। জহুরীর হস্তে পড়িলেই তাহার স্বরূপত্ব প্রকাশ হয়। আপনার নিকট আসিয়া বিশুর অন্তরের উজ্জ্বলত্ব দিন দিন বিকাশ হইতেছে।" সাধক কহিলেন, "যামিনীর প্রথম যাম অতীত হইয়াছে, আর এখানে অবস্থান করিয়া

বৃথা সময় অতি বাহিত করা উচিত নহে। চল আমরা নিঃশব্দে দেবীর মন্দিরে গমন করি!" ইহা কহিয়া সাধক বিশু ও কেনারামের সহিত দেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দেবীর মন্দিরে মধ্যে মধ্যে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া অবস্থান করিতেন। নিত্য কোন ব্যক্তিই তথায় অবস্থান করিতেন না। মন্দিরটি গ্রামের প্রান্তভাগে অতি নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত, নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা বৃন্তে পরিবৃত। প্রবাদ আছে, সাধক কেনারাম ও বিশু দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবা-মাত্র সিংহ গর্জ্জনের ন্যায় মন্দির মধ্য হইতে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। কেনারাম ও বিশু মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। নির্ভীক হৃদয় সাধক দণ্ডায়মান থাকিয়া করজোড়ে কহিলেন, "ভীমা! ভয়ঙ্করী! শরণাগত কিঙ্করে অভয় দান কর" ইহা কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন,—

এলে বুঝি দয়াময়ী হইয়া কঠিন,
চরণে ত্যজিব তনু আজি শুভ দিন।
তনু দিয়া তরে কত শত ক্রিয়াহীন॥

ইহা কহিয়া দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মা জীবের পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই, কিন্তু তুমি ত জান তোমার কিঙ্কর মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয় করে না, তুমিই মৃত্যু। মা তুমি প্রসন্ন নয়নে চাও, মা! তুমি অভয়া বরদা, তুমি বিশ্বজননী, জননী কি সন্তানকে এতাদৃশ ভয় দেখান। নিশ্চয়ই ইহা কোন বিঘ্ন কারক জীবের কর্ম্ম। আমি বলিতেছি, আমি বিন-

য়ের সহিত বলিতেছি—"অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা বিঘ্ন কারকা।" কে তুমি পরিচয় দাও, তুমি যখন এই পবিত্র স্থান আশ্রয় করিয়া আছ, তখন তোমার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না, তাই তোমাকে পুনর্ব্বার বিনয়ের সহিত কহিতেছি, শান্তিভাব অবলম্বন কর, আমাদিগকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও। যদি তুমি শান্তিভাব অবলম্বন না কর, এই আমি কালী নামের ডঙ্কা দিয়া মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে চলিলাম, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে আমাকে বাধা দাও।" এই বলিয়া সাধক দেবীর মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র আকাশ বাণী হইল, "কমল! আমি তোমার সাহসে সুখী হইয়াছি। আমি জানি তুমি শৈশব হইতে নির্ভীক। তুমি বিশুদ্ধ আত্মা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। জন্মান্তরে তোমার তপস্যাও বিস্তর।" অশরীরীর এই কথা শুনিয়া সাধক উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কে তুমি? তুমি কি আমার সাহায্যার্থে দেবীর ইচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছ? তুমি কি কোন দেবতা? না এই পবিত্র স্থান রক্ষক অশরীরী আত্মা? মহাকাল ভৈরবের আজ্ঞানুবর্ত্তী। কে তুমি? কৃপা করিয়া আমায় পরিচয় দাও। তুমি যখন এই পবিত্র স্থান অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছ তখন তোমাকে কোন বিঘ্ন কারক আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।" অশরীরী কহিলেন, "কমল! আমি তোমার মন্ত্রদাতা গুরু। কমল! অম্বিকার নিকট সেই ক্ষুদ্র তটিনী, তাহার তীরবর্ত্তী সেই শ্মশান, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ, তোমার বৃক্ষতলে গমন,

তোমার শ্মশানের দিকে দৃষ্টি, কাপালিক বেশী আমার দর্শন, তোমার কর্ণে আমার মন্ত্র প্রদান, তোমার স্মরণ হইতেছে!" অশরীরীর এই কথা শুনিবা মাত্র সাধক রোমাঞ্চিত হইয়া কহিলেন, "কি! আপনি আমার গুরু! সেই মন্ত্র দাতা, সেই পরম সুহৃদ, সেই জীবন সর্ব্বস্ব। তবে কেন সন্তানকে বঞ্চনা করিতেছেন। সেই জটাজুট শিরে, শশীকলা সদৃশ ত্রিপুণ্ড্র কপালে, স্মেরাননে, হাড়মালা গলে, নর-কপাল করে দ্বীপী চর্ম্ম পরিধানে, ভস্মরঞ্জিত দেহে, সেই বেশে একবার আমার সম্মুখে উপস্থিত হউন। আমি পুনর্ব্বার আপনার সেই মনোমোহন রূপ দর্শন করিয়া জীবন শীতল করি, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি, চরণ স্পর্শ করিয়া পবিত্র হই, প্রাণের কথা বলিয়া প্রাণ জুড়াই। প্রভো! গুরো! স্বামিন! সে আজ কতদিন। আমি আশৈশব সেই মূর্ত্তি স্মরণ, সেই মন্ত্র ধ্যান করিয়া জীবনে পরমাশান্তি লাভ করিতেছি। যদি আপনি আমার সেই অমূল্য নিধি, তবে একবার সেই বেশে আমার সম্মুখে আসুন। চিরানুগত কিঙ্করকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করুন।" অশরীরী কহিলেন, "আমি পূর্ব্বে যে বেশে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলাম, এখন সেই রক্ত মাংসময় দেহে তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি।" সেই মহাজ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কাপালিক বেশে প্রসন্ন বদনে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সাধক দেখিবা মাত্র প্রেম ও ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে চরণ ধরিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূমে পতিত হইলেন, তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কাপালিক বেশী কহিলেন, "কমল! উঠ।" সাধক

উঠিলেন, জানু পাতিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "দেব! আপনি কে? আপনি কোন স্থান পবিত্র করিতেছেন। আমার স্মরণ আছে, আপনি বলিয়াছিলেন, আপনি আমার সহিত সময়ে সাক্ষাৎ করিবেন। আজ ত্রিশ বৎসরের অধিককাল পরে আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম। কাপালিক কহিলেন, "কমল! আমাকে দিক্‌পাল বলিয়া জানিবে, প্রকৃতির ইচ্ছায় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হেতু তোমাকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলাম। শোন বৎস! তুমিও দেহান্তে আমাদিগের ন্যায় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবে। তোমার জন্মগ্রহণে বিশেষত্ব আছে। সকল ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ প্রকৃতির ইচ্ছায় হইয়া থাকে। তান্ত্রিক ক্রিয়া সকলে ব্যভিচার উৎপন্ন হইলে অনেকে সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে লাগিল। সেই সময় অলৌকিক ক্ষমতা লইয়া শ্রীচৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র মুক্তির উপায় এই উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই সহজ পথ সাধারণ সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য পথাবলম্বী সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মের শাখারূপে গৃহীত হইল। বঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইল। পরে শ্রীচৈতন্য দেব প্রসূত ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইলে বেদধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নামও ক্রিয়া উভয়েই মুক্তির সোপান এই উপদেশ প্রচারার্থ প্রকৃতির ইচ্ছায় সঙ্গীত দ্বারা চিত্ত বিমোহনের শক্তি লইয়া রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার দেহান্তে মাতৃভাবের উপাসনার স্রোত অপ্রতিহত রাখিবার জন্য মহামায়ার ইচ্ছায়

তুমিও জন্মগ্রহণ করিয়াছ। বৎস! নিজ কর্ম্ম সম্পন্ন কর। লোক শিক্ষাই তোমার কর্ম্ম। সঙ্গীত দ্বারা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই বিমোহিত হয়। সঙ্গীত উপাসনায় একাগ্রতা সহজে আইসে, সেই জন্য সঙ্গীত দ্বারা চিত্ত বিনোদনের শক্তি লইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি যোগী, তোমার চিত্তশুদ্ধি আছে, তোমার ক্রিয়া কলাপের কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। তোমার মন কর্ম্মকাণ্ডের বহির্ভূত হইয়াছে। এই স্থানে সিদ্ধাসনে বসিয়া জপ করিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি নিজ কর্ত্তব্য সাধন জন্য গমন কর। কাপালিকের এই কথা শুনিয়া সাধক কহিলেন, "আপনার বাক্যই এই দুর্গম সংসারারণ্য অতিক্রম করিবার মহা অস্ত্র। মায়া মোহ প্রভৃতি কণ্টক জাল ছেদনের তীক্ষ্ণ তরবার। কাম ক্রোধাদি হিংস্র জন্তুগণকে বিতাড়িত করিবার বজ্রবাণ স্বরূপ। আমি শৈশব কাল হইতে আপনার বাক্য জপ ও আপনার মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকি। আমি স্থান বিচার, কাল বিচার, লোক বিচার, না করিয়া মহামায়ার গুণগান পূর্ব্বক ত্রিতাপ তাপিত তনুকে শীতল করি। আমি সর্ব্বদা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী। আমি এই স্থানে জপ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলাম। দেব আমার অনুগামী এই দুই জন আমার প্রিয়। উঁহারা পরম উৎসাহে অদ্য এখানে আসিয়াছেন, অকৃতকার্য্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে ক্ষুন্ন হইবেন। অতএব দেব! জিজ্ঞাসা করি, অনুগামী কেণারাম ও বিশু অত্রস্থ যোগাসনে বসিবার

উপযুক্ত কিনা?” অশরীরী কহিলেন “কেণারাম সংযমী ও সাধক, তিনি অত্রস্থ যোগাসনে বসিবার উপযুক্ত, কিন্তু বিশুর এখনও চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। শবসাধনা দ্বারা তাহার চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। শিবরাম স্বামীর সমাধির বামপদ সন্নিকটে সিদ্ধাসন আছে। দেবীর যেখানে দক্ষিণ পদ স্থাপিত হইয়াছে, তুমি সেই স্থান সমাধির কেন্দ্র ধরিয়া সিদ্ধাসন নির্দ্দেশ করিবে। অদ্য অমানিশি, কেনারামকে যোগাসন নির্দ্দেশ করিয়া জপ করিতে দাও, বিশুর শ্মশান সাধনা অভ্যাস করা উচিত। দেবীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী শ্মশানে তাহাকে জপ করিতে শিক্ষা দাও। বিশু ও কেণারাম জন্মান্তরে ধর্ম্মরাজ্যে জগতের অনেক হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইবেন।” ইহা কহিয়া কাপালিকবেশী অদৃশ্য হইলেন। সাধক আকুল হৃদয়ে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া গলদশ্রু নয়নে সাষ্টাঙ্গে অদৃশ্য গুরুর চরণে প্রণাম করিলেন। দেবীর মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া করযোড়ে ব্যাকুল নয়নে দেবীর পানে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “ইচ্ছাময়ী! অতি শরণাগত কিঙ্করকে লইয়া কতই খেলা করিতেছ? কখনও ব্যাধের হস্তে পাতিত করিয়া জীবনের ভয় দেখাইতেছ, কখনও ঐশ্বর্য্য সম্পদ সমাকীর্ণ রাজসভায় লইয়া রাজরাজেশ্বরী বেশে মৃদু মধু হাস্য করিতেছ, কখনও বা অলোক-সামান্য-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন স্বর্গ দূতের সহিত সমাগমে আমার হৃদয়াশ্রিত বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করিতেছ। মা! আর কতদিন এই ভাবে রাখিবে।” এই বলিয়া সাধক সেই নিশীথ সময়ে দেবীর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন,—

মানব দেহ পেয়ে ছিলাম ভবে, তোমার তনু তোমারে সঁপিলাম,
যা কর জননী আমি অবসর লইলাম।
অনিত্য সংসার সুখ, তাহে হইলাম বৈমুখ
মান, অপমান, দুঃখ দূরে তেয়াগিলাম॥
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর,
ভাবিয়া চরণাম্বুজে শরণ লইলাম॥

অমৃত তুল্য সঙ্গীত স্বরে কেণারাম ও বিশু গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, সাধক দেবীর সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান। নয়নে প্রেম-বারি। তাঁহারা বিভীষিকা দর্শনে হৃতসংজ্ঞ হওয়াতে লজ্জিত হইয়া এখন সাধকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সাধক তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আপনারা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়া ছিলেন, এত গভীর রাত্রে নিদ্রা না গিয়া থাকা যায় না, আপনাদের এত শীঘ্র নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সুখী হইলাম।" কেণারাম সাধকের কৌতুক বাক্য বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "দেব! শত বজ্রনাদসম সিংহগর্জ্জন শুনিয়া আমরা মূর্চ্ছিত হইয়া ছিলাম, আমাদের সুকৃতি নাই, আমাদের হৃদয় মোহ কণ্টকাকীর্ণ বনভূমি, সেই সিংহনাদে কম্পিত হইয়াছিল। মহামায়ার প্রভাজালে আপনার হৃদয় আকাশ শারদীয় পৌর্ণমাসীর ন্যায় নির্ম্মল। আপনার কর্ণে সেই বজ্রনাদ পটহ শব্দের ন্যায় অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু আমি পরক্ষণেই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলাম, মস্তক ঘূর্ণন হেতু আমার উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছিল, আপনি কাহার সহিত এতক্ষণ কথোপকথন

করিতেছিলেন। আপনাদের বাক্য সকল আমার কর্ণগোচর হইলেও আমি মস্তক উত্তোলন করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার দর্শন লাভে সক্ষম হই নাই, আপনি তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিতে ছিলেন, ঠাকুর। তিনি কে? আমাকে বলিয়া কৃতার্থ করুন।" বিশু কহিলেন, "আমিও তার কতক কতক কথা শুনেছি, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম।" সাধক কহিলেন, "তিনি কোন মহাপুরুষ, তিনি আমাকে শৈশবে দীক্ষা দিয়াছিলেন। এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, আর কালক্ষেপ উচিত নহে, আমরা যে কার্য্যের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আমাদের ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা কহিয়া সাধক কেণারামকে কহিলেন, "ঐ শিবরাম স্বগীর সিদ্ধাসন, আপনি নির্ভয়ে জগদম্বার চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ঐ আসনে বসিয়া ধ্যানস্থ হউন। আপনার পূর্ব্ব তপস্যাবলে, সংযম ও অভ্যাস হেতু আপনি নিরাপদে জপ সমাধা করিতে পারিবেন। সাধক বিশুকে কহিলেন, "তুমি আমার সহিত আইস, আমি তোমার জপের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছি।" ইহা কহিয়া সাধক বিশুর সহিত দেবীর মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সাধক বিশুর সহিত বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "বিশু! তুমি কি নীল নভস্তলনয়না, নক্ষত্র দশনা, লতা-পাদপ বসনা, ভয়ঙ্করী অমানিশি দর্শন করিতেছ, কিম্বা নবশির মালিনী নিবীড় নিতম্বিনী, শব শিরারোহিনী জলদ বরীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতেছ? তুমি জান না, মা আমার জগন্ময়ী, আমরা অভয়ার

শরীর মধ্যে অবস্থান করিতেছি, আমাদের পৃথক অস্তিত্ব কিছুই নাই, সদানন্দময়ীর মধ্যে থাকিয়া ঐরূপ ভয়বিহ্বল হওয়া কি তোমাদের কর্ত্তব্য হইয়াছে? জগদম্বার চরণে আত্ম সমর্পণ ব্যতীত ভয়শূন্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। মানুষের মৃত্যুভয় অতি ভীষণ, সেই ভয়কে অন্তর হইতে দূরীভূত করিতে পারিলেই সমুদয় ভয়ই দূরীভূত হয়। শ্মশান ও মৃত্যু এই উভয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ। সেই মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা হেতু শ্মশান সাধনা কর্ত্তব্য। এই দেবীর মন্দিরের অতি নিকটে শ্মশান, এস আমরা অদ্য রাত্রে সেই শ্মশানে অভয়ার ধ্যানে নিবিষ্ট হইব।" ইহা কহিয়া সাধক বিশুর সহিত নিকটবর্ত্তী শ্মশানে গমন করিলা। এক অর্দ্ধদগ্ধ পূতিগন্ধময় শবের সন্নিধানে আসন নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কহিলেন, "বিশু। তুমি এই অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহকে সম্মুখে রাখিয়া মা কালীর ধ্যানে নিরত হও। তোমার একাগ্রতার এই প্রথম পরীক্ষা।" ইহা কহিয়া সাধক বিশুকে সেই বীভৎস স্থানে বসাইয়া শ্মশানের একপ্রান্তে আসিয়া শ্মশানবাসিনীর নৃত্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। সাধক কহিলেন, "জননি! সংসারও শ্মশান এই উভয়ের মধ্যে শ্মশান তোমার এত প্রিয় কেন? কেনইবা "শ্মশানালয় বাসিনী" বলিয়া তোমার ধ্যান করিতে হয়। তোমার সন্তান অজ্ঞান ও বালক তাহার মনে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে, মা! জিজ্ঞাসা করি, রত্নরাজি মণ্ডিত, সুধাধবলিত সুবর্ণময় পানাহার পাত্র পরিশোভিত, সুগন্ধ সম্ভার সংযুক্ত রাজরাজেশ্বরের উপাসনা মন্দির অপেক্ষা শ্মশান তোমার এত প্রিয় কেন? বিনীত, ধার্ম্মিক, উদার, তোমার নিতান্ত

শরণাগত ব্যক্তির প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয় মন্দির অপেক্ষা শ্মশান তোমার অধিক প্রিয় কেন? শ্মশানে ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি নাই, অহঙ্কারের তীব্রদৃষ্টি নাই, তাই বুঝি রাজার মন্দিব অপেক্ষা শ্মশান তোমার অধিক প্রিয়। ধার্ম্মিকের হৃদয়ের কি অপরাধ মা! সেখানে কেন তুমি সর্ব্বদা থাকিতে চাহ না? সর্ব্বাসক্তি শূন্য হইয়া তোমার নিতান্ত শরণাপন্ন না হইলে তুমি তাহার হৃদয়ে বাস ইচ্ছা কর না, একথা সত্য, সংসারে থাকিয়া সর্ব্বাসক্তি শূন্য হওয়া বড় শক্ত, তাই বুঝি ধার্ম্মিকের হৃদয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার প্রিয়! হাঁ মা! সংসার বিরাগী মায়া মোহ বর্জ্জিত তোমার অতি শরণাগত কিঙ্করের হৃদয়েও তুমি সর্ব্বদা থাকিতে চাহ না। তাহার হৃদয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার অধিক প্রিয় কেন? সুখে দুঃখে অনুদ্বিগ্ন হইলেও শোক সন্তাপ পূর্ণ সংসাবের দুঃখ ছায়া মাঝে মাঝে তাহার হৃদয়ে আসিয়া পড়ে, কিন্তু শ্মশানে সে দুঃখের ছায়া নাই, আছে কেবল বৈরাগ্য, ঔদাস্য, পূর্ণানন্দ। তাই বুঝি, তাহার হৃদয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার অধিক প্রিয়। বল মা! আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, দেহধারীদিগের হৃদয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার প্রিয় হইতে পারে, কিন্তু ঐ সব দেবালয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার অধিক প্রিয় কেন? বিশ্বজননি! তোমার সন্তান সন্ততিগণ দেবালয়ে আসিয়া নয়নজলে হৃদয়ের ব্যাকুলতা সহ মনের বাসনা, প্রাণের যাতনা জানায়, কেহ কেহবা নিতান্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকে। সংসারীর প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা জানাইবার স্থান ঐ সকল দেবতা মন্দির। তোমার সৃষ্ট

পদার্থ মধ্যে রূপ রস গন্ধে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই তোমাকে অর্পণ করিয়া মানুষ সুখী হয়। হাঁ মা! সেই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানে থাকিতে তোমার ইচ্ছা হয় কেন? বুঝিয়াছি মা! তুমি নিবৃত্তি সৌধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শশ্মান পরমা নিবৃত্তির স্থান। নিবৃত্তি মার্গের পথিকই কেবল তোমার পূর্ণানন্দময় জ্যোতি দর্শনে সক্ষম। তাই বুঝি দেবালয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার প্রিয়। দেবস্থান হইতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ বহির্গত হইয়া প্রবৃত্তি সংসার অরণ্যে, ও নিবৃত্তি শ্মশান উদ্যানে শেষ হইয়াছে। দেব মন্দিরে মানুষের পটুতার পরিচয় আছে, বলদর্পের চিত্র আছে, মর্য্যাদা আছে, আশা ভরসা আছে, ভবিষ্যতে সুখের চিত্র হৃদয়ে লইয়া সংসারী তথায় আগমন করে, সুখের চিত্র খুলিয়া প্রবৃত্তি মার্গ ধরিয়া সংসারে প্রবেশ করে। ঐ সব দেবালয়ে নিবৃত্তি মার্গও আছে, কিন্তু তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, সেই সঙ্কীর্ণ পথ শ্মশান মুখে আসিয়া সুবিস্তীর্ণ হইয়াছে।

এই শ্মশানে অহঙ্কার নাই, বলদর্পের প্রদর্শিনী নাই, আশা নাই, ভরসা নাই, মায়ামোহ নাই, আছে কেবল নিবৃত্তি, শান্তি। হাঁ মা! আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি শান্তির আলয় শ্মশানে আসিয়া তোমার এরূপ ভয়ঙ্করী বেশ কেন? লোল রসনা, বিবসনা অট্টহাসিনী, ভৈরব নাদিনী, ঘোররবা শিবাগণ পরিবেষ্টিতা, নৃত্যপরা যোগিনীগণ সঙ্গিনী, একি! তোমার নিতান্ত শরণাগত সন্তানগণ শান্তিময় শ্মশানে আসিয়া তোমার ধ্যানে মগ্ন হয়। তুমি তাহাদের একাগ্রতা, নির্ভীকতা, ধীরতা পরীক্ষা করিবার জন্য কি ঐ

মায়াজাল বিস্তার করিয়া থাক? যাহা হউক জননি। তুমি আমার মনোসরোবরে শান্তি (সরোজরূপে) স্নেহময়ী জননীর বেশে উদয় হও। আমি তোমার প্রসন্ন বদন, স্নেহময় দৃষ্টি দর্শন করিয়া শীতল হই।" ইহা ভাবিয়া সাধক জননীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিশু কহিল, "ঠাকুর,। শিবাগণের চীৎকার শুনুন, এরা কি শিবা না সিংহ, আধপোড়া শবটাকে টেনে এনে আমার গায়ে পড়ছে।" সাধক কহিলেন, "বিশু। তুমি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিও না। চক্ষু কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয গণকে সংযত করিয়া ধ্যানস্থ হও, ভীত হইওনা, ভীত হইলে চাঞ্চল্য ও জীবভাব আসিবে, বিঘ্ন হইবে।" বিশু কহিল, "ঠাকুর। আমি মরণে ভীত নয়, এই আমি আবার তোমার দেওয়া মহামন্ত্র জপ কর্ত্তে বসলাম।" ইহা কহিয়া বিশুও পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইলেন। ক্রমে রজনীর চতুর্থ প্রহর উপস্থিত হইল। বিভাবরীর অঙ্গ অলস, কবরী শিথিল, খদ্যোতিকা রূপ মাণময় হার প্রভাহীন, শিরোদেশে আকাশ মুকুটে মণিপুংক্তি তারাবলি জ্যোতিহীন, জীবগণ ক্রমে জাগরিত হইতেছে। সাধক বিশুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বিশু। মহানিশি অতীত হইয়াছে, অভয়ার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যোগাসন পরিত্যাগ কর।" ইহা শুনিয়া বিশু জগদম্বাকে হৃদয়ে লইয়া আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুর চরণে প্রণিপাত করিলেন। বিশু ও সাধক দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির প্রাঙ্গণে আগমন করিবামাত্র কেণারাম বাহিরে আসিয়া সাধকের পদস্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন, "জগদম্বার কৃপায়, আপনার অনুগ্রহে, আমি নিরাপদে

জপ সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছি। দেব, আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া জপারম্ভ করিবামাত্র কি এক অপূর্ব্ব ভাব ও আনন্দের উদয় হইল, তাহা আমি বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয় আকাশে শত শত প্রেম শশীর উদয় হইয়া আমাকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া আমার বোধ হইতেছে, আমি যেন কোন অপূর্ব্ব স্থানে ছিলাম। সে আনন্দ জ্যোতি এখনও আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।" সাধক মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "আপনার আশা ফলবতী হইয়াছে। আপনার হৃদয়ের সে আনন্দ জ্যোতি আর কখনও বিলুপ্ত হইবে না। অতঃপর আপনি সংসারকে অন্যভাবে দর্শন করিবেন। আপনাকে সিদ্ধাসন নির্দ্দেশ করিয়া বিশুকে শ্মশান জপ অভ্যাস করাইবার জন্য নিকটবর্ত্তী ঐ শ্মশানে গিয়াছিলাম। বিশুও সেখানে নিরাপদে জপ সমাধা করিয়াছে। ঐ দেখুন পূর্ব্বকাশের গাঢ় তিমির দূরীভূত হইয়াছে। পক্ষীকুল কুলায় বসিয়া কলধ্বনি পূর্ব্বক দিবসপতিকে সম্ভাষণ করিতেছে, নিকটবর্ত্তী লোকালয় হইতে দুই একটী কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছে। অনন্তর আমাদের গৃহে প্রত্যাগমন কর্ত্তব্য।" ইহা কহিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণ দেশে দাঁড়াইয়া করযোড়ে মৃদুস্বরে গাহিলেন,—

কালী কত জাগিবে ঘুমাও গো।
আমি কেমনে তোমারে জাগাইব॥
তুমি সুমতি কুমতি, পুরুষ প্রকৃতি, তুমি শূন্য সঙ্গেতে মিশাও।
কারে রাখ তন্ত্র মন্ত্র আরাধনে, কারে ভ্রান্তিরূপেতে ভ্রমাও॥

কারে দেহ মন্ত্র সাধনা মন্ত্রণা, কারে যন্ত্রণা যোগাও।
কমলাকান্ত নিতান্ত অনুগত নামরসে বিরমাও॥

অতঃপর সাধক কেনারাম ও বিশুর সহিত দেবীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

সাধক কিয়দ্দিবস অমরার গড়ে অবস্থান করিয়া বিশু ও কেণারামের সহিত চান্নায় আগমন করিলেন। যৌবনের লীলাভূমি চান্নার দর্শনে তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে বিগত সুখ দুঃখের ছবি ক্ষণে উদয় হইতে লাগিল। মাতৃরূপিণী জগদম্বার মূর্ত্তি সেই দুঃখের ছবিকে আবরণ করিয়া বসিলেও মায়ার এমন মোহিনী শক্তি সর্ব্বাসক্তি শূন্য সাধকের দৃষ্টিকেও সেই দুঃখের ছবি হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিল না। তিনি গৃহে আগমন করিবামাত্র তাঁহার সহোদর অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া সস্ত্রীক যথাশক্তি ভ্রাতার ও তাঁহার অনুগামীগণের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ গর্ভধারিণীর ধ্যান ও চরণ বন্দনা না করিয়া নয়ন মুদ্রিত, কি গাত্রোত্থান করিতেন না। এক্ষণে গৃহ মধ্যে আসিয়া জননীর অকৃত্রিম ভালবাসা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। জননীর মৃত্যুশয্যার চিত্র ও তিনি ভুলিতে পারিলেন না। প্রেয়সীর হাস্যপূর্ণ বদন, প্রেম ও ভক্তিভরা দৃষ্টি বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় তাঁহার মনকে বিচলিত ও ভীত করিল। তিনি মনে মনে হাস্য করিয়া অন্তর্বাসিনী জগদম্বাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জননি! তোমার আবার একি ভাব, কত রঙ্গ জান, আমি দেখিতেছি, এখন তুমি আমার সেই মা হইয়া আসিতেছ, কাছে বসিয়া আমাকে

খাওয়াইতেছ, কমল বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিতেছ, কত বুঝাইতেছ। একি মা! তোমার আবার একি ভাব, কালনার মৃত্যুশয্যা; মায়ের ম্লান মুখ, ক্ষীণ দৃষ্টি, মৃদুস্বরে কমল বলিয়া সম্বোধন! ওঃ অসহ্য! আমি এখনও মায়াকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমার এ গৃহ বাস উচিত নহে। গৃহে থাকিয়া আমার মনক্লিষ্ট হইতেছে। মা মহামায়া! ওই দেখ আবার তোমার কি ভাব! সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু শয্যা, কাতর দৃষ্টি, জন্মের মত বিদায় গ্রহণের অভিনয়। ক্রন্দন, হাহাকার, আত্মীয় স্বজনের রোদন। রঙ্গিণি! আবাব তোমার এক বর্ত্তমান নবভাব দেখ,—সহোদরের সহাস্য-বদন, প্রেমপূর্ণ নয়নে দাদা বলিয়া সম্বোধন। ভ্রাতৃ জায়ার অকৃত্রিম যত্ন। যাহা হউক মা! তুমি এসব ভাব সম্বরণ কর, এস! এলোকেশে, দিকবসনে, সহাস্য বদনে আমার হৃদয় আসনে উপবেশন কর। আমি মনে মনে অঞ্জলি অঞ্জলি তোমার চরণে কুসুম দাম অর্পণ করি।" হৃদয়বাসিনী জগদম্বাকে এইরূপে মনের কথা বলিয়া একরাত্রি মাত্র গৃহে অবস্থান করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ওঃ! মায়া ত্যাগ কি দুরূহ ব্যাপার। সংসার ত্যাগী পুরুষদিগের দ্বাদশ বৎসর অন্তর জন্মভূমি দর্শনের বিধি আছে। আমার বোধ হয় এ বিধির উদ্দেশ্য ত্যাগী পুরুষের পরীক্ষা। তিনি মায়াকে মন হইতে অপসারিত করিতে পারিয়াছেন কিনা ইহা জন্মভূমির পুনর্দর্শনে তাঁহার উত্তম রূপে ধারণা হয়। এইরূপ ভাবিয়া সাধক সহোদরকে কহিলেন, "ভাই! আমার আর সংসার বাস শোভনীয় নহে। আমার মাতৃ বিয়োগের কিছু দিন পরেই দেবী বিশালাক্ষীর

মন্দির আশ্রয় করিয়াছিলাম, এখন আমার ইচ্ছা তথায় দিনেক দুদিন বাস করিয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিব।” ইহা কহিয়া বিশু ও কেণারামের সহিত দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে আগমন করিলেন। গ্রামের গৌরব অনেক দিন পরে গ্রামে আসিয়াছেন, গ্রামবাসী-দিগের আনন্দের সীমা রহিল না। এক্ষণে তাঁহারা সর্ব্বদা সাধু সহবাসে সুখী হইতে লাগিলেন। আজ সাধক সকলেরই আপনার লোক, কাহার ভ্রাতা, কাহার খুড়া মহাশয়, কাহারও ভ্রাতুষ্পুত্র, কাহারও দাদা মহাশয়, কাহারও দেবর, কাহারও বা গুরুজন। বিবিধ খাদ্য সামগ্রী ও বিবিধ ফলপুষ্পে দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির পূর্ণ হইতে লাগিল। শ্যামা সঙ্গীত শ্রবণের জন্য দূরস্থ গ্রামবাসীগণ প্রথম অগ্রহায়ণ মাসের তীব্র শিশিরকে অবহেলা করিয়া সন্ধ্যার পর দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে আগমন করিতে লাগিল। গায়ক সাধক, বাদ্যকার কেণারাম, তাল মান ও সুর ভক্তির সহিত মিলিত হইয়া পশু, পক্ষী, বালকেরও হৃদয় বিগলিত করিতে লাগিল। এইরূপ পরমানন্দে সাধক চান্নায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া বিশু ও কেণারামের সহিত বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন।

নবম অংশ।

সাধক শিরোমণি রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্তের গীতাবলি পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহারা সাকার কি নিরাকারবাদী এ বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয়। সাধক রামপ্রসাদ সেন গাহিতেছেন,—

"কে জানে মন কালী কেমন!
ষড় দর্শনে না পায় দরশন।
কালী ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥"

তিনি আবার ব্রহ্ম ধারণায় একটু উচ্চ সীমায় উঠিয়া গাহিলেন,—

"মন তোমার এ ভ্রম গেল না॥
মাটী ধাতু পাষাণ মূর্ত্তি গড়িয়ে কর উপাসনা॥"

সাধক কমলাকান্ত বলিতেছেন,—

"জান না রে মন পরম কারণ শ্যামা ত শুধু মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥"

তিনি ব্রহ্ম ধারণায় উচ্চ সীমায় উঠিয়া গাহিলেন,—

"প্রকৃতি পুরুষ, অথবা শূন্য, সেই সকলি, সকলে ভিন্ন।"

আবার এই সকল মহাত্মারা সেই ব্রহ্ম শক্তিকে সাকার রূপে উপাসনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম নিরূপণে ও ব্রহ্মের রূপ চিন্তায় আমাদের আর্য্য ঋষিগণেরও এই মত। তাঁহারা ব্রহ্ম শক্তিকে

সাকার ও নিরাকার ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সাকাররূপ সগুণ, নিরাকার গুণাতীত। ভগবানের নিষ্ক্রিয় ভাবই নিরাকার ভাব। সাকাররূপে সৃজন পালন ও লয় করেন। নিরাকার রূপ অচিন্ত্য, অব্যক্ত, সেই অচিন্ত্য রূপের সগুণ ধারণাই সাকার উপাসনা। আর্য্য ঋষিগণ সেই সাকার উপাসনাকে দোষাবহ বিবেচনা করেন নাই। বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনায় তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি ও নিরুপম রূপের উল্লেখ আছে। আমাদের দার্শনিকগণ ব্রহ্ম নিরূপণে সেই শক্তিকে কেহ সর্ব্বরূপময় আত্মা, কেহ পুরুষ প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও দার্শনিক সেই সাকার উপাসনাকে দোষাবহ কি পাপজনক বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। সেই জন্য ভারতবর্ষে নির্ব্বিবাদে সাকার ও নিরাকার উপাসনা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞান, ধ্যান ও ধারণার শক্তি অনুসারে ব্রহ্মশক্তিকে কেহ বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ নিরাকার ভাবে, কেহ বা সাকার ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। মধ্যদেশ ও সমুদয় ইউরোপ খণ্ডে সেই সাকার উপাসনা উচ্ছেদের জন্য বহুদিন ব্যাপী ঘোর রাষ্ট্র বিপ্লব ও জনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছিল। সাধক কমলাকান্ত আর্য্য ঋষিগণের পথাবলম্বী। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ ভিন্ন ভগবানের নিরাকার ভাব ধ্যান ও ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সামান্য হইতে বিশেষের সৃষ্টি হয়। সামান্য বীজ হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। সেই জন্য ব্রহ্ম শক্তিকে স্থূলভাবে উপাসনায় সাধারণের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তিনি সেই শক্তিকে মাতৃভাবে

উপাসনা করিয়াছিলেন ও কোটাল হাটে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি নবজলধর বরণীর রূপে সবিতার জ্যোতি, অপার বারিধির অপূর্ব্ব শোভা, বিশ্বব্যাপী আকাশের নিবিড় নীলবর্ণ, মহীরুহগণের সুন্দর শ্যামল কান্তি, শশাঙ্কের সুন্দর সুষমা, ত্রিদিবের কল্পনা প্রভৃত ঐশ্বর্য্যরাশি সন্দর্শন করিতেন। এক্ষণে তিনি কোটাল হাটে আগমন পূর্ব্বক সেই বিশ্ব শক্তিকে নয়নজলে প্রণিপাত পূর্ব্বক অমরার গড়ে গুরুদর্শনের কথা মনে করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "মা! যাঁহার কৃপায় শৈশব হইতে তোমার ধ্যান করিতে শিক্ষা করিয়াছি। যাঁহার ঐশী শক্তিবলে তোমাকে হৃদয় মধ্যে ধ্যান করিয়া তোমার রূপ দর্শনে বঞ্চিত হই নাই, বহুভাগ্য বলে তোমার কৃপায় সেই গুরুদেবের আমি পুনর্ব্বার দর্শন পাইলাম। ইচ্ছাময়ী! আর কত কাল এ দাসকে রক্তমাংসময় দেহ বহন করাইবে।" ইহা কহিয়া সাধক কেণারামের সহিত স্নান পূজা ও আহারাদি সম্পন্ন করিলেন।

শীতকাল, বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মি জাল সুখস্পর্শ, সাধক কমণ্ডলু করে কালীবাটীর প্রাঙ্গণস্থ তরুমূলে সলিল সেচন করিতেছেন। সাধক পার্শ্ববর্ত্তী কেণারামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই বিল্ববৃক্ষ আমার রোপিত। আমি প্রতিদিন ইহার মূলে সলিল সেচন করিয়া থাকি। দেখুন ইহার রূপ মায়ের নীল কাদম্বিনী রূপের অনুরূপ। ইহার পত্র সকল একটীও ছিন্ন নহে। মায়ের চরণপদ্মে অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া দিবার উপযুক্ত। ঐ দেখুন লম্বমান বিল্বফল সকল শ্যাম শরীরে

সজল জলদবর্ণে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। এই সকল ফল এখনও পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয় নাই, ইহারা পক্কাবস্থায় স্বর্ণ কলসের শোভাধারণ করিবে, ফলগুলি দর্শনীয় হইলেও অন্তঃসার শূন্য নহে, অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু। ঐ দেখুন আমার স্থলপদ্ম। ইহারা বড় যত্ন প্রিয়। লজ্জা মুখে, নত বদনে, ধরণীর দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া আছে। আমি ইহাদের মুখে মায়ের চরণের জ্যোতি অবলোকন করি। ঐ দেখুন মল্লিকাদল, ইহারা এই উদ্যান আকাশে তারাবলি। সুন্দর কুমারীগণের বিমল হাস্যের ন্যায় ইহাদের হাস্য পরিদর্শন করিয়া আমার বিমলার চারুহাস্যের সৌন্দর্য্য পরিদর্শন করিয়া সুখী হই। এই আমার আদরের জবাদল। প্রভাত উত্থিত অরুণের ন্যায় ইহার প্রসূন সকল এই আশ্রম গগনে অপূর্ব্ব শোভার সমাবেশ করিয়া থাকে। রক্ত চন্দনে মিশাইয়া এই সকল জবা আমি মায়ের চরণে দিয়া পরমা শান্তি পাই। মহারাজা বাহাদুর এই আশ্রমের চারি ধারে পাকা প্রাচীর দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অনুরোধে বাঁশের বেড়া দেওয়া হইয়াছে। বিশু বেড়ার চারি দিকে লতাজাল রোপন করিয়াছে। দেখুন লতাজাল কি অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে, সমুদয় আবরণকে গ্রাস করিয়াছে। শ্যামল ঘন পত্রাবলির মধ্যে বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুম সকল নীল পীত লোহিত বর্ণের ছবি খুলিয়া প্রিয় দর্শনীয় হইয়াছে। বিশু সাধকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, সাধকের বাক্য অবসান হইবামাত্র কেণারামকে কহিলেন, "ঠাকুর! আমি এই

লতাগুলিকে কেবলমাত্র বেড়া দিবার জন্য এখানে আনি নাই। আমি বাইরে ঐ বনের ভিতর লতাগুলিকে দেখে ভাবলাম হায়! হায়! তোমাদিকে কেউ আদর করে না, তোমরা অন্ধকারে বনের ভিতর পড়ে আছ। ঠাকুর আমাদের পতিত পাবন, তাঁর পাপী তাপী তরাণই কাজ। তিনি আমাকে স্থান দিয়েছেন, তোমরাও তাঁর চোকে পড়্‌লে তোমাদের দশা ফিরে যাবে, এই ভেবে কতকগুলি লতাকে উপ্‌ড়ে এনে এই বেড়ার ধারে পুঁতে ছিলাম। ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টিতে আজ এদের চেহারা দেখুন। ফলে ফুলে সমস্ত বেড়া ঘেরে কালী বাটীর শোভা বাড়িয়েছে। ঐ দেখুন সম্মুখে আমার সদানন্দময়ী জলদবরণী হাস্‌ছেন। বেড়ার চারিধারে সেই হাসি। কাল বরণী লতাগুলি—তাদের উপর লাল নীল শাদা হলুদ বর্ণের কত ফুলই ফুটেছে।” বিশুর এই কথা শুনিয়া কেণারাম কহিলেন, “বিশুর এখন সকলের উপর সমান সহানুভূতি জন্মিয়াছে। আমি দেখিতেছি, ইহার পর বিশু জগতের কোন পদার্থকেই ভিন্ন ভাবে দর্শন করিবে না। সকল বস্তুতে ঈশ্বরের সত্তা অবলোকন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিবেন।” সাধক একটু হাসিয়া কহিলেন, “বিশুর ইচ্ছা মহারাজের এই কুসুম কাননটীকে লতা কণ্টকাকীর্ণ বন ভূমিতে পরিণত করে। বিশু সর্ব্বদাই অভিযোগ করিয়া বলে কেন বাহিরের ঐ সকল লতা ও কণ্টক এই উদ্যানে স্থান পাইবে না।” ইহা কহিয়া সাধক শ্যামাগৃহের অন্তরালে বিশুর রোপিত শাক বেগুনাদি ক্ষেত্র কেণারামকে দেখাইয়া কহিলেন, “দেখুন

ক্ষেত্রটি কণ্টকজাল ও তৃণাদিতে পরিপূর্ণ। কণ্টক ও তৃণাদিকে উপাড়িয়া ফেলিতে বলায় বিশু মনে বড় কষ্ট পায়, সে জন্য এ বিষয়ে আমি বিশুকে আর অনুরোধ করি নাই।" ইহা শুনিয়া কেণারাম কহিলেন, "কেন? বিশু! কণ্টকজাল ও তৃণাদি পরিষ্কার না করিলে শস্য বর্দ্ধিত হইবে না, তাহা কি তুমি জান না?" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমি দেখ্‌ছি সব যায়গাতেই গরীবের লাঞ্ছনা। আমি কি দোষে এই সকল গরীব কাঁটা গুলিকে টেনে, উপাড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেব বুঝতে পারি না।" কেণারাম কহিলেন, "বিশু, উপায়কে রক্ষা করিতে হইলে অপায়ের বিনাশ কর্ত্তব্য। বিশ্বপালনকর্ত্রী পরমেশ্বরী যজ্ঞ ও দেবগণের রক্ষার জন্য অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! এরা অপায় নয়, অত্যাচারীও নয় বরং পরম উপকারী, একটু মাথা তুলে উঁচু হয়ে উঠেছে এই মাত্র অপরাধ। আমি দেখ্‌ছি এদের মহৎ গুণ আছে। মা আমার কোন বস্তুকে বৃথা সৃষ্টি করেন নাই। আপনি বলছেন, এরা শাক বেগুন হতে দেয় না। শাক বেগুন সুখের সময় মানুষের মুখ রোচক কিন্তু কাঁটা তৃণাদি মানুষের অসময়ে উপকার করে, কণ্টকারী ও মুথা ঔষধে প্রয়োজন। যারা অসময়ে উপকার করে, তারাই যথার্থ বন্ধু। ঠাকুর এই সকল ভেবে আমি ওদিকে তুলে ফেলে দি নাই।" কেণারাম কহিলেন, "বিশু! তুমি মুথা ও কণ্টকারী বাহিরে অনেক পাইবে, কিন্তু শাক বেগুনের গাছ অযত্নে যেখানে সেখানে জন্মে না, ইহাতেই বুঝিতে হইবে শাক বেগুনকে যত্ন

পূর্ব্বক আবাদ করা কর্ত্তব্য।" বিশু কহিলেন, "ঠাকুর, উপকারী ব্যক্তি সম্মুখে থাকিলে তোমার মত উপকারী অনেক পাওয়া যায় বলে উপকারীকে লাঞ্ছনা করে তাড়িয়ে দেওয়া কি উচিত? আমি ত মূর্খ মানুষ, আপনি কি বলেন?" কেণারাম বিশুর কথা শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া ঠাকু'রর মুখ পানে চাহিয়া ভাবিলেন, সাধু সহবাসের কি অপূর্ব্ব মহিমা! সেই ঘোরতর মহাপাষণ্ড, হিংস্র বিশেডোম সাধু সহবাসে পরম অহিংসা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। মানব, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিতে ভগবচ্ছক্তি বিদ্যমান দেখিতেছে। মানব যেমন প্রিয়তম হইতে প্রিয়তম নিজ শরীরের উপর হিংসা করিতে বড় কুণ্ঠিত হয়, বিশুও সর্ব্ব বস্তুকে নিজ শরীরের ন্যায় বোধ করিতেছে। ঠাকুর একটু হাসিয়া কহিলেন, "এরূপ সহানুভূতি মন্দ নহে। কিন্তু এরূপ সহানুভূতির পরিণাম কি তাহাই আমি ভাবিতেছি। আমি দেখিতেছি, মহারাজের কালী বাটিটী বিশুর সর্ব্ববস্তুতে সমান ভাব বশত শীঘ্র জঙ্গলে পরিণত হইবে। কীট পতঙ্গ মশকাদির দংশনে এখানে অবস্থান করা কঠিন হইবে।

এইরূপে ঠাকুর, কেণারাম বিশু নানাবিধ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় যুবরাজ প্রতাপ চাঁদ দুইজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া কালী বাটীতে আগমন করিলেন। সাধক কেণারাম ও বিশুর সহিত শ্যামা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যুবরাজকে আসন প্রদান করাইয়া কেণারামের সহিত একাসনে উপবেশন করিলেন। প্রতাপ চাঁদ প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা

করিয়া কহিলেন, "আপনার এখানে আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আপনাকে দর্শন করিবার জন্ত মন ব্যাকুল হইয়াছিল। এক্ষণে বহুদিনের পর প্রিয়বস্তু দর্শনের স্থায় আপনার দর্শনে মনে বড় আনন্দের উদয় হইতেছে। আপনার এখান হইতে গমনাবধি আপনার মধুময় বাক্য স্মরণ করিয়া সুখী হইতাম। যত দিন যাইতেছিল, ততই দর্শন আশা প্রবল হইতেছিল। অদ্য কয়েক দিন আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আপনি স্নানাদি গ্রহণ করেন নাই, আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত আছেন। কিন্তু আমার দর্শন পিপাসা এতই প্রবল যে আপনাকে বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিলাম না।" সাধক সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "প্রতাপ। আমি এখানে আসিয়া তোমাদের কুশল বার্ত্তা লইয়াছি। মনের আকর্ষণী শক্তি মহীয়সী। তোমরা আমাকে স্মরণ করিতে বলিয়া আমিও তোমাদিগকে অনেক সময় মন হইতে অপসারিত করিতে পারিতাম না। প্রতাপ! ভগবানে সেইরূপ চিত্ত সন্নিবেশের নাম ধ্যান।" অতঃপর যুবরাজ কহিলেন, "আপনার অনুগত কেণারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কুশলে আছেন?" সাধক কেণারামকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ইনিই কেণারাম চট্টোপাধ্যায়।" ইহা শুনিয়া যুবরাজ প্রণাম ও কেণারামের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরের মুখে আপনার প্রশংসাবাদ মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকি। আজ আপনার দর্শনে পরম সুখী হইলাম।" কেণারাম কহিলেন, "আমার জন্মান্তরের সুকৃতি বলে ঠাকুর আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া

থাকেন। আমি অতি দোষ দুষ্ট হইলেও অতি শরণাগত বলিয়া, ঠাকুর আমাকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। আপনি আমাদের ভাবী ভূপতি। অদ্য আমি আপনাকে দর্শন করিয়া, আমাকে পুণ্যবান বিবেচনা করিতেছি। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, আপনি ধার্ম্মিক, ভক্তিমান, কর্ম্মী ও জ্ঞানী। আমি শুনিয়াছি, আপনি ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও ভোগ বিলাসকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচনা করেন। আত্মার উৎকর্ষ লাভে আপনি সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন। আপনি পরমার্থ চিন্তা অমৃত পানে আপনাকে অমর করিবার অভিলাষী। ভবাদৃশ ধনবান ব্যক্তির পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ ও ধন সঞ্চয়ের চেষ্টা মানবগণের স্বতই হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়া তাহার সম্ভোগে বীত রাগ হওয়া, এই প্রলোভন পরিপূর্ণ সংসারে অতি কঠিন কর্ম্ম। সংসার সরোবরে ঐশ্বর্য্য প্রস্ফুটিত পদ্ম, মানব ভ্রমর, মধুপানে প্রমত্ত হওয়া তাহার প্রবৃত্তি। মনের বল অসীম না থাকিলে সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না। ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে উদাসীন পুরুষের মোক্ষ সহজেই হইয়া থাকে।" ইহা কহিয়া কেণারাম তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। সাধক যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রতাপ! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় বিষয় কর্ম্মে মনোযোগ করিয়া যথা সময়ে ধর্ম্ম চিন্তা করিতেছ ত? তোমার স্বধর্ম্ম প্রজা পালন ও সৎকর্ম্মের সহায়তা করা, তাহার অন্যথাচরণে তোমার প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে।" যুবরাজ কহিলেন, "গুরুদেব! আমি যথাসাধ্য আপনার উপদেশ সকল কর্ম্মে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু

মনের সম্পূর্ণ সন্নিবেশের বিঘ্নতা বশতঃ আমার বিশ্বাস হইয়েছে আমি প্রাণায়াম করণের এখনও সম্পূর্ণ অধিকারী হই নাই। আমি ঘেরণ্ড প্রভৃতি সংহিতাশাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখিয়েছি, দেহ শোধন, ধৌত, অন্তর্ধৌত, আসন মুদ্রাদি দ্বারা প্রাণায়ামের অধিকারী না হইলে শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কম। ঋষি ঘেরণ্ড বলেন, দেহ শোধন ছয় প্রকার। ধৌত অন্তর্ধৌতাদি চারি প্রকার। অন্তর্ধৌত বাতসার আদি চারি প্রকার। সিংহাসনাদি আসন বত্রিশ প্রকার। মহামুদ্রাদি মুদ্রা সকল পঞ্চ বিংশতি। হটযোগে এই সকল অভ্যাস না করিলে কোন ব্যক্তিই রাজযোগের অধিকারী হন না। শিব সংহিতা, যোগাম্বুধি প্রভৃতি অন্য সংহিতাও সেইরূপ উপদেশ দিতেছেন। আমার বিশ্বাস চঞ্চলচেতা ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমে হটযোগই কর্ত্তব্য। সাধক যুবরাজেব মনোভাব অবগত হইয়া দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "প্রতাপ। সংহিতাকারদিগের উদ্দেশ্য মহৎ। তাঁহারা যে সকল কর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, তাহা তোমার মত লোকের পক্ষে কষ্ট সাধ্য। হটযোগ সাধনাকারীর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। লঘুচেতা রাজযোগে অনধিকারী মানব হটযোগে সংসারীর চক্ষে অদ্ভুত কর্ম্মা হইয়া অহঙ্কারে প্রকৃত যোগ সাধন ও তৎফল লাভে বঞ্চিত হয়। মন কর্ম্ম সকলের উপদেষ্টা, সেই মনকে অভ্যাস যোগ দ্বারা সংযত ও অন্তর্মুখী করিতে পারিলে ঐ সকল হট কর্ম্মের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও ভক্তিলাভের চেষ্টা কর সংহিতাকারই বলিয়াছেন,—

"নাস্তি মায়াসমঃ পাশো, নাস্তি যোগাৎ পরংবলং।
নাস্তি জ্ঞানাৎ পরোবন্ধুর্হঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ॥"

এই সিদ্ধাই লাভে জ্ঞানলাভ হয় না বরং অহঙ্কার আইসে। জ্ঞান উপার্জ্জনের উপায় অনেক আছে। এ সংসারে জ্ঞান বিকীর্ণ আছে, সেই জ্ঞানের উপার্জ্জনে শাস্ত্র সকল উপায়, মন কর্ত্তা, বুদ্ধি উপদেষ্টা। প্রাণায়ামের পূর্ব্বে মনকে পবিত্র বিবেচনা করিলেই সকল চাঞ্চল্য হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আমাদের সকল শাস্ত্রই বেদের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া রচিত হইয়াছে। দেখ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা অর্চ্চনায় প্রাণায়ামের পূর্ব্বে মার্জ্জন মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন ও পরে বিনিয়োগ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। এই মার্জ্জন মন্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য দেহ ও অন্তশু‌র্দ্ধি। বিনিয়োগ মন্ত্রে মনের সংযম হয়। এক এক মন্ত্রের প্রণেতা এক এক ঋষি। তাঁহারা বহু তপস্তা দ্বারা লোক হিতার্থে সেই সকল মন্ত্রকে পবিত্র করিয়াছেন। বেদোক্ত প্রাণায়ামের পূর্ব্বে সেই সকল ঋষি ও ছন্দ উচ্চারণে মন দেহ পবিত্র হয় ও মন প্রাণায়ামে অধিকারী হয়। সংহিতাকার যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"ঋষিশ্ছন্দোহধিদৈবঞ্চ ধ্যায়ন মন্ত্রঞ্চ সর্ব্বদা।
যস্তু মন্ত্রং যপেৎ গাপিতদেব হি ফলপ্রদং॥"

যে ব্যক্তি ঋষি ছন্দ ও অধিদেবতাকে স্মরণ করিয়া মন্ত্র জপ করেন, তাঁহারই জপের ফল লাভ হয়। প্রতাপ চাঁদ! তুমি সন্ধ্যাবিধি অনুসারে প্রথমে মার্জ্জন মন্ত্র পাঠ করিয়া দেহ শুদ্ধি পূর্ব্বক

বিনোয়োগ মন্ত্রে মনকে সংযত করতঃ প্রাণায়ামে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি জপের ফল নিশ্চয় লাভ করিবে। আমি বুঝিতেছি, তুমি হঠযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে হঠযোগ বিপদ জনক। অষ্টাবক্র সংহিতা হঠযোগের উপদেষ্টা নহেন—যদি সংহিতাকারগণের মতাবলম্বী হইতে তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে, তুমি মহর্ষি অষ্টাবক্রের উপদেশ গ্রহণ কর, আত্মাকেই কেবল নিত্য বস্তু বলিয়া জান, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।" ইহা কহিয়া সাধক মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর বিশু কহিলেন, "যুবরাজ! সে দিন একজন হটযোগী এখানে এসেছিলেন, তিনি ঘট শুদ্ধি, নাড়ী শুদ্ধি, আসন শুদ্ধি, অনেক শুদ্ধি বুদ্ধির কথা বল্লেন। শরীরটাকে সোন ও পাটের মত কেচে, ধুয়ে সাদা কর্বার অনেক রকম কথা বল্লেন। আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম, ঠাকুর দেহটাকে কেচে ধুয়ে ঠিক কল্লেন, কিন্তু মনটাকে সাদা কর্বার কি উপায় কল্লেন, বলুন দেখি? তিনি বল্লেন, শরীরের ময়লা গেলেই মনের ময়লা যাবে, কিন্তু আমার কথাটা বেশ ভাল লাগ্‌লো না, কত বাবু ভায়াকে দেখি, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তা বলেই কি ধর্ত্তে হবে তাদের মনও পরিষ্কার। শ্মশানে মশানে ছাই ভস্ম মেখে কত সন্ন্যাসী পড়ে থাকেন, তাঁদের চুলগুলো রুক্ষ, গায়ে ময়লা তা বলে কি ধর্ব্বো তাঁদের মনও ময়লা। শরীর কাচ্‌লে কি হবে, মন কি সব সময়ে শরীরে থাকে। মন কত দিকে নেচে বেড়ায়। মনটাকে আগে বশ কর্ত্তে হবে। কুস্তি বাজী কল্লে, কি করে মন সাদা হবে আমি বুঝতে পারি না।" বিশুর বাক্য শ্রবণ করিয়া

যুবরাজ কহিলেন, "কিন্তু তুমি জান না, শরীরের সহিত মনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। দেহ মন মন্দির। যদি কাহারও গৃহ দূষিত হয়, দূতি গন্ধ বিশিষ্ট হয়, দুর্জন লোক দ্বারা পরিবৃত হয়, গৃহ স্বামীও দূষিত হইয়া থাকেন। দেহ সরোবরে মনঃ সরোজ। সরোবর অপরিষ্কার থাকিলে কমল দলের পূর্ণ বিকাশ হয় না। দেহ অপবিত্র থাকিলে মনের পবিত্রতা ও বিকাশ সম্ভব নয়। সদ্‌গুণ সকল সে মনকে আশ্রয় করিতে পারে না ও সে মনের আকর্ষণী শক্তি থাকে না।" কেণারাম কহিলেন, "শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ বিস্তর একথা সত্য। কিন্তু শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার কর্ত্তা মন। আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম আরম্ভেই জল শুদ্ধি, আসন শুদ্ধি, ঘট শুদ্ধি, অঙ্গন্যাস ইত্যাদির আবশ্যক। এই সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মনকে শুদ্ধ ভাবাপন্ন করিবার জন্য। মন্ত্র দ্বারা অঙ্গাদি শুদ্ধ হইয়া থাকে, মন্ত্র সকলের শক্তি অসীম। আপনি ঠাকুরের এই উপদেশ অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া, অঙ্গাদি সংস্কার পূর্ব্বক মনকে সংযত করতঃ প্রাণায়ামে প্রবৃত্ত হউন। প্রাণায়ামের সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক জপারম্ভ করিলে, অভ্যাস যোগ দ্বারা ক্রমে আপনার মন সংযত হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।"

কেণারামের বাক্য শেষ হইবামাত্র সাধক কহিলেন, "প্রতাপ! তুমি কি হটযোগ অভ্যাস করিতেছ?" যুবরাজ কহিলেন, "দেব! আমি ইতি মধ্যে কুম্ভযোগ অভ্যাস করিয়াছি। আমি হটযোগের কাঠিন্য কিছুই অনুভব করিতেছি না। আমার বিশ্বাস হইতেছে, হটযোগ দ্বারা আমার দেহ শুদ্ধি হইবে, পরে আপনার উপদেশ মত

প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করিব। আমি আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সময়ানুসারে বিষয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া থাকি। আমি হটযোগ অভ্যাসের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছি।” যুবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধক কহিলেন, “সকল সাধনাই উত্তম। কেবল অবস্থা বিশেষে সাধনার ব্যবস্থা। প্রতাপচাঁদ! তুমি কৃতদার, রাজপুত্র, বিষয়ী, ভোগী, তোমার পক্ষে হটযোগ সাধনা কষ্টকর। যদি এখন তোমার প্রাণায়ামে মনঃ সংযোগ না হয়, যদি তুমি কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধারে ধ্যান করিতে অক্ষম হও, কেবলমাত্র মুখে তাঁহাব নাম গ্রহণ কব। নামের এমনি আকর্ষণী শক্তি দেখিবে, উচ্চাবণে নাম ক্রমে তোমার হৃদয় আকর্ষণ করিবে ও মনেব ভাবান্তর ঘটিবে, পরে তুমি যোগ কর্ম্মের অধিকারী হইবে। যুববাজ! মোক্ষ লাভ অতি কষ্ট সাধ্য। কামনা, ভোগ, বাসনা, থাকিতে মোক্ষ লাভ হয় না। মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান। এই সংসার মায়া প্রসূত, একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে আব কোন বস্তুই নিত্য নহে, এই বোধ ও ধারণাব নাম জ্ঞান। সেই জ্ঞান লাভ বহু সাধনা সাধ্য। তুমি অগ্রে স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে অধিকারী হও, মনকে সংযত কব, তাহার পর সাধনা মার্গে যাইবে। নচেৎ তুমি কর্ম্ম ফললাভে বঞ্চিত হইবে।” ইহা কহিয়া সাধক মৃদু স্বরে গাহিলেন,—

তুমি মিছে ভ্রমণ করোনা, আমার মন-তুরঙ্গ! পথে চল।
তুমি সুকৃতি সুমন্ত্রী বট, কুমন্ত্রণায় কেন ভোল॥

তুমি যে শুনেছ ভাই, ভোগ মোক্ষ এক ঠাঁই,
যার গাছ হলনা ফল হবে কি, সে সব কথা শিকের তোল।
দেখিয়ে না দেখ দিঠে, বিপক্ষ চড়েছে পিঠে,
তোমার রথী সে সারথি হারা, কি শঙ্কট ঘটাবে বল॥

সঙ্গীত শেষে প্রতাপ চাঁদ কহিলেন, "গুরুদেব! আপনার কৃপায় আমি হটযোগ সাধনায় কৃতকার্য্য হইব বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। আমি অদ্য হইতে নাম গ্রহণের পৃথক সময় নির্দ্ধারিত করিব।" ইহা কহিয়া যুবরাজ কেণারামের নিকট মানকর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে সুখী হইয়া, তাঁহাদের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যুবরাজ প্রতাপ চাঁদ বিদায় গ্রহণ করিলে, কেণারাম কহিলেন, "যুবরাজের মনের চাঞ্চল্য গুরুতর বলিয়া বোধ হইল। আমার বোধ হয়, তাঁহার ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু তিনি কার্য্য বিষয়ে চিত্তের সন্নিবেশ করিতে পারিতেছেন না। ধর্ম্ম কর্ম্মে বিশ্বাসই অমূল্যবস্তু। হৃদয় উদার না হইলে বিশ্বাস আইসে না। উদার হৃদয়ে সমুদয় সদ্‌গুণ আশ্রয় করিয়া থাকে। উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন নিষ্ফল হয় না, তেমনি উদার হৃদয়ে উপদেশ সকল কখন ও নিষ্ফল হয় না। হৃদয় অপবিত্র থাকিলে, তাহার সমুদয় কর্ম্ম বিরুদ্ধ হয়। কথিত আছে,—

"যদি ধরতি ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মপুণ্ড্রং পটম্বা।
যদি বসতি গুহায়াং বৃক্ষমূলে বনে বা॥

যদি পঠতি পুরাণং বেদবেদাঙ্গোহপি শাস্ত্রং।
যদি হৃদয়মশুদ্ধং সর্ব্বমেতৎ বিরোধং ॥"

রাজপুত্র হৃদয়ের গুরুতর চাঞ্চল্য বশত আপনার উপদেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মানুষ অনেক সময়ে গ্রহ বৈগুণ্য বশত ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে।" সাধক কহিলেন, "প্রতাপ চাঁদ ধার্ম্মিক। তিনি শ্রদ্ধাহীন নহেন। মনের চাঞ্চল্য বশত তাঁহার ইতি কর্ত্তব্যতার অভাব হইতেছে। আমি তাঁহার জন্য দুঃখিত। এইরূপ প্রেমালাপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, দিবস প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আবার দিবস পতি উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অদৃশ্য হইতেছেন। ভুবন শ্রমভারাক্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন। জীবগণ সন্ধ্যা দেবীর সম্বর্দ্ধনায় তৎপর। গৃহ, দেবালয়, দীপদানে আলোকিত ও শঙ্খশব্দে মুখরিত। বিহঙ্গমগণ তরুরাজিকে আশ্রয় করিয়া কলধ্বনি পূর্ব্বক লোকালয়ের সেই সকল কোলাহলের সহিত যোগদান করিতেছে। জলচর পক্ষীগণ নদী ও তড়াগতীর পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে আকাশের কোলে উড্ডীন হইতেছে। তাহারা লোকালয়ের সেই সকল আনন্দধ্বনিকে অধিকতর মনোরম করিবার জন্যই কলরব পূর্ব্বক গমন করিতেছে। ক্রমে নক্ষত্র মালা পরিশোভিত, নীলকান্ত মণিময় মুকুট মস্তকে নিশাদেবীর আবির্ভাব দৃষ্ট হইল। বিশু ও কেণারামের সহিত সাধক বিশ্বশক্তির উপাসনার জন্য গমন করিলেন।

বেদান্ত বলেন, পরম ব্রহ্মের যোগ-নিদ্রার অবসানে তাঁহা হইতে মায়া প্রাদুর্ভূত হইয়া এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই বিশ্ব মায়াময় ও স্বপ্নবৎ হইলেও ব্রহ্ম শক্তিই ইহার ভিত্তি। অজ্ঞান অন্ধকারে মানব মায়ার পরিকল্পিত পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। মানবের মন-আকাশে জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হইয়া সেই অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা দূরীভূত হইয়া যায়। মানব বিশ্বের প্রকৃত অস্তিত্ব অবগত হইতে পারেন, তখন তিনি দেখিতে পান জগৎ মায়াময় নহে, ব্রহ্মময়, জগতের সমুদয় পদার্থই ব্রহ্ম। বেদান্তবাদী ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, "সচ্চিদানন্দ শিবোহহং শিবোহহং।" জ্ঞান দৃষ্টি প্রভাবেই তন্ময়ভাব আইসে, তাই প্রজ্ঞাচক্ষুষ্মান সাধক কমলাকান্ত বলিতেছেন, "ব্রহ্মই আমার অন্তরে বিদ্যমান, কিন্তু বাজীকর যেমন অপ্রকৃতের আবির্ভাবকে প্রকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, প্রকৃতের অস্তিত্বকে গোপন করে, আমরাও সেইরূপ ব্রহ্ম বাজীকরের খেলা বুঝিতে না পারিয়া আপনার ও জগতের স্বরূপতত্ত্ব অনুধাবন করিতে পারি না। সাধক গাহিয়াছেন,—

আপনারে আপনি দেখ, যেওনা মন! কারো ঘরে।
যা চাবে, সেই খানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন পরশমণি, যে অসংখ্য ধন দিতে পারে।
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥
তীর্থ গমন দুখে ভ্রমণ, মন! উচাটন হয়োনা রে।
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হওনা মূলাধারে॥
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজী এ সংসারে।
ওরে বাজীকরে চিন্‌লে না মন, সে তোমার ঘটে বিরাজ করে॥

প্রেম ও ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হয়। তৎসঙ্গে তন্ময় ভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে। হৃদয়ে তন্ময় ভাবের অঙ্কুর হইলে ভেদ জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম ভেদ, জাতি ভেদ, থাকে না। মানব যেমন নিজ কথা শুনিলে কর্ণপাত না করিয়া থাকিতে পারে না, পরমুখ নিঃসৃত তৎসম্বন্ধীয় বাক্য তাহার হৃদয়কে গুরুতর ভাবে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ঈশ্বরের নাম যে অবস্থাতে যে রূপে হউক, কর্ণগোচর হইবামাত্র, সাধকের চিত্ত নিতান্ত বিচলিত হয়, উৎকণ্ঠা আইসে, তিনি ঈশ্বর ভাবাপন্ন হইয়া সমাধিস্থ হন। প্রবাদ আছে, সাধক কমলাকান্তের অনেক স্থলে সেই তন্ময় ভাবের আবির্ভাব হইত। একদা তিনি কয়েক জন ভক্তের সহিত কোটালহাট হইতে তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে ছিলেন। দিবসপতি প্রায় অস্তমিত অবস্থায় ধরাতলে পতিত। তাঁহার রক্তিম কিরণ মালা দিঙ্মণ্ডল, আকাশমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। সাধক ও ভক্তবৃন্দ বড় রাজপথে চলিতেছেন। ভক্তদিগের মধ্যে কেণারাম ও বিশু সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, একজন মুসলমান সামান্য উত্তরীয় খণ্ড আসন স্বরূপ ভূমিতলে সন্নিবেশ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে নামাজ মন্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরের স্তুতিবাদ করিতেছেন। সাধক ভক্তবৃন্দের সহিত নামাজকারীর অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় প্রেমবারি বিগলিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি তন্ময় ভাবাপন্ন হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে এক স্থানে দণ্ডায়মান রহি-

লেন। নামাজ শেষ হইল, কিন্তু সাধক তদবস্থায় রহিলেন। ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেণারাম তাহার অধিক প্রিয় ছিলেন। কেণারাম তাঁহার সমাধিভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চরণে হস্তার্পণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বভাব উপস্থিত হইল। মুসলমান কহিল, তোমরা এখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে কি দিখ্‌ছিলে ?" কেণারাম কহিলেন, তুমি উচ্চৈঃস্বরে ভগবানকে ডাকিতে ছিলে, আমাদের এই ঠাকুর তোমার নামাজ পাঠ শুনিয়া ভগবানের ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। ইহার বাহিরের জ্ঞান লোপ হইয়াছিল।" নামাজকারী বলিল, "ভগবান এক, রাম, রহিম দোসরা নাই। যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তবে তোমাকে আমি ভালবাসিব, এ সোঝা কথা। এই ঠাকুর ভগবানকে ভালবাসে, তাই ভগবান একে ভালবাসে। বাবা মানুষেই সব আছে, মানুষেই পীর পয়গম্বর হতে পারে। এ ঠাকুর বড় বড়িয়া লোক।" কথিত আছে, "সেই মুসলমান তদবধি প্রায়ই কোটালহাটে সাধকের নিকট আসিত ও সাধককে বড় ভক্তি করিত।" কেণারামের কোটালহাটে অবস্থান কালে তিনি তথায় যাহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অমরায় গড়ে নিজ বন্ধু বান্ধবের নিকট প্রকাশ করেন। সেই সকল ঘটনা এখনও কিম্বদন্তীরূপে জীবিত আছে। তাহার মধ্যে দুই একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

সাধক গাহিয়াছেন,—"তোমার দ্বৈত ভাবে দিবস গেল, চিদানন্দ রয় কেমনে।" দ্বৈতভাবে বিমলা ভক্তি ও বিশুদ্ধ আনন্দের বিঘ্ন হয়। সাধক বাহিরে শক্তি সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়

বলিয়া অনুমিত হইলেও ধর্ম্মরাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। বর্দ্ধমান ও তাহার নিকটবর্ত্তী যে কোন স্থানে অহোরাত্র কি ক্রিয়ার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইত, কিম্বা যে কোন স্থানে মহোৎসব ও বুক্ষা কালীর পূজাদি হইত, সর্ব্বত্রই সাধকের অধিষ্ঠান হইত। তিনি সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায়ের শিরোমণি রূপে গৃহীত হইতেন। হরিনাম-মধুরস-মুগ্ধ-ভক্তঅলি-বৃন্দের সুস্বরে লোকালয় মুখরিত হইলে, প্রেম পরিপূর্ণ কৃষ্ণ সঙ্গীত সাধকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া সকলকে প্রেমোন্মত্ত করিত। সাধকের রচিত অনেক গুলি সুললিত ভক্তিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেম সঙ্গীত আছে। গৌর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গ্রাম পল্লী টলমল করিলে, সাধকের টলমল ভাব আসিত। অনেক সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া শ্যামার চরণে সমাধি হইতেন। কথিত আছে, কোটালহাটে একজন স্বর্ণকার ছিল। তাহার বাটী সাধকের কালী বাটীর অতি নিকটবর্ত্তী। স্বর্ণকারের কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর। সে স্বকর্ম্মে নিরত থাকিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদির সংস্কার সময়ে, হাতুড়ীর প্রতি আঘাতে তাল দিয়া শ্যামা সঙ্গীতে সুখী হইত। সাধকের শয়ন গৃহ হইতে তাহার সঙ্গীত সুস্পষ্ট ভাবে শোনা যাইত। অনেক সময় তাহার সঙ্গীত শ্রবণে সাধকের নয়ন বারি বিগলিত হইত, কখন কখন তাঁহার সমাধি ভাব আসিত। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর স্বর্ণকার সাধকের নিকট আসিয়া তাহার চরণ দর্শন করিয়া যাইত। সে দিন যুবরাজ প্রতাপচাঁদ সাধকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে, স্বর্ণকার সাধকের

নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইল। সাধক তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "এ ব্যক্তি সর্ব্বদা জগদম্বার গুণানুকীর্ত্তনে সুখী হইয়া থাকে।" কেণারাম কহিলেন, "স্বর্ণকার! তুমি সুখী, তুমি প্রতিদিন ঠাকুরের চরণ দর্শন করিয়া সুখী হও। আমি দেখিতেছি, ঠাকুর তোমার প্রতি প্রসন্ন। সাধু সহবাসই সংসার সাগর উদ্ধারের একমাত্র উপায়। আমাদের অনুনয়ে তুমি আজ আমাদিগকে সঙ্গীত দ্বারা সুখী কর।" বিশু কহিল, "ইনি বেশ গান কর্ত্তে পারেন। কিন্তু নিজের দোকানে বসে, হাতুড়ীর তাল না দিলে, গানের বেশ সুবিধা হয় না। আমাদের ঠাকুর এর গান শুনে ঘুমিয়ে পড়েন।" কেণারাম কহিলেন, "ভগবান ভাবগ্রাহী, তিনি মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়া দেখেন না, অন্তরের ভাব দেখেন। আমা-দের ঠাকুর ইহার বাহ্যিক ক্রিয়া উপেক্ষা করিয়া অন্তরে প্রেমের ভাবে বিভোর হন।" স্বর্ণকার কহিল, "ঠাকুর, হাতুড়ীর আঘাতে আঘাতে তাল দিয়ে গান কল্লে আমার বড় মনঃসংযোগ হয়, তা না হলে বড় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়, গান কর্ত্তে ভয় করে। হাতুড়ী হাতে, সোণা রূপার পাত ধরে, তাল দিয়ে, গান কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে, আর আমার কোন দিকে মন যায় না। বুকের মাঝে ঐ কালীমার দুটী চরণের দিকে মন রেখে, আমি প্রাণ খুলে গান করি। দেবতারা বলতে পারেন, কেন! আমার অন্য সময়ে সে ভাব আসে না।" কেণারাম কহিলেন, "তুমি হাতুড়ীর মত হাতে তাল দিয়া, গান করিতে অভ্যাস কর, ক্রমে তোমার

ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। এখন তুমি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া সঙ্গীত দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর।" বিশু কহিল, "হাতুড়ীর তাল না দিলে, এর মুখে গান আদতেই বার হবে না, আপনার মিছে অনুরোধ। ঠাকুর কহিলেন, "হাতুড়ীর তাল দেওয়া বেশী কষ্টকর নয়, বাড়ী নিকটে, হাতুড়ী ও একটা রূপার পাত আনিয়া আঘাত করিতে করিতে স্বর্ণকার গান করিতে পারে।" স্বর্ণকার ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ নিজের দোকানে একটী রূপার পাত ও লৌহ খণ্ড আনিয়া হাতুড়ীর তাল দিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিল,—

মন গরীবের কি দোষ আছে, তারে নিন্দা কর মিছে।
বাজিকরের মেয়ে (শ্যামা), তারে যেমন নাচায় তেমনি নাচে ॥
শুনেছ দীন দয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে।
আপনাকে যে আপনা ভোলে, পরের বেদন কি তার কাছে ॥
আপনি যেমন শঠের মেয়ে, তেম্নি সঙ্গ ভাল মিলেছে।
সে লেংটা থাকে, ভস্ম মাখে, লোকে ভাল বলে পাছে ॥
তবে যে কমলাকান্ত, ও চরণে প্রাণ সঁপেছে।
তাতে ভিন্ন, নাহি অন্ন, নৈলে কেন সার করেছে ॥

কেণারাম কহিলেন—ঠিক ভাই যাঁর অহং বোধ নাই যে নির্ব্বিকার সে কি পরের বেদনা বুঝিতে পারে। মায়ের কাছে আমরা কত কথাই বলি। মাকে না বলিয়া আর কার কাছে আব্‌দার করিব। স্বর্ণকারের সুমধুর সুস্বরে কালী বাড়ী আমোদিত হইতেছে, এমন সময় মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর কয়েকজন

অমাত্য সহ কালী বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সুস্বরে আকৃষ্ট হইলেন, তাহার গমনে সঙ্গীতের বিঘ্ন হইবে বিবেচনা করিয়া সঙ্গীত শেষ পর্য্যন্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকিলেন। সঙ্গীত শেষে জগদম্বার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক গৃহ প্রবেশ করিলেন। মহারাজা বাহাদুর বিশু প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন, আমরা আপনাদের আনন্দের বিঘ্ন ঘটাইলাম। কে গান করিতেছিলেন? তাঁহার কণ্ঠস্বর আমার সুমধুর বলিয়া বোধ হইল। লৌহখণ্ডে আঘাতের তাল দিয়া গান হইতেছিল, এখানে কি যন্ত্র নাই? কিম্বা যন্ত্র নিপুণ কেহ নাই?" মহারাজা বাহাদুর আসিবামাত্র স্বর্ণকার হাতুড়ী হস্তে একধারে দাঁড়াইয়াছিল। সাধক তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, এই ব্যক্তি গান করিতেছিল। ইহার বাস কোটাল হাট, আপনার প্রজা, জাতিতে স্বর্ণকার। সংস্কার বশতঃ হাতুড়ীর তাল না দিয়া এ ব্যক্তি গান করিতে অক্ষম, আমার ইচ্ছায় ঐ লৌহখণ্ডের উপর হাতুড়ীর আঘাত করিয়া গান করিতেছিল। ইহার উদারতা আছে, ভক্তি শূন্য নহে।" মহারাজা বাহাদুর স্বর্ণকারকে বসিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, স্বর্ণকার! আমি তোমার সঙ্গীতে প্রীত হইয়াছি। তুমি যন্ত্রের সহিত সঙ্গীত অভ্যাস কর, সুগায়ক হইবে।" ইহা কহিয়া রাজা বাহাদুর সাধককে কহিলেন, আপনার অবর্ত্তমানে আমি এখানে সন্ধ্যার পর একদিন আসিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারি নাই, আজ আমি বিমলার অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিতেছি।

মায়ের প্রসন্ন বদন ও নয়ন যুগলের জ্যোতিঃ নীল নভস্তলে শুক্র-তারার জ্যোতির ন্যায় দর্শন করিতেছি। আশ্রমের তরুরাজিরও ভাবান্তর অবলোকন করিতেছি। পূর্ণ শশীর উদয়ে আকাশ মণ্ডলের শোভা অতি বড় মনোরম হয়, কিন্তু অমানিশিতে সেই আকাশ মলিন ভাব ধারণ করে। আজ আপনার আগমনে এই আশ্রম গগন ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন অনুভব করিতেছি। এখানে সকলই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এক বস্তুর অভাবে কাহারও রমণীয়ত্ব প্রতীয়মান হয় নাই। যাহা হউক আপনাকে সুস্থ শরীরে প্রত্যাগত দেখিয়া আজ বড় আনন্দ অনুভব করিতেছি।" সাধক কহিলেন "মহারাজ! নিশ্চয়ই আপনার হৃদয় আমার সাক্ষাৎ জন্য অধিকতর প্রয়াসী ছিল, জগদম্বার দর্শন লাভ জন্য তাদৃশ ব্যাকুল ছিল না, তাই আপনি সদানন্দময়ীর প্রসন্ন বদন ও প্রকৃতি মণ্ডলীর চারুদেহ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ভক্তি ও ভালবাসার অঙ্কুর মানুষকে অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই ভক্তি ও ভালবাসা যখন মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বশক্তিতে পতিত হয়, তখনই মানুষ সাফল্য লাভ করিয়া থাকে। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা জগতের বন্ধন। জগদম্বা এখনও আমার সংসার বন্ধন ছিন্ন করেন নাই। আমি দেখিতেছি আপনারাই আমার বন্ধন। এই কেণারাম চট্টোপাধ্যায় ও আপনাদিগকে ভুলিতে পারি না কেন? এ কথা আমি অন্তর্বাসিনী মহামায়াকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি।" সাধকের বাক্য অবসান হইবামাত্র, রাজা বাহাদুর সস্মিত বদনে প্রণাম করিয়া

কহিছেন, "আপনার নাম কেণারাম চট্টোপাধ্যায় ?" কেণারাম আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "আমি আপনার অনুগত প্রজা, আমরা আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক, গুণগ্রাহী নরপতির অধিকারে বাস করিয়া থাকি বলিয়া অহঙ্কার করি। আজ আমি আপনার দর্শনে আমাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিতেছি। মহারাজা বাহাদুব মৃদুহাস্তে কহিলেন, আমি আপনার দর্শনে আমাকে আপনাপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান বিবেচনা করিতেছি। যে হেতু আপনি এই দেবতুল্য মহাপুরুষের অধিক প্রিয়। নিশ্চয়ই আপনি আমা অপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক, অধিক ভক্তিমান অধিক উদার। মহাত্মারা মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য্য দর্শন কবিয়া মানুষকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনুষ্যের বাহ্যিক বিভবের উপর ভ্রুক্ষেপও করেন না। গুরুদেব আপনার ভক্তি, প্রেম ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন, এ জন্য আপনার দর্শন আশা আমার অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। জগদম্বার ইচ্ছায় তাহা পূর্ণ হইল, এক্ষণে আমার অনুরোধ কল্য আপনি গুরুদেবেব সহিত, রাজবাটীতে গমন পূর্ব্বক আমাদেব আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।" কেণারাম মহারাজা বাহাদুবেব নিমন্ত্রণ সাদবে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমার পারদর্শিতা কিছুমাত্র নাই। ঠাকুর আমার প্রতি শ্রদ্ধা বশত আমার অশেষ দোষকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।" অনন্তর মহারাজা বাহাদুর কেণারামের বিবিধ পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক অমরারগড় ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের নানাবিধ কথা

প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ অতি বাহিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর কেণারাম চট্টোপাধ্যায় সাধক ও প্রতাপচাঁদের সহিত অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলেন, মহারাজ বাহাদুর কেণারামের পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাদ্যযন্ত্র বিশারদ, ভক্তিমান ও উদার, সেই জন্য ইনি আমাদের গুরুদেবের প্রিয়। অদ্য ইনি যুবরাজ প্রতাপচাঁদও আমার অনুনয়ে এখানে আসিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একাকী গুরুদেবের সুললিত কণ্ঠের সহিত বাদ্যযন্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিবেন।" অনন্তর সাধকের ইচ্ছানুসারে পাখয়াজ, ঢোল ও তানপূরা মাত্র আনীত হইল। সাধক হৃদয় বাসিনী ভুবনমোহিনীর ধ্যান করিয়া তানপূরা হস্তে করিলেন। কেণারাম শ্যামার চরণে মনপ্রাণ সন্নিবেশ পূর্ব্বক বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সঙ্গীত আরম্ভ হইল, সাধক গাহিলেন,—

তনুতরি ভাসিল ভব সাগরে।
মনরে সুজন নেয়ে, সাবধানে যাও বেয়ে,
দেখ যেন ডুবাও না পাথারে॥
দশেন্দ্রিয় দাঁড়ী তায়, কুপথে তরণী বায়,
যতনে দমনে রাখ সবারে।

কালী নামে ধর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল,
বেয়ে দে ভাই সুধাময় সমীরে ॥
কামাদি জগাতি ছয়, মহামন্ত্রে কর জয়,
পথে যেন বিড়ম্বনা না করে।
কমলাকান্তেরে লয়ে, কালী নামের সারী গেয়ে,
সুখে চল সদানন্দ নগরে ॥

সঙ্গীতের সুস্বরে বাদ্যযন্ত্রের সহিত সুরের সামঞ্জস্যে সমাগত সকলের হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত উঠিতে লাগিল। সেই সুস্বর ধারা সাধক ও বাদ্যকারের হৃদয়ভরা ভক্তিরসে মিশ্রিত হইয়া সকলকেই প্রফুল্ল করিল। সঙ্গীত শেষে মহারাজ বাহাদুর কহিলেন, "আজ আমরা সকলেই গুরুদেবের পরমানন্দের কিঞ্চিৎ ভাগ লইয়াছি। সকলেরই হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সঙ্গীতটী পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিবার প্রার্থনা। সংসার অতি ভীষণ স্থান, পদে পদে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। জননী ভিন্ন আর কে অজ্ঞান অন্ধ সন্তানের ভার লইবেন।" পুনর্ব্বার সঙ্গীত আরম্ভ হইল, সাধক গাহিলেন,—

যখন যেরূপে রাখিবে আমারে।
সকলি সফল যদি না ভুলি তোমারে ॥
জনম করম দুঃখ, সুখ করি মানি,
জলদবরণী যদি নিরখি অন্তরে শ্যামা।
বিভূতি ভূষণ, কি রতন মণি কাঞ্চন,
তরুতল বাস, কি রাজ সিংহাসন,

কমলাকান্তের উভয় সম সাধন,
নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে গো মা ॥

সঙ্গীত শেষ হইল, সকলেরই প্রসন্ন বদন, বিশুদ্ধ আনন্দ পরিপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তাঁহাদের তরল নয়নে দৃষ্ট হইতে লাগিল। যুবরাজ প্রতাপচাঁদ প্রেম পরিপূর্ণ গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "ভগবানের উপর ভালবাসা এমনি জিনিষ, ভগবানকে হৃদয়ে পাইলে মানুষ সব ভুলিয়া যায়। হৃদয়ে পরম বস্তুর আবির্ভাবে পরমাশান্তির উদয় হয়। তরুতল বাস, সিংহাসন উভয়ই সমান সুখ দায়ক হয়।" মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর কহিলেন, "প্রেম ও ভালবাসা হইতে এই শান্তি সুখ উৎপন্ন হয়। ভালবাসার অঙ্কুর এই সংসারকে অবলম্বন করিয়া জন্মে। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী সেই ভালবাসা বৃক্ষের রস স্বরূপ। সুহৃদ ভাবকে প্রেম বলে। সুহৃদভাব দাম্পত্য প্রেমেই বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে। মানুষের ভাগ্য প্রসন্ন হইলে, সেই প্রেম পরিপক্ক অবস্থায় অতি বাঞ্ছনীয় পরমবস্তু ভগবানের উপর পতিত হয়। নায়ক নায়িকার উক্তিতে প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের টপ্পাগানে প্রেমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।" কেণারাম কহিলেন, "মহারাজ! ব্যক্তি বিশেষে গানের ভাবার্থ বোধের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশের টপ্পাগানে প্রেমে হৃদয় আপ্লুত হয়।" সাধক ও সভাস্থ সকলকে অতি বড় প্রসন্ন দেখিয়া মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আমার গুরুদেবের মুখে আমি কখনও টপ্পাগান শুনি নাই। তাঁহার রচিত

প্রেম পরিপূর্ণ টপ্পাগান, তাঁহার মুখে শুনিতে আমাদের সকলের বাসনা হইতেছে। কল্পতরুর নিকট কোন প্রার্থনাই ব্যর্থ হয় না। আমি জানি আমার গুরুদেব সকলেরই অনুনয় রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে মহারাজা বাহাদুর সাধকের মুখে টপ্পাগান শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে সাধক নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়াছিলেন,—

(তাইতে) শিবের নয়ন ভুলেছে। ।
অতি নিরুপম চিকণ কাল শ্যামারূপ।
তা না হলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন,
হৃদয় মাঝারে রেখেছে ॥
শশী ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভ্রমে ভ্রমরিণী এসেছে ॥
হারাইয়া নিজমণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী,
রূপ নিরখিয়ে রয়েছে ॥
হেরিয়ে কুসুমধনু, অভিমানে ত্যজি তনু,
বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লয়েছে।
ওরূপ আনন্দ নিধি, কমলাকান্তের হৃদি
কমলে প্রকাশ হয়েছে।

সঙ্গীত শেষে রাজা বাহাদুর কহিলেন, "সুন্দর টপ্পা! অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব প্রকৃতি রূপিণী মহামায়ার রূপে মুগ্ধ। ভুবনমোহিনীর রূপে ভুবনেশ্বর মুগ্ধ, বিচিত্র নহে। শিব শক্তিই জগতের নায়ক নায়িকা। যে ব্যক্তি আটৈশশব সন্ন্যাসী, যিনি জগতের প্রত্যেক

বস্তুতে মহাশক্তির আবির্ভাব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, তাঁহার ভাব ও ভাষা সেই মহাশক্তির স্তুতিবাদ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।” কেণারাম কহিলেন, “মহারাজ! আমি জানি আমাদের ঠাকুর দুই একজন প্রেমিক গোস্বামীর অনুরোধে কয়েকখানি কৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। রাধা কৃষ্ণ, শিব শক্তি অভেদ না হইলেও আপনি বোধ হয় রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত শুনিতে বাসনা করেন, নায়ক নায়িকা ভাবের সুন্দর দৃষ্টান্ত ভগবানের ব্রজলীলা।” মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, “ব্রজলীলায় অভিসার, বিরহ, মান প্রভৃতি নায়িকার বিবিধ ভাবের চূড়ান্ত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী। তাহাদিগকে সংসারের নায়ক নায়িকার ভাব কিম্বা ভগবানের সখ্যভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমার গুরুদেবের মুখে আমি ত কই কখনও সেরূপ সঙ্গীত শুনি নাই।” মহারাজা বাহাদুরের বাক্য অবসান হইবামাত্র সাধক প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, “মহারাজ! আপনি কখনও আমাকে সেইরূপ সঙ্গীত করিবার অনুরোধ করেন নাই। আজ আপনি আমাকে একটী টপ্পাগান করিবার অনুরোধ করিয়া ভাবিতে ছিলেন, গুরুদেব কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, আদিরস আস্বাদনে চির বৈমুখ, ভক্তিরস পানে সর্ব্বদাই বিভোর, ইঁহার মুখে আদিরস সূচক সঙ্গীত শ্রবণের আশা বৃথা। সেই জন্য আপনার ইচ্ছানুসারে সঙ্গীত আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল।” সাধকের এই কথা শুনিবামাত্র মহারাজা বাহাদুর কহিলেন,

"গুরুদেব! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আপনি যাহা কহিলেন, আমি তাহাই ভাবিয়াছিলাম, আপনাকে চিনিতে পারিলাম না, আপনি অন্তর্যামী।" ইহা কহিয়া রাজা বাহাদুর ভক্তিভাবাপন্ন হইলে সাধক তানপূরা ধরিয়া পুনর্ব্বার গাহিলেন,—

ও শ্যাম বন্ধু। তোমায় না দেখিলে ঝরে
দুটী আঁখি, দেখিলে নয়ন জুড়ায়।
না জানি কি মন্ত্র দিয়ে, বাঁধিলে হিয়ে,
বিধু বদনখানি স্বপনে নিরখি।
ঘরে গুরুজনার ভয়, কত ছলে কত কয়,
শুনিয়া না শুনিহে মরমে মরে থাকি।
তথাপি তোমার তরে, পরাণ কেমন করে,
সুধাইও কমলাকান্তে তারে রাখি সাখী॥

সঙ্গীত শেষে যুবরাজ প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "ভগবানের দর্শন জন্য সাধকের যেরূপ উৎকণ্ঠা আইসে, তাহা আমাদের মধ্যে কমলাকান্তই অনুভব করিতে সক্ষম, তিনিই তদ্বিষয়ে সাক্ষী দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি।" রাজা বাহাদুর কহিলেন "এ গানটীকে নায়ক নায়িকা কিম্বা সাধক সাধিকার ভাবে লওয়া যাইতে পারে।" কেণারাম কহিলেন, মহারাজ! ভক্তের মন বুঝিয়া ভগবান আপন বেশ পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহাকে ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণ করিবার জন্য বহুরূপী হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বরূপত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না। আমাদের ঠাকুর অনুগত ভক্তের অনুরোধে শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন সাধনা বিষয়ক

পদও রচনা করিয়াছেন। শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে মহামায়ার আগমন সম্বন্ধে গীতাবলি সময় গুণে বড়ই মনোমুগ্ধকর হয়। সেই সকল গীতাবলিকে আগমনী বলে। আমাদের ঠাকুরের অনেক-গুলি আগমনী গীত আছে। সেই সকল গীত ভক্তবৃন্দের অনুরোধে রচিত হইয়াছিল।" মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আমি মূঢ়তা বশত গুরুদেবের মুখে সেই সকল সঙ্গীত শ্রবণে বঞ্চিত। আমি ইঁহাকে যেভাবে ধরিয়াছি, ইনিও আমার নিকট সেই ভাবে প্রকাশ হইয়াছেন। আপনারা উভয়ে ক্লান্ত হইয়াছেন, আপনা-দিগকে পুনর্ব্বার শ্রম পীড়িত করিয়া আগমনী সঙ্গীত শুনিবার বাসনা করা আমার উচিত নহে।" কেণারাম কহিলেন, মহারাজ! সঙ্গীত সাধনার অঙ্গ। আমি আজ পর্য্যন্ত গান করিয়া ঠাকুরকে ক্লান্ত কি অবসন্ন হইতে দেখি নাই। আপনাদের সন্তোষে আমিও বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি।" ইহা কহিয়া কেণারাম সাধকের মুখ পানে চাহিলেন, দেখিলেন তাঁহার ভাবান্তর ঘটিয়াছে, সভাস্থ ব্যক্তিগণের কোন কথাই তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। বৈঠকে কিম্বা ভক্তবৃন্দের মধ্যে, তাঁহার স্তুতিবাদ কি তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহার স্তুতিবাদ আরম্ভ হইলেই তাঁহার মুখবর্ণ বিবর্ণ হইত। তিনি মন প্রাণ শ্যামার চরণে সন্নিবিষ্ট করিয়া বাহেন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিতেন। অনেক সঙ্গীতেই তাঁহার ভণিতা আছে, ভণিতা দিবার উদ্দেশ্য সুনাম গ্রহণের জন্য নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে লোক শিক্ষা ও মাতৃভাবের উপাসনার পথ প্রশস্ত করিবার

উদ্দেশে তাঁহার জন্মগ্রহণ। তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার ভণিতা থাকিলে সঙ্গীত সকল সাদরে গ্রহীত হইবে ও স্তোত্র রূপ ধারণ করিবে এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গানের শেষে ভণিতা আছে। অনেক সঙ্গীতে বিষয় বাসনা, ভোগসুখাদির দমনের বিষয় উল্লেখ আছে কিন্তু সে সকল কেবল সংসারী লোকের মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন করিবার জন্য রচিত ও গীত হইয়াছিল। কেণারাম এখন ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার সমাধিভাব ভঙ্গ হইল। কেণারাম কহিলেন, "আমি আপনার রচিত একখানি আগমনী গীতের সঙ্গত করিতে ইচ্ছা করি।" ইহা শুনিয়া সাধক কহিলেন, "সময়ে সকল বস্তুই সুস্বাদু হয়! প্রত্যেক বস্তুর সুস্বাদের সময় আছে, এখন আগমনী সঙ্গীত প্রীতিকর হইবে কি?" ইহা কহিয়া সাধক গাহিলেন,—

বারে বারে কহ রাণী! গৌরী আনিবারে।
জান ত জামতার রীত অশেষ প্রকারে॥
বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি, ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী,
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা যারে।
তিলেক না ছাড়ে তারে, সদা রাখে হৃদি পরে,
সে কেন পাঠাবে তারে সরল অন্তরে॥
রাখি অমরের মান, হরের গরল পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া, শঙ্কর শীতল কায়া,
সেই অবধি হর জায়া বিচ্ছেদ না করে॥

অবলা অলপ মতি, না বোঝ কার্য্যের গতি,
যাব কিন্তু না বলিব দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ,
তায় মা বটে বুঝায়ে যদি আনিবারে পারে॥

সঙ্গীত শেষে সকলেই অতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, তাঁহারা কখনও এরূপ সুন্দর আগমনী সঙ্গীত শ্রবণ করেন নাই। এরূপে তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীত প্রভৃতি দ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভোগের পর মহারাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। কেণারাম যতদিন কোটালহাটে অবস্থান করিয়াছিলেন, প্রায়ই কোন দিন রাজ-প্রাসাদে, কোন দিন কোটালহাটে বৈঠক হইত। কথিত আছে, মহারাজা বাহাদুর তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে কতক-গুলি নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়া ছিলেন।

সাংখ্যবাদীরা বলেন, আত্মা অসংখ্য। আত্মার বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা হেতু মানবের মধ্যে এত পার্থক্য অনুভূত হয়। দর্পণ অপরিষ্কৃত থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না, পরিষ্কৃত ও পারদ সংযুক্ত থাকিলে দর্পণে সকল মূর্ত্তিই প্রতিফলিত হয়। পুণ্য পারদের সংযোগে আত্মার শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। মানুষ ক্রমে দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রাদি দেবগণও বিশুদ্ধ আত্মা মাত্র। জ্ঞান ও বুদ্ধি আত্মার শক্তি। দেবতাদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ আত্মা মানবই অসাধারণ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হন। দেবতা সদৃশ সাধক কমলাকান্তের অনেক অমানুষিক কর্ম্ম সম্পাদনের প্রবাদ আছে। বর্দ্ধমান ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ভদ্রলোকের

বৈঠকে সাধু সন্ন্যাসীর কথা উত্থাপিত হইলে, সাধক কমলাকান্ত উচ্চাসন পাইয়া থাকেন। তাঁহার ভক্তি, প্রেম, তৎকৃত অসাধারণ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া সকলে সুখী হন। কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের কোটাল হাটে অবস্থান কালে সংঘটিত একটী অপূর্ব্ব কর্ম্মের জনশ্রুতি আছে, তাহা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী সাঁকো মোহন পুর নামক গ্রাম নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। সাঁকো বর্দ্ধমানের ৪।৫ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, ধার্ম্মিক, বিষয়ী ও নিরহঙ্কারী ছিলেন। তাঁহার সাংসারিক সমুদয় ধর্ম্ম কর্ম্মে সাধকের শুভাগমন হইত। একদা কোন ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্রাহ্মণ কোটাল হাটে আসিয়া বিনয়ের সহিত তাঁহাদের সকলের নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধক বিশু ও কেণারাম উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে সাদরে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ভৈটে পালসিটের একজন কায়স্থ সাঁকো মোহন পুরের ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহার ভক্ত ও প্রিয় ছিলেন। ভৈটে পালসিট্ গ্রাম বর্দ্ধমানের ৪।৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। কায়স্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় সাত্ত্বিক ও ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ বিষয় সম্পত্তি ছিল না। কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার পোষ্য ও প্রতিপাল্য অনেকগুলি ছিল। তিনি স্বহস্তে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন। তিনি সংসার চিন্তার মধ্যে, যখনই সময় পাইতেন, কোটালহাটে ঠাকুরের নিকট আসিয়া, তাঁহার চরণ দর্শনে সকল জ্বালা ভুলিয়া

খাইতেন। তিনি ঠাকুরের মুখ চাহিয়া প্রাণ খুলিয়া, মনের কথা বলিতেন। হাস্যমুখে সংসারের গুরুভার বহন করিয়া ঠাকুরের চিন্তায় পরমানন্দ ভোগ করিতেন। ভক্তি ও ভালবাসার বশ জগৎ। ঠাকুরও তাঁহাকে সাঁকো মোহন পুরের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার নয়নে দেখিতেন। কায়স্থ মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিতেন, "আমি এমনি দুঃখী, আপনার একদিনও মনোমত সেবা লইতে পারিলাম না।" সাধক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "আমি অনেকবার তোমার বাটীতে অতিথি হইয়াছি। মানুষ নিমন্ত্রণ কারীর যথেষ্ট ভোজ্য পানীয় প্রদান অপেক্ষা, তাঁহার যথেষ্ট বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনের পক্ষপাতী হয়। আমি বুঝিতেছি, তোমার গৃহে আমার গমনে, তুমি দোল দুর্গোৎসবের ন্যায় নিমন্ত্রণ ও ভোজনের আড়ম্বর করিতে পারনা বলিয়া দুঃখিত, নিজের অবস্থায় কখনও দুঃখিত হইও না।" কায়স্থ ঠাকুরের বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া সকল অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিতেন। একদা তিনি ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আজ মাসাবধি কাল আমার পরিবারবর্গ আপনার চরণ দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। পরশ্ব ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে আপনি ভক্তবৃন্দের সহিত আমার গৃহে পদার্পন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। আপনার গমন উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইবে।" কায়স্থের হৃদয়ের আকিঞ্চন ও ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া সাধক অতিশয় প্রসন্ন হইলেন, জগদম্বাকে ধ্যান

করিতে করিতে প্রফুল্ল মনে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, সাঁকো মোহন পুরের ব্রাহ্মণের নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণের কথা ভুলিয়া গেলেন। সাধক কহিলেন, "অমরার গড়ের কেণারাম চট্টোপাধ্যায় এখানে আছেন, তিনি তাঁহার সহিত পরশ্ব প্রত্যূষে ভৈটায় তাঁহার বাটীতে গমন করিবেন।" তৎকালে বিশু ও কেণারাম তথায় উপস্থিত ছিলেন না। কায়স্থ কহিলেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আমার বাটীতে গমন জন্য অনুরোধ করা আমি উচিত বিবেচনা করি।" সাধক কহিলেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিমান শূন্য, তাঁহার গমনের ভার আমি লইলাম, তোমাকে ৪।৫ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে, বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র গৃহে যাও।" কায়স্থ ঠাকুরের পদ ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময় সাধক কেণারাম ও বিশুকে লইয়া যাইবার জন্য সাঁকো মোহন পুরের ব্রাহ্মণের জনৈক দাস কোটালহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধক আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তিনি কেণারাম ও বিশুকে কহিলেন, "আমি ভ্রম বশত আমাদের পরিচিত ভৈটে পালসিটের সেই বিনীত কায়স্থের বাটীতে কল্য প্রত্যূষে উপস্থিত হইব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছি। কল্য প্রত্যূষে আমাদের সাঁকো মোহন পুরে যাইবার কথা স্থিরীকৃত আছে। আমরা উভয় স্থলে যথা সময়ে উপস্থিত না হইতে পারিলে তাঁহারা উভয়েই দুঃখিত হইবেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজনাদির বিলম্ব

ও বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। ভৈটে ও সাঁকো প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী, এক সময়ে এক দিনে উভয় স্থানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা অসম্ভব।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আপনি কখন ভৈটে যাবার কথা দিয়েছেন, আমরা ত কিছুই জানি না। এখন উপায় কি? ঠাকুর আমাদের ভোলা মহেশ্বর! নিশ্চয়ই কায়স্থটী প্রাণ খুলে নিজের দুঃখ আকিঞ্চন জানিয়েছেন, ঠাকুর তাঁর মনের ভাব দেখে, দুঃখ ভেবে সাঁকো মোহন পুরের কথা ভুলে গেছেন।" সাধক কহিলেন, "বিশু! তুমি আমার স্থানীয় হইয়া মোহনপুরে যাও, আমি কাল ভৈটে যাইব।" বিশু কহিল, "আমার একা মোহনপুর যাওয়া হবে না, শুনুন ঠাকুর! আমার একটা কথা মনে পড়্লো, আমি একদিন কালীয়দমন যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম। প্রথমে ব্যাসদেব তারপর তার চেলা কাসদেব এল। সকলেই বল্তে লাগলো এর পর মূল গায়েন আস্বে। কাশদেব মুখ ভঙ্গি করে, লোক গুলোকে হাসাতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে কাশদেব আসর রাখলে। ভদ্রলোক সব ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠলো। একজন ভদ্রলোক আর না থাক্তে পেরে দাঁড়িয়ে কাশদেবকে বল্লেন, "ও কি হচ্ছে? কেন সময় নষ্ট কচ্ছ? যাও মূল গায়েনকে পাঠিয়ে দাও।" কাশদেব সংসেজে এসেছিল, তাড়া খেয়ে আসর ছেড়ে পালাল! ঠাকুর আমারও প্রায় সেই দশা হবে। আমাকে একলা দেখে সাঁকো মোহন পুরের ভক্তবৃন্দ কেউ সন্তুষ্ট হবেন না।" সাধক একটু হাসিয়া কহিলেন, "বিশু! আমি কাহাকেও কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। এখন উপায় কি?"

ইহা কহিয়া সাধক সম্মুখস্থ প্রসন্নময়ী বিমলার প্রতি কাতর নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মা! তুমি ত আমার অন্তরে ছিলে, যাহা বলাইয়াছ তুমিই বলিয়াছ, আমি কিছুই জানি না।" ইহা কহিয়া সাধক ধ্যানস্থ হইলেন। বিশু ও কেণারাম সাধকের ভাব দেখিয়া ভীত ভাবে তাঁহার নিকট উপবিষ্ট রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সাধক কহিলেন, "বিশু! ভৈটে পালসিটের কায়স্থের ভক্তিগুণে মায়ের তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠান হইবার ইচ্ছা। নিশ্চয়ই আমাদের বেশে কায়স্থের গৃহে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইবে। ইচ্ছাময়ীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। আমরা কল্য প্রভাতে সাঁকো মোহন পুরে গমন করিব।" ইহা কহিয়া সাধক কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। সাধক যথা সময়ে ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভক্তবৃন্দের সহিত পরমানন্দে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া পর দিন কোটাল হাটে প্রত্যাগমন করিলেন। বিশু ও কেণারাম জানিতেন, ঠাকুরের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, তথাপি তাঁহারা ভৈটে পালসিটের রহস্য জানিবার জন্য উৎসুক রহিলেন। দুই একদিন পরে ভৈটে পালসিটের কায়স্থ কোটাল হাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সকলকে ভৈটে হইতে সুখে প্রত্যাগমন প্রশ্ন করিয়া কায়স্থ কহিলেন, "আমার গৃহে আপনাদের পদার্পণে আমি আমাকে মহাভাগ্যবান বিবেচনা করিতেছি।" বিশু ও কেণারাম বুঝিলেন, তাঁহাদের বেশে কায়স্থের গৃহে ভক্তবৎসলার আবির্ভাব হইয়াছিল। কেণারাম

কিছুমাত্র উত্তর না করিয়া কায়স্থকে মহাভাগ্যবান বিবেচনা পূর্ব্বক অভয়ার চরণ ও সাধকের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাবান্তর অতি গভীর হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "মা ইচ্ছাময়ী! তুমি কখন কাহার প্রতি প্রসন্ন নয়নে চাও, তুমিই জান।" ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া ভাবিলেন, "ধন্য এই মহাপুরুষ! যাঁহার ইচ্ছায় কায়স্থের গৃহে ভক্ত বৎসলা অভয়ার অধিষ্ঠান হইয়াছিল। আমরাও মানুষ কিন্তু আমাদের সহিত এই মহাপুরুষের এত প্রভেদ! একই ভূগর্ভে হীরক ও অঙ্গারের উৎপত্তি হইয়া থাকে।" সাধক কেশারামের প্রাণের উচ্ছ্বাস বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে অন্য ভাবে লইবার জন্য কায়স্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দিন তোমার সমুদয় কর্ম্ম ইচ্ছানুরূপ সম্পন্ন হইয়াছে ত?" কায়স্থ কহিলেন, "আপনার কৃপায় আমার কোন বস্তুরই অভাব হয় নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই বলিয়াছেন, তাঁহারা জীবনে কখন এরূপ সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করেন নাই। আমার আয়োজনের উপযুক্ত লোক অপেক্ষা অনেক লোক অধিক ভোজন করিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছি, আপনার গমনে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইয়াছিল। আমি অতি দীন, আয়োজনের অভাব, পাছে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তৃপ্তিলাভ না করেন, এ ভয়ে আমি অতি ভীত ছিলাম। সমস্ত দিন আমি নয়নজলে অন্নপূর্ণার কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনার শান্তিময় মুখ ও চরণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম।" সাধক কহিলেন, "তোমার ভক্তিগুণে যথার্থই তোমার গৃহে

অন্নপূর্ণার শুভদৃষ্টি হইয়াছিল।" ইহা কহিয়া সাধক সে দিনের ঘটনা কায়স্থের নিকট গোপন রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ সুখালাপের পর কায়স্থ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এ স্থলে আর একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন সাধক বিশু ও কেণারামের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণকার তথায় উপস্থিত ছিল। কেণারাম কহিলেন, "ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কোন বস্তু বিষয়ের প্রতি চিত্তের সন্নিবেশকে সাধনা বলা যায়। আরাধ্য বিষয়ের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্তিই সাধনার উদ্দেশ্য। তাল মান ও সুরের সহিত আপনাকে মিশাইতে পারিলেই সঙ্গীত সাধনার সাফল্য লাভ হয়। ঈশ্বর সাধনার সার্থকতা সাযুজ্য। শব সাধনার উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। শবত্ব প্রাপ্তি দ্বারা কি প্রকারে চিত্তশুদ্ধি ঘটিতে পারে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি না।" ঠাকুর কহিলেন, "সুখ দুঃখে সমবোধ, ভয় ক্রোধ ও অভিমান শূন্য হইলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। শব-সাধনা দ্বারা চিত্তের সর্ব্বপ্রকার সমতা সাধিত হয়। মন্ত্র দ্বারা প্রেত দেহে আত্মার পুনঃ সঞ্চারে সাধক দেখিতে পান এ জগতে কেবল মাত্র আত্মাই নিত্য বস্তু আর সমুদয় পদার্থই নশ্বর। জড়বৎ এই জগতে কেবল মাত্র আত্মার সঞ্চারে জীবভাবের বিকাশ হইয়াছে। শব সাধনায় কৃতার্থ ব্যক্তি দেখিতে পান মায়াময় এই বিশ্বের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি আত্মা। অতএব শবসিদ্ধ পুরুষ মায়ামোহকে সহজে উপেক্ষা করিতে পারেন। মায়ামোহ হইতে সংযোগ, বিয়োগ, অভাবজাত সুখ দুঃখের অনুভূতি হইয়া

থাকে, কিন্তু মায়ার স্থানে সংসারে সতত এক অপরিবর্ত্তনীয় আত্মারূপী নিত্য বস্তুর অবস্থান অবলোকন করিয়া সিদ্ধ পুরুষ সুখ দুঃখকে হৃদয়ে স্থান দেন না। নিজ দেহ, পর দেহ, জড়বৎ শবদেহ, ইহাদের পৃথকত্ব অনুভব না হওয়াতে শব-সাধন-সিদ্ধ পুরুষ ক্রোধ ও অভিমান শূন্য হইয়া থাকেন। শব সাধনা অতি বীভৎস কর্ম্ম। প্রেমিক উদার, বিশ্বাসী ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধির জন্য শব সাধনার প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা সহজেই রাজযোগের অধিকারী হন। ঘোর কর্ম্মী, আত্মগ্লানি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে শব সাধনা ব্যবস্থা। শব সাধনা দ্বারা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহারা কোনও কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, তাঁহারা নিমিত্ত মাত্র। শব সাধনা দ্বারা বিশুর আত্মগ্লানি দূরীভূত হইয়াছে। আমি মধ্যে মধ্যে বিশুকে শব সাধনায় নিয়োগ করিয়া থাকি। আজ শব সাধনার সুন্দর দিন মঙ্গলবার, স্বাতীনক্ষত্র অমানিশি। প্রেত পুরুষদিগের পরিতোষের প্রশস্ত সময়। অদ্য বিশুকে আমরা শবসাধনায় নিয়োগ করিব। আমি জানি বাঁকানদীর তীরবর্ত্তী বটবৃক্ষে একব্যক্তি উদ্বন্ধনে দেহ ত্যাগ করিয়াছে। তাহার দেহ ঐ বৃক্ষে লম্বমান আছে। অদ্য গভীর রাত্রে বিশু সেই বটবৃক্ষতলে গমন পূর্ব্বক শবদেহ এই স্থানে আনিয়া সাধনা করিবে। আমার বিশ্বাস বিশু কৃতকার্য্য হইবে।" সাধকের কথা শুনিয়া বিশু কহিলেন, "ঠাকুর। আপনার কৃপায় আমি হাস্‌তে হাস্‌তে শবদেহ এখানে আন্‌বো। আমি শবসাধনা করে বুঝেছি, এ জগতে সকলেই এক শক্তির বলে চল্‌ছে। সেই

শক্তির কাছে মৃত কি জীবিত দুটী কথা মাত্র! সেই শক্তির উদ্বোধনই সাধনা। সেই শক্তিই আমার মা কালী। আজ আমি মা কালীকে হৃদয়ে রেখে, আপনার কৃপায়, প্রেতাত্মার সহিত আপনার আত্মা মিশিয়ে, জগতের স্বরূপভাব দর্শন কর্ব্বো।" বিশুর কথা শুনিয়া কেণারাম ভাবিলেন, মানুষের সুকৃতি কি পরম বস্তু। সাধু সহবাসে সেই মহাপাতক বিশুর কি অপূর্ব্ব ভাবান্তর। সেই কলুষিত আত্মার কি নির্ম্মল ভাব। অধঃপতিত অজ্ঞান অন্ধকার আচ্ছন্ন জীব আজ জগতের উচ্চস্থানে অবস্থান করিয়া জ্ঞানালোকে আত্মতত্ত্ব লাভ করিবে। পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণকার তথায় উপস্থিত ছিল। সে ভাবিল, ঠাকুর কহিলেন, "শবদেহ উন্মোচন করে এখানে আন্‌তে পারলেই কার্য্য সিদ্ধি হবে, আমি বিশু বাবার আগে বাঁকানদীর তীরে গিয়ে সেই শবদেহ ঠাকুরের নিকট আন্‌বো। ইহা ভাবিয়া স্বর্ণকার সন্ধ্যার পর তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। নিশীথ সময়, নির্জ্জন প্রদেশ, প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ, শবদেহের বিকৃতভাবে অবস্থান, স্মরণ করিয়া স্বর্ণকারের হৃদয় মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইতে লাগিল। সে দেখিয়াছিল, মদ্যপান দ্বারা তাহার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা নষ্ট হয়, সেই জন্য স্বর্ণকার যথেষ্ট মদ্যপান পূর্ব্বক গভীর রাত্রে সেই বটবৃক্ষতলে গমন করিল, ঊর্দ্ধে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, এক কৃষ্ণকায় লম্বিত রহিয়াছে। মদ্যপান দ্বারা বিকৃত মস্তক, শবাদির সংশোধন রঙ্গে অনভিজ্ঞ, স্বর্ণকার তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরোহণ করিল। শবশরীর

উন্মোচন আশায় বন্ধন সূত্রে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র এক বিকট হাস্যে সমুদয় বৃক্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল। সে শবের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সেই ভীষণ মূর্ত্তি বিকৃত নয়নে বিশাল দন্তে, তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, বাহুযুগ উর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছে। সেই বীভৎসভাব দর্শন করিবামাত্র স্বর্ণকার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিশু বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আবরণ মধ্যে একটী দীপ অমানিশির গাঢ় অন্ধকার মধ্যে খদ্যোতিকার ন্যায় জ্বলিতেছে, ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, স্বর্ণকার মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত, বৃক্ষশাখায় শবদেহ লম্বমান রহিয়াছে। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া স্বর্ণকারকে উঠাইয়া বসাইলেন। স্বর্ণকারের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলেও সে উঠিয়া দাঁড়াইতে অক্ষম। বিশু তাহাকে তদবস্থায় রাখিয়া ঠাকুর প্রদত্ত মন্ত্র উচ্চারণ, শবাসনাকে হৃদয়ে ধ্যান, ঠাকুরের চরণ স্মরণ ও বটবৃক্ষকে নমস্কার পূর্ব্বক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। তিনি শবের গলদেশের সূত্রে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র এক বিকট চিৎকারে বৃক্ষশাখা কম্পিত হইল। বিশু কিছুমাত্র ভীত না হইয়া শবদেহ উন্মোচন করিলেন, তাহার অট্টহাস্যের সহিত নিজ মৃদু মধুর হাস্য মিশ্রিত করিয়া দেহ উত্তোলন পূর্ব্বক স্কন্ধে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। 'বটবৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বট বনস্পতিকে পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া স্বর্ণকারকে অপর স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। শবদেহের বিকৃত মুখভঙ্গি অট্টহাস্য ও অঙ্গ সঞ্চালনে স্বর্ণকার পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইল। বিশু উভয় দেহকে স্কন্ধে করিয়া সাধকের

নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণকারকে সাধক ও কেণারামের নিকট স্থাপন করিয়া তিনি যেরূপে তাহাকে বটবৃক্ষমূলে পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের নিকট বর্ণন করিলেন। সাধকের ইচ্ছানুসারে বিশু শবদেহ লইয়া সাধনার জন্য কালীগৃহের পৃষ্ঠদেশে গমন করিলেন। কেণারাম স্বর্ণকারের শুশ্রূষা দ্বারা চৈতন্য দান করিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। স্বর্ণকারের মস্তক তখনও ঘূর্ণিত হইতেছিল। সে পুনর্ব্বার শয়ন করিয়া পাগলের ন্যায় সাধক ও কেণারামের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সাধক কহিলেন, "বিশুকে শবদেহ আনয়ন করিবার উপদেশ দিবার সময় স্বর্ণকার এখানে উপস্থিত ছিল। অনভিজ্ঞ ও অনধিকারী ব্যক্তির নিকট কোন গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করা উচিত নহে। ইহা তন্ত্র নিষিদ্ধ, আমরা তন্ত্রের উপদেশ অনবধানতা প্রযুক্ত লঙ্ঘন করিয়াছি। দোষ আমাদের, আহা অপরিণামদর্শী স্বর্ণকার নিজ হিত কামনায় মহা অনর্থের ভাগী হইয়াছে।" ইহা কহিয়া সাধক জগদম্বার প্রতি সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। আতুর ব্যক্তির সহস্র দোষ থাকিলেও তিনি তাহার দুঃখে কাতর হইতেন। কেণারাম তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ও উপায় দ্বারা ভূতোপহতচিত্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া স্বর্ণকারকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। স্বর্ণকার সাধক ও কেণারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজগৃহে গমন করিল। এদিকে বিশুর শবসাধনা আরম্ভ হইল। কালীগৃহের পৃষ্ঠদেশে গভীর গর্জ্জনে সমুদয় গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল। সাধক ও কেণারাম প্রেতাত্মার বশীকরণ মন্ত্রে উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখিয়া হাস্য করিতে

লাগিলেন। কথিত আছে, বিশু এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর কেনারাম চট্টোপাধ্যায় কিয়দ্দিবস কোটালহাটে অবস্থান করিয়া সাধক ও মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অম্বয়ার গড়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

দশম অংশ।

জন্ম ও মৃত্যু অতি সাধারণ, কিন্তু মানবের পক্ষে উভয়ই অতি ভয়ানক। জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর ভয় অধিক, কারণ মানব জন্মের পর জীবের যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে তাহা সে স্বচক্ষে দেখিতে পায়, কিন্তু মৃত্যুর পর সমুদয় ঘটনাই তাহার চক্ষে অদৃশ্য, অনিশ্চিত ও কল্পিত। জন্ম অপেক্ষা সাধারণের পক্ষে মৃত্যুর ভয় অধিক হইলেও বিশুদ্ধ আত্মা মোক্ষ প্রয়াসী মানব মৃত্যু অপেক্ষা জন্মান্তরকে অধিক ভয় করিয়া থাকেন, কারণ তিনি দেখেন, কাল অনন্ত, সংসারের দুঃখজাল অসীম, জীব সর্ব্ব সেই দুঃখজালে নিরন্তর পিড্যমান হইতেছে। তিনি আরও দেখেন, জন্মের পর মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু মৃত্যুর পর জন্ম গ্রহণ রোধ করা মানবের সাধ্যের অতীত নহে। একদা সাধক বিশুকে কহিলেন, "দেখ বিশু! পুনঃ পুনঃ জননী জঠর শয়ন যন্ত্রণা ভোগ অপেক্ষা এ জগতে অধিক কষ্টকর আর কিছুই নাই। বুদ্ধিমান মানব সংসারের দুঃখ জাল হইতে চির শান্তি লাভ করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু শান্তি লাভের বিঘ্ন অনেক, লক্ষ জনের মধ্যে একজন কৃতকার্য্য হন। শিরোমণি মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন, ঘুড়ী লক্ষে দুটো একটা কাটে, হেসে দেন মা হাত চাপড়ী।" তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে,

এক্ষণে তুমি মোক্ষার্থী হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হও।" বিশু কহিলেন, "ঠাকুর! আপনি ত বরাবরই বলে আসছেন, আমি থাকতে কিছু হয় না। আমিত্বটুকু ছেড়ে দিতে পারিলেই, সুখ দুঃখ, মান অপমান, তুমি আমি সব এক হয়ে যায়। এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। সে কি সহজ কথা ঠাকুর! ক্ষুধা তৃষ্ণা থাক্‌বে না। দেহকে উপেক্ষা করে আত্মাতেই মন প্রাণ রাখ্‌তে হবে। শরীরের মধ্যে একটা কাঁটা ফুটলে তার যন্ত্রণা উপেক্ষা কত্তে পারি না। এ দেহটাকে একেবারে মাটীর মত বোধ কর্‌বার শক্তি কবে কিরূপে আমার জন্মাবে আমি বুঝতে পার্‌ছি না। ঠাকুর! এ দেহটা কি? আমাকে বেশ করে বুঝিয়ে বলুন দেখি!" সাধক কহিলেন, "বিশু! মুক্তিলাভ সহজ নয়, সে কথা সত্য। মুক্তি এক জন্মে হয় না। মুক্তি বহু জন্মের সাধনার ফল। দেহ কি জান! বাজীকরের ঝুলি, ইহাতে সব আছে, আবার কিছুই নাই। ভগবান বাজীকরের যে গুলি খেলাবার জিনিষ মানুষের এই দেহ ঝুলিতে তিনি সেই গুলিকে আলগা ভাবে রাখিয়া দেন। খেলাইবার জিনিস কি জান? মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। যদি বল মন জিনিষটি কি! আমি বলি তুমি মনকে বায়ু বলিয়া ধর, তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাও, কিন্তু তুমি মন কিম্বা বায়ুকে দেখিতে পাও না। যে শক্তি দ্বারা তুমি মনের ক্রিয়া বুঝিতে পার, তাহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধিটিকে তুমি সৌগন্ধ বলিয়া ধরিবে। সেই বুদ্ধি মনের সহিত মিলিয়া কাজ করে ও মনকে বেষ্টন করিয়া থাকে। অহঙ্কারের কথা তুমি বেশ বুঝিতে

পারিতেছ। অহঙ্কার দুর্গন্ধ। বুদ্ধি বলিতে তুমি স্বরূপ নির্দ্ধারণের শক্তিকে বুঝিবে। তাহা সু ও কু দুই হইতে পারে। এই সকলের উপর এক পরমাদ্ভুত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অপরিবর্ত্তনীয়, পদার্থ আছে, তাহার নাম আত্মা। তুমি আত্মাকে আকাশের ন্যায় জানিবে। মন ও বুদ্ধি কলুষিত হইলে কালিমার ছবি আত্মার উপর প্রতিভাত হয়। আকাশের উপর মেঘমালা কি ধূলিজাল উত্থিত হইলে আকাশ অপরিচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে আকাশের স্বরূপত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না, মন ও বুদ্ধির অবিশুদ্ধতা হেতু আত্মা দূষিত আবরণ মধ্যে পতিত হন মাত্র। প্রায়শ্চিত্ত, হোম, যজ্ঞ, প্রাণায়াম, সংযম তপস্যা সাধনা প্রভৃতি দ্বারা আত্মার পবিত্রতা জন্মিলে দেহকে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা জন্মে। এমন কি মানব রক্তমাংসময় দেহকে একেবারে মৃত্তিকাসাৎ করিয়া কেবল মাত্র মনোময় দেহকে অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিত থাকিতে পারেন। তুমি বাল্মীকাদি ঋষিগণের তপস্যার বৃত্তান্ত শুনিয়াছ, কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট দেহে জীবনী শক্তি বর্ত্তমান থাকার ইতিহাস শুনিয়াছ। তুমি সে সকলকে উপাখ্যান মাত্র বিবেচনা করিও না। দেহ মন ও আত্মার আবাস গৃহ। বাসগৃহ ভগ্ন, দূষিত, বাসের অনুপযুক্ত হইলেও জীব সকল আপন আপন গৃহ ত্যাগ করিতে চাহে না। কর্ম্মের আবরণ সংযুক্ত আত্মার স্বভাবও সেইরূপ। কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও অস্থির উপর আত্মার আসক্তি থাকে। পতিত পাবনী জাহ্নবী আমাদের এ প্রদেশের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী বলিয়া মৃতদেহের সংস্কার

ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রায়ই তাঁহার তীরে ঘটিয়া উঠে না। ক্ষুদ্র নদী, তড়াগ বা পুষ্করিণীর তীরে মৃতদেহ দাহ করিবার সময় লোকে দেহ হইতে অস্থি খণ্ড লইয়া সুরতরঙ্গিণীতে নিক্ষেপ করিয়া আইসে। তুমি এ পদ্ধতি কি অনাবশ্যক ও অযুক্তিকর বিবেচনা কর? ধর্ম্মের কোন ক্রিয়াই অহেতু ও অযুক্তিকর নহে। দেহ পরিত্যাগ মাত্রেই দেহান্তর ঘটে না। প্রকৃতি প্রস্তুত হইবার সময় প্রায়ই দিয়া থাকেন। বৃক্ষ হইতে পক্ববীজ ভূমে পতিত হইবামাত্রেই তাহা হইতে অঙ্কুর জন্মে না। প্রকৃতি অনুকূল হইলে সময়ে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। দেহান্তে আত্মা কর্ম্মবন্ধনে সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান করেন। মৃত দেহের অস্থিখণ্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও তাহাতে আত্মার আসক্তি থাকে। দেহান্তে পুণ্য সলিলা গঙ্গাতে অস্থি মাত্র নিক্ষেপে আত্মার বিশুদ্ধতার ও সদ্‌গতির সম্ভাবনা থাকে।" ইহা কহিয়া সাধক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে বিশু কহিলেন, "ঠাকুর! দেহ মন, প্রাণ আত্মা, পুরুষ প্রকৃতি, ইন্দ্, তিস্, এ সকল আমি এখানে যত পণ্ডিত আসেন তাঁদের মুখে শুন্‌তে পাই, আপনার মুখে কখনও শুনি নাই, আপনি সর্ব্বদাই বলে থাকেন আমার মা কালীর চরণে দেহ, মন, বুদ্ধি, একেবারে দিতে পার্‌লে ক্রমে আপনিই আমিত্ব যায়, সব জ্ঞান এসে পড়ে, শাস্ত্র সকলের নানারকম কথা এক মা কালীর কথা বলে মনে হয়।" বিশুর কথা শুনিয়া সাধক কহিলেন, "বিশু। তুমি যদি দেহ, মন, প্রাণ, মা

কালীর চরণে দিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তোমার আর কোন চিন্তারই প্রয়োজন হয় না। দেহ কি? তুমি এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাই তোমাকে এত কথা বলিলাম। কালীনাম মহামন্ত্র যাঁর হৃদয়ে বিশ্ব বিমোহন শক্তিতে কূটস্থ হইয়া জাগরূক থাকে, দেহ, মন, প্রাণ, তাঁর দাস, মুক্তি তাঁর দাসী। ইহা কহিয়া সাধক হাতে তাল দিয়া গাহিলেন—

তুমি যে আমার নয়নের নয়ন মনেরি মন।
প্রাণেরি প্রাণ, এ দেহের দেহী,
জীবনের জীবন॥
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ, পরধাম প্রাপ্তি গতি
অগতির, কারণেরি কারণ।
কমলাকান্ত, কুলকান্ত,
প্রবল কৃতান্ত ভব তারণ॥

সঙ্গীত শেষে সাধক আবার কহিলেন, "বিশু! সর্ব্বাসক্তি শূন্য না হইলে একেবারে আত্ম বিস্মৃতি ও আত্ম সমর্পণ অতি বড় কঠিন ব্যাপার। তীব্র বৈরাগ্য ব্যতীত আমিত্ব ত্যাগ হয় না।" ইহা শুনিয়া বিশু কহিলেন "ঠাকুর। তীব্র বৈরাগ্য কিরূপ? বৈরাগ্য হইতে তাহার বিশেষত্ব কি?" সাধক কহিলেন, "বিশু! কোন ঘটনা বিশেষকে অবলম্বন করিয়া সংসারের মায়া মোহজালকে দুঃখে অবজ্ঞা পূর্ব্বক সংসার ত্যাগ

করাকে নিমিত্ত বৈরাগ্য কহে। সে বৈরাগ্যের তীব্রতা থাকে না। সে বৈরাগ্য অনেক স্থলে স্থায়ী হয়না, স্থায়ী হইলেও বহুকষ্টে কার্য্যকর হয়। নিমিত্ত বৈরাগ্য জন্ম জন্মান্তরে তীব্র বৈরাগ্য প্রসব করিয়া থাকে। কাহারও বার্দ্ধক্যে, কাহারও যৌবনে, কাহারও বা কৌমার্য্যে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। তাঁহারা তদবস্থায় সংসারকে অন্যভাবে দর্শন করিয়া সাযুজ্য লাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ান। যাঁহাদের কৌমার্য্যে বা যৌবনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তাঁহাদের জন্মান্তরের বিস্তর সাধনা। জন্মগ্রহণান্তর সামান্ত জ্ঞান সঞ্চার হইবামাত্র তাঁহাদের আত্মার বিমল দীপ্তিতে সংসারের মায়াজাল ও অন্ধকার শিথিল হইতে থাকে। জীবের রোগ, শোক, দুঃখ, হাহাকার, চিৎকারে তাঁহাদের অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইলে ধীরে ধীরে তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাগের ঘন ঘটার সঞ্চার হয়। সাধারণের চক্ষে প্রথমে তাহা অদৃশ্য থাকে। ক্রমে ঘনঘটা ঘনীভূত হইয়া প্রবল বেগ ধারণ করে। তাঁহারা ভার্য্যা, পুত্র, পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু, কাহারও পানে দৃষ্টিপাত না করিয়া ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। তখন তাঁহারা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পান, ইহা সংসার নহে সচ্চিদানন্দের প্রেম সাগর। রোগ শোকজনিত হাহাকার চিৎকার নহে, আনন্দ তরঙ্গমালা। সংসার ধ্বংসকারী অনন্ত কালের অসীম শক্তির প্রদর্শিনী ক্ষেত্র নহে, ইহা শাশ্বত চিরপূর্ণ পরম ব্রহ্মময় সুখ বারিধি। ইহা ঘোরতর মায়াজাল জড়িত অন্ধকারময় সংসার নহে, পূর্ণব্রহ্ম

শশধরের বিমল দীপ্তিতে আলোকিত, কি এক অপূর্ব্ব স্থান। তোমাকে কয়েকটী মহাপুরুষের তীব্র বৈরাগ্যের কথা বলিতেছি শোন—তুমি রাজপুত্র ভগবান বুদ্ধের সংসার ত্যাগ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছ? তিনি জীবের শোক দুঃখে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সাধ্বী প্রিয়তমা প্রেয়সী ও প্রাণসম পুত্রকে অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন পূর্ব্বক গভীর রাত্রে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন; তীব্র বৈরাগ্যের ভগবান বুদ্ধই স্বয়ং চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। গভীর চিন্তা ও কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবান বুদ্ধ অবধারণ করিয়াছিলেন অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, পরের উপকারই পুণ্য, পরের অপকারই পাপ। সৃষ্টি প্রকরণে তাঁহার মত সাংখ্যবাদীদিগের মতের অনুবর্ত্তী। তিনি জগতে অসংখ্য আত্মার অবস্থান ও প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় বিধির উপর বিশ্বাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই বিধির অনুযায়ী জীবন ধারণ করিতে পারিলে ও বিমল জ্ঞান দ্বারা সেই বিধির প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিতে পারিলে আত্মার নির্ব্বাণ লাভ হয়। সেই বিমল জ্ঞান লাভের প্রধান উপায় অহিংসা ও পরোপকার। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে বুদ্ধমতাবলম্বীরা উদাসীন। সাংখ্যবাদীরা ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধদিগের ন্যায় তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়ার বিরোধী নহেন। আমি আর এক মহাপুরুষের বৈরাগ্যের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। তাঁহার নাম ভগবান শঙ্কর স্বামী। তিনি ভগবানের অংশরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৌমার্য্যে

দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি মাতার একমাত্র পুত্র। বিদুষী জননী পুত্রের অমানুষিক শক্তি সন্দর্শনে তাঁহাকে পত্নী গ্রহণ করিয়া সংসার বন্ধনে জড়ীভূত হইতে অনুমতি করেন নাই। ষোড়শবর্ষ বয়সে তিনি বেদ বেদান্ত বিশারদ হইয়া বুদ্ধমতাবলম্বীদিগের সহিত ঘোরতর তর্ক যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন, একেশ্বর বাদ প্রতিপন্ন করিয়া বেদধর্ম্ম পুনর্জীবিত করেন। তুমি ভগবান শ্রীচৈতন্যের সংসার ত্যাগ বৃত্তান্ত বোধ হয় শ্রবণ করিয়াছ। তিনি জননী ও যুবতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন ও ভক্তি একমাত্র মুক্তির উপায়, এই উপদেশ প্রচার পূর্ব্বক হরিনাম রসে প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পঞ্চনদ তীরবর্ত্তী জন সমূহের ধর্ম্মপথ প্রবর্ত্তক মহাত্মা নানক অতি অল্প বয়সে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাত্মার পিতা গোধুম ধান্যাদির ব্যবসা করিতেন। একদা তিনি পিতার আদেশে কোন স্থানে গোধুম ওজনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ওজন সময়ে তিনি "একে রাম এক, দুয়ে রাম দুই, তিনে রাম তিন" এইরূপ বার দাঁড়ী পর্য্যন্ত ওজন করিলেন। তের দাঁড়ী ওজন সময়ে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি "তের রাম তের" না বলিয়া "মে তার 'রাম" এই কথা বলিয়া ওজন বাটখারা দূরে নিক্ষেপ করিয়া উন্মাদের ন্যায় তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করেন। তিনি জাতিভেদকে অনাদর পূর্ব্বক একেশ্বর বাদ শিক্ষা

দিয়াছিলেন। তুমি বোধ হয়, তীব্র বৈরাগ্য কাহাকে বলে এখন উত্তমরূপে বুঝিয়াছ।

ইহা শুনিয়া বিশু কহিলেন, "ঠাকুর! মহাত্মা নানকের বৈরাগ্যের ইতিহাস শুনে আমার মনের ভেতর কেমন একটা আনন্দ হচ্ছে। ভগবানের দয়া না হলে অকস্মাৎ এমন হবে কেন।" সাধক কহিলেন, "বিশু! আমি তোমাকে আরও দুই একটী মহাত্মার তীব্র বৈরাগ্যের ইতিহাস বলিতেছি শোন? তুমি তুলসীদাসের নাম শুনিয়াছ? তুলসীদাস একজন সাধক, ভক্ত ও কবি। হিন্দি ভাষায় লিখিত তাঁহার রামায়ণ অমৃতময়, ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। তাঁহার অকস্মাৎ তীব্র বৈরাগ্য উদয়ের বিষয়ে এক প্রবাদ আছে। কথিত আছে, তিনি যৌবন কালে অতিশয় স্ত্রৈণ ছিলেন। একদা তাঁহার পত্নী দোলায় চড়িয়া পিত্রালয় যাইতেছেন। তুলসীদাস দোলা ধরিয়া পত্নীর সহিত কথা কহিতে কহিতে দ্রুতপদে গমন করিতেছেন! দোলার প্রবেশ দ্বারে তাঁহার হস্তের ভার পড়াতে দোলা দুলিতেছে। যানবাহীরা তুলসীদাসকে কহিল, "মশায়! দোলায় হাত দেবেন না, দোলা ছেড়ে দিয়ে চলুন।" তাঁহার পত্নী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার লজ্জা হইতেছে না! তুমি কি নিমিত্ত আমার সঙ্গে আসিতেছ, যাও, ঘরে যাও।" তুলসীদাস লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন "আমি যাহার অদর্শন যন্ত্রণা অসহ্য বিবেচনা করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে যাহার অনুসরণ করিতেছি, কই সেত আমারে চাহে না, আমার সহিত বিদায় গ্রহণ কালে

কই তাহার অন্তরের ভাবান্তর ত কিছুই লক্ষিত হইল না। আমি কি মূর্খ! অনিত্য বস্তুর প্রেমাসক্ত হইয়া ক্ষিপ্ত কুক্কুর ও শৃগালের স্থায় ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছি, আমি অতঃপর নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করিব, যাঁহার হৃদয় প্রেম সাগর, যাঁহার সহিত মিলিত হইলে কখনও বিচ্ছেদ ঘটে না। আমি শুনিয়াছি, তিনি সর্ব্বত্র সকল হৃদয়ে অবস্থান করেন। আমার হৃদয়েও অবস্থান করেন, তাই তাঁহাকে আমার প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইতেছে। তিনি আমাকে ভালবাসেন নচেৎ তাঁহাকে আমার অকস্মাৎ এত ভাল বাসিবার বাসনা হইল কেন,? আমি আর ঘরে ফিরিয়া যাইব না, আমার সেই প্রেমের পুরুষ যথায় আছেন, তথায় যাইব। যদি তিনি হৃদয়ে থাকেন, নয়ন জলে তাঁহাকে অনিমিশ নয়নে দেখিব, একবারও নয়ন ছাড়া করিব না। স্বার্থভরা সংসারের সব জিনিস আমার মন প্রাণ হইতে চলিয়া যাক্। পত্নী, ভ্রাতা, ভগিনী, আমি কাহাকেও চাহি না। যাঁহার নিকট আমি বিমল ভালবাসা পাইব, আমি তাঁহার নিকট চলিলাম।" ইহা কহিয়া সাধক কবি গৃহ ত্যাগ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে পরম পুরুষের উদ্দেশে চলিতেছেন। তিনি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া পবিত্র বারাণসীধামে এক বিল্বমূলে আসন করিলেন। তাঁহার গৃহে শ্রীরাম সীতার মূর্ত্তি ছিল, তথায় সেই মূর্ত্তির নিত্য সেবা হইত। তিনি এক্ষণে সেই যুগল মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তাঁহাদের কৃপা কটাক্ষপাতের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি কাশীধামে প্রতিদিন কাশীশ্বর আশুতোষের

পূজা করিয়া শ্রীরাম সীতার অর্চনা পূর্ব্বক তাঁহাদের ধ্যানে বিভোর হইতেন। একদা গভীর রাত্রে তিনি ধ্যানে মগ্ন আছেন এমন সময়ে দৈববাণী হইল, "তুলসী! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হইবে, বর প্রার্থনা কর।" কবিবর কহিলেন, "আপনি কে ? দয়া করিয়া আমাকে দর্শন দিলে আমি কৃতার্থ হই" অদৃশ্য দেবতা কহিলেন, "আমি কাশীধাম রক্ষক ভৈরব।" তুলসী দাস কহিলেন, ! আমার আকাঙ্খা অতি উচ্চ। আমি ত্রিভুবন পালক নব দূর্ব্বাদল শ্যাম রাম সীতার সাক্ষাৎ লাভ প্রার্থনা করি। ভৈরব কহিলেন, "তুলসী! তুমি উদার হৃদয়, ভক্তিমান ও প্রেমিক ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিবার শক্তি তোমার জন্মিয়াছে। তোমার আশা নিতান্ত উচ্চ হইলেও আকাশ কুসুম নহে। তুমি যেরূপে শ্রেয়োলাভ করিবে তাহা আমি কহিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। সম্প্রতি কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণার মন্দিরে মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণ পাঠ হইতেছে। তথায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সকলের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এক প্রান্তে আসন করিয়া উপবিষ্ট থাকেন। তিনি রামায়ণ পাঠান্তে সকলের শেষে অবনত বদনে বহির্গত হয়েন। তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। তিনিই তোমার শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া দিবেন।" ইহা কহিয়া ভৈরব অন্তর্হিত হইলেন। রজনী প্রভাত হইল। তুলসীদাস ধ্যান, পূজা ও উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। দিবসপতি অস্তমিত হইবামাত্র

বিশ্বেশ্বরের বন্দনাদি সমাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে জগত জননী অন্নপূর্ণার বাটীতে আগমন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে পাঠক ও শ্রোতাদিগের আগমন দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পাঠক ও শ্রোতাদিগের অগ্রে আগমন করিয়া দেবীর বামভাগে আসন স্থাপন পূর্ব্বক দেবীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া উপবেশন করিলেন। তুলসীদাস তাঁহাকে ভৈরব নির্দিষ্ট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন, পুনঃ পুনঃ দেবীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সীতাপতিকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। রাম চরিত শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি গভীর হইলেও তিনি ব্রাহ্মণের প্রতি প্রীতি নয়নে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রামায়ণ পাঠ শেষ হইল। সকলে আপন আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস ব্যাকুলিত হৃদয়ে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সকলে অন্নপূর্ণার বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণ কাশীশ্বরীকে প্রণাম পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বাটী হইতে বহির্গমন করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস তাঁহার কৃপাদৃষ্টির লালসায় ও তাঁহাকে প্রাণের যাতনা নিবেদন করিবার ইচ্ছায় কখন তাঁহার পশ্চাৎ কখনও বা পার্শ্বদেশ অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তুলসীদাস দেখিলেন অগ্রে এক নব দূর্ব্বাদল শ্যাম ধনুর্ব্বাণধারী পরম মনোহর পুরুষ, তাঁহার পশ্চাৎ ভুবন মোহিনী এক রমণী, তদনু

বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, দেবতুল্য এক যুবা পুরুষ অবনত বদনে গজগমনে চলিতেছেন, তাহাদের পশ্চাৎ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ধনুর্ব্বাণধারী পুরুষ ও তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী রমণীকে দর্শন করিয়া তুলসীদাসের তাঁহার হৃদয়স্থিত উপাস্য দেবতা রামসীতার ভাব মনে হইল। কিন্তু তিনি সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুসরণ ও তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনা নিবেদনের ব্যাকুলতা হেতু সেই মানস মোহন পুরুষসিংহ কি ভুবন মোহিনী বরাঙ্গনার প্রতি অধিকক্ষণ দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহারা সকলে অন্নপূর্ণার বাটী অতিক্রম করিলেন। সেই পুরুষদ্বয় ও রমণী একপথ দিয়া এবং অন্যপথ দিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী তুলসীদাসের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কয়েক পদ মাত্র গমন করিয়া সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তুলসীদাসকে কহিলেন, "তুলসী ! তুমি ভুবনেশ্বর কাশীনাথের রামরূপ দর্শন করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলে। তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রামরূপে তোমায় দর্শন দিয়াছেন। ওই যে ধনুর্ব্বাণধারী পুরুষকে দর্শন করিলে তিনিই ত্রিভুবন পালক, গোলকপতি রামচন্দ্র, তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী রমণী আমাদের জননী সীতা, তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পুরুষ রামানুজ লক্ষ্মণ।" ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তুলসীদাসের হৃদয়ের ব্যাকুলতা অতি গভীর হইয়া উঠিল। তিনি চিত্রার্পিতের, ন্যায় ব্রাহ্মণের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিরল ধারায় নয়নবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিস্ময়ভাব, ভক্তি, আত্মগ্লানি তাঁহার

হৃদয়কে এত বিচলিত করিয়া তুলিল যে তিনি ব্রাহ্মণের নিকট সজ্ঞানে তাঁহাদের পুনর্দর্শন প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "ভাই তুলসী! সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন জন্মান্তরের বহু সাধনার ফল। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি রাম চরিত বর্ণনা কর। তোমার হৃদয়ে ভরা প্রেম রসায়নে সিক্ত হইলে তোমার বাক্য অমৃতময় হইবে। পণ্ডিত, মূর্খ সকলেরই তোমার বাক্য হৃদয়গ্রাহী হইবে। তুমি রামায়ণ রচনা ও সাধনায় প্রবৃত্ত হও, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। তুমি পরিণামে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া প্রভু দর্শন লাভ করিতে পারিবে।" তুলসীদাস কহিলেন, "আপনি কে? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি রাম দাস হনুমান।" ইহা কহিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ তথায় অন্তর্হিত হইলেন। তুলসীদাস আকুল হৃদয়ে তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক হনুমান নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। দেহকে উপেক্ষা করিয়া কঠোর তপস্যা পূর্ব্বক অন্তিমে পরমাগতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রামায়ণ ভক্তিরস পূর্ণ আতুর সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তনা শীতলবারি, প্রেমিকের নিকট প্রেমের উৎস, সাধারণ গৃহীর নিকট মহামন্ত্র বেদবাক্য।

ইহা কহিয়া সাধক কহিলেন আমি আর এক মহাত্মার যৌবনে সংসার ত্যাগ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। তিনি রাজসিংহাসন তুচ্ছ করিয়া মৃগচর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বুবর্ণনির্ম্মিত পানপাত্রের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা নির্ম্মিত পানপাত্রে

তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তুমি ভক্তিরস পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতময়ী কথা শুনিয়াছ। যে মহাত্মার কথা বলিতেছি, তিনিই ভাগবতের টীকাকার। তাঁহার ব্যাখ্যা ব্যতীত ভাগবতের প্রকৃত অর্থ অবধারণে কেহই সমর্থ ছিলেন না। তাঁহার নাম শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী। প্রবাদ আছে, শ্রীধর স্বামীর পিতা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন পরম ধার্ম্মিক মদ্র দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর গর্ভবতী হইবার সময় অতীত হইলে তিনি পত্নীর সহিত পবিত্র কাশীধাম বাসের অভিপ্রায় করেন। তদনুসারে তিনি তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া সুদূর কাশীধাম যাত্রা করেন। দাক্ষিণাত্য হইতে নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া কাশীধামে আগমন সময়ে তাঁহার পত্নীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া উপাস্য দেবতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "কৃপাময়! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহার পত্নীর গর্ভ ক্রমে পূর্ণ কলেবর ধারণ করিতে লাগিল। সাধ্বী রমণী গমনে অশক্তা হইলেও আহ্লাদের সহিত পতির অনুগমন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এক বিস্তীর্ণ অরণ্য পার হইতেছেন এমন সময় তাঁহার পত্নীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তিনি পত্নীর সহিত এক বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার পত্নী এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। ব্রাহ্মণ বহুযত্নে তাহার চৈতন্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া বুঝিলেন তাহার পত্নী জীবিতা নাই। তিনি সেই ভীষণ সময়ে সত্ত্বগুণ প্রভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক

পত্নীর পার্শ্ব স্থিত জীবিত সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কিরূপে তাহার জীবন রক্ষা হইবে চিন্তা করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন গাছের ডাল হইতে একটী টিকটিকির ডিম পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহা হইতে বাচ্ছা বাহির হইল। তিনি বাচ্ছাটীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার ও তাহার সদ্য প্রসূত সন্তানের অবস্থা একরূপ ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তিনি দেখিলেন, গাছের ডাল হইতে একখণ্ড উইমেকা পড়িয়া তাহা হইতে কয়েকটা উই বাহির হইয়া বাচ্ছাটীর মুখের নিকট উপস্থিত হইল। বাচ্ছাটী সেইগুলি ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিল। শ্রীধর স্বামীর পিতার তদ্দর্শনে নয়নে প্রেমের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা সমুদয় জীবের রক্ষাকর্ত্তা। তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। যিনি এই বালকের জীবন দান করিয়াছেন তিনিই ইহার জীবন রক্ষার উপায় করিবেন। ইহা ভাবিয়া তিনি একটী ভূর্জ্জপত্র লইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিলেন—

যেন শুক্লা কৃতা হংসী শুকাশ্চ হরিতা কৃতা।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন তেন রক্ষাং বিধাস্যতি॥

তদনন্তর তিনি ভূর্জ্জপত্রটীর উপর বালকের মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক মৃতা স্ত্রী ও জীবিত বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ইত্যবসরে সেই দেশের অধিপতি মৃগয়া উদ্দেশে বনমধ্যে আসিয়া সদ্য প্রসূত বালকের ক্রন্দন শব্দ শ্রবণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ণ শশধর সম বালককে ভূমে

পণ্ডিত ও প্রশ্বৃতিকে গতায়ু দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। অনুগামীদিগকে রমণীর মৃতদেহ সংকারের অনুমতি দিয়া বালককে গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুতপদে স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি যেরূপে সেই পুত্ররত্নকে বনমধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা মহিষীর নিকট বর্ণন করিলেন, পুত্ররূপে পালন করিবার জন্য পুত্রটীকে ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। রাজা ভূর্জ্জপত্র লিখিত সেই শ্লোকটী তাম্র ফলকে লিখিয়া নিজ প্রাসাদ উপরে লম্বিত রাখিলেন। বালক রাজভোগে লালিত পালিত হইয়া ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, রাজার পরলোক গমনের পর রাজা হইয়া সর্ব্বজন প্রিয় হইয়া উঠিলেন। একদা তাঁহার জন্মদাতা ঘটনা ক্রমে তাঁহার নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্বলিখিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী প্রাসাদ উপরে খোদিত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তথ্য জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নির্জ্জন কাননে পরিত্যক্ত বালকের মুখ প্রতিমা মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইত। এখন যৌবনে পূর্ণ বিকসিত মুখপদ্ম তাঁহাকে অতিবড় বিচলিত করিয়া তুলিল। পুরাতন কবিগণ আত্মাকে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পতি পুত্র রূপে পত্নীতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া পত্নীর নাম জায়া। এক্ষণে নিজ আত্মার রূপান্তর মাত্র রাজসিংহাসনে দেখিয়া, এবং সেই পুত্রকে যে অবস্থায় অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া তাহার মনে হর্ষ, বিষাদের আবির্ভাব হইল। রাজারও হৃদয় আগন্তুকের প্রতি

নিতান্ত আকৃষ্ট হইল। নরপতি তাঁহাকে যথাযোগ্য আসন প্রদান পূর্ব্বক নাম ও তাঁহার নিকট আগমনের কারণ অতি বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ স্নেহাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার নিকট একটী প্রার্থনা আছে, প্রার্থনা অতি সামান্য, তাহা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে। রাজা কহিলেন, আপনার দর্শন মাত্রেই আমার আত্মা প্রফুল্ল হইয়াছে। নিশ্চয়, আপনি আমার হিতার্থে আগমন করিয়াছেন। আপনার প্রার্থনা আপাততঃ যতই অপ্রীতিকর হউক তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।" শ্রীধর স্বামীর পিতা কহিলেন, "আমি আপনার মাতার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি। তাঁহাকে কোন বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিব।" রাজা তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ মাতার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "মা! জনৈক প্রিয়দর্শন পরিব্রাজক আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন।" জননী ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলে শ্রীধর স্বামীর পিতা বৃদ্ধারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "মা! বর্ত্তমান নৃপতি কি আপনার গর্ভজাত সন্তান? আপনি আমার কথার প্রকৃত উত্তর দিবেন, আপনার পুত্রের শ্রেয়োলাভ "হইবে।" রাণী তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ রাজা যেরূপে বর্ত্তমান নৃপতিকে বনমধ্যে পাইয়াছিলেন তাহা যথাবৎ কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ রাজার নিকট আসিয়া গদ গদ কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার ঔরসজাত সন্তান। আমি তোমাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ

করিয়া তোমার প্রতিপালনের ভার বিধাতার উপর দিয়া পলায়ন করিয়াছিলাম।" রাজা জন্মদাতার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থান পূর্ব্বক পুত্র কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। শ্রীধর স্বামীর আত্ম বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর কি এক মনে বিকার উপস্থিত হইল। তিনি রাজভোগ ও রাজ সিংহাসনকে অতি তুচ্ছ বোধ করিতে লাগিলেন। একদা গভীর রাত্রে তিনি রাজ ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী বেশে নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন পণ করিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন। মর্ত্ত্যলোকে ভাগবতের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিবার শ্রীধর উপযুক্ত পাত্র এই বিবেচনা করিয়া ভগবান ব্যাসদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "আমি ব্যাস, আমি তোমার কুলদেবতা শ্রীনৃসিংহদেবের ইচ্ছায় তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তুমি ভাগবতের প্রকৃত অর্থ প্রচার কর, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। তুমি দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে। শ্রীধর স্বামী ভগবান ব্যাসদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবকে হৃদয়ে ধ্যান পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা রচনা ও সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবাদ আছে তৎকৃত টীকা সমাপ্ত হইলে কাশীধামস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট তাহা পঠিত হয়। তাঁহারা তাহা অপদার্থ বলিয়া অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু ব্যাখ্যা পুস্তকখানি অগ্নিমধ্যে পতিত হইলেও দগ্ধ হইল না দেখিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী তাহা সারগর্ভ বলিয়া

গ্রহণ করেন। শ্রীধর স্বামী অক্ষয় কীর্ত্তি ও পরমাগতি লাভ করিয়াছিলেন।

ইহা কহিয়া সাধক পুনশ্চ কহিলেন, "বিশু! প্রৌঢ়ে অকস্মাৎ তীব্র বৈরাগ্য উদয়ের তুমিই এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। আমার সুমধুর সঙ্গীত প্রভাবে তোমার চিত্ত বিকার উপস্থিত হয় নাই, একথা নিশ্চয় জানিবে। ইহা তোমার জন্মান্তরের সুকৃতির ফল। বরিষার কালে যেমন মেঘমালা যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হয়, সুকৃতিই তেমনি সময়ে আসিয়া ফলবতী হয়। আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ, তোমার বৈরাগ্যের নিমিত্ত মাত্র। সেই ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় তোমার পূর্ব্ব অনুচরগণ সকলেই আমার সঙ্গীত শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের তাদৃশ বিকার উপস্থিত হয় নাই, কেবল মাত্র তুমিই জন্মান্তরের সুকৃতি বলে মুগ্ধ হইয়াছিলে, আমাতে তোমার মা কালীর আবির্ভাব দৃষ্টি করিয়াছিলে। দেখ বিশু! একই কথা এক সময়ে অনেকের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে, কিন্তু হৃদয়ের গভীরতা ও অধিকারিত্ব অনুসারে সেই বাক্য বিবিধ ব্যক্তি দ্বারা বিবিধ রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। আমার মুখের কালী নাম তুমি অধিকারী হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলে। সেই কালীনাম তোমার অন্তরে ফলবান হইয়াছে। এখন তুমি সাধনার অধিকারী হইয়াছ, সাধনার পথে অগ্রসর হও। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সাধনার ফলে তোমার মোক্ষলাভ হইবে। ইহা শুনিয়া বিশু কহিলেন, "ঠাকুর! আমিত আমার সুকৃতি দেখ্‌তে পাই না। আপনার

বাক্য বেদ বাক্য, সুকৃতি আছে, কর্ম্ম আছে, কর্ম্ম ফল আছে, কিন্তু আমি দেখ্‌ছি আমার বিধাতা আপনি। এমন সাক্ষাৎ আনন্দদাতাকে ছেড়ে আমার সুকৃতি বলে আমি আনন্দ পথের পথিক হয়েছি, এ বিশ্বাস কর্ত্তে আমার প্রবৃত্তি হয় না, সে বিশ্বাসে অহঙ্কার আছে, পাপ আছে। মা বাপ ছেলেকে লালন পালন করেন, লেখাপড়া শেখান, জ্ঞান দেন, ছেলে যদি বড় হয়ে বলে আমার সুকৃতি বলে আমি মানুষ হয়েছি, সে ছেলে কত বড় দুর্জ্জন! ঠাকুর! তুমি যে আমার সুমতি, সুকৃতি, দাতা। আমি আপনার পায়ে ধরে পড়েছি, যেখানে যান পারে করে নিয়ে যেতে হবে।" সাধক কহিলেন, "না হে বিশু! সুকৃতি মানিতে হয়, তবে সুকৃতির ভরসা করিতে নাই, কারণ তাহা অদৃষ্ট। তুমি আপনার বিবেক বুদ্ধিকে বিমলা আনন্দময়ীতে সমর্পণ করিয়া বিবেক বুদ্ধির নিয়োগ মত কার্য্য করিবে তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। বিশু কহিলেন, "ঠাকুর! আপনিই আমার বিবেক বুদ্ধি। আপনার সংসর্গে আমার নিতান্ত কলুষিত আত্মার ভাবান্তর ঘটেছে। আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি, আমার যা কিছু আছে, সব আপনি। সংসার সাগর উদ্ধারের কর্ত্তা আপনাকে ধরে দাঁড়িয়েছি আমি আপনাকে ছাড়বোনা। আমার উদ্ধারের উপায় আপনাকে কর্ত্তেই হবে।" বিশুর কথা শুনিয়া সাধক কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক জগদম্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "শোন বিশু!

যদি ভরসা করিতে হয় তাহা হইলে নিত্যবস্তুর ভরসা করিবে। মানুষ মূর্খতা বশতঃ মানুষের ভরসা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, অসীম শক্তির শরণাপন্ন হও, সাধনা কর, নিশ্চয় ফল লাভ করিবে। আমি নিত্য নয়, আমি দেখিতেছি আমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে। আমি শীঘ্র ইহধাম পরিত্যাগ করিব। সাধকের কথা শুনিবামাত্র বিশু ভীত নয়নে তাঁহার মুখপানে নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহার মাথায় যেন শত বজ্রাঘাত পতিত হইল। বিশু জানিতেন ঠাকুরের মুখ হইতে কখনও মিথ্যা বাক্য বাহির হয় না, তিনি নিশ্চয় শীঘ্র তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। বিশু সজল নয়নে কহিলেন, ঠাকুর! সেকি! আপনি আমাদিগকে ছেড়ে যাবেন! আমরা কার মুখ চেয়ে বেঁচে থাক্‌বো। সুখে, দুঃখে, সব সময়ে কার মুখ চেয়ে প্রাণ জুড়াবো।" ঠাকুর কহিলেন, বিশু! যাঁহার মুখ চাহিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবে সেই অমূল্য রত্ন তোমার মা কালী, তুমি সর্ব্বদা যাঁহার চিন্তা করিয়া থাক। তুমি আমাকে তোমার মা কালীতে লীন দেখিবে, তাহা হইলেই তোমাকে আমার বিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। যদি তোমার মনের বাসনা জানাইতে ইচ্ছা হয় তুমি অন্তর্যামিনী চৈতন্যরূপিণীকে জানাইবে। যদি তোমার সুখালাপের প্রয়োজন হয়, তুমি হৃদয়বাসিনী সস্মিত বদনার সহিত সুখালাপ করিবে। যদি তোমার সখার অভাব হয় তোমার হৃদয় ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যিনি

তোমার সর্ব্বদা হৃদয়ে আছেন তিনিই তোমার একমাত্র প্রিয়বন্ধু বলিয়া জানিবে। ছি ছি বিশু! তুমি জগদম্বার দাস, মানুষের বিয়োগ যন্ত্রণায় তোমার হৃদয় ব্যথিত হইবে।” সাধক পুনশ্চ কহিলেন, “শোন বিশু! তোমাকে আর এক কথা বলিয়া রাখি, তুমি আমার অবর্ত্তমানে এ আশ্রম ত্যাগ করিও না। তুমি কোটালহাটে অবস্থান করিয়া জগদম্বার সাধনা করিবে। তীর্থ পর্য্যটনে সরিৎ-সমুদ্র-শৈল-সম্ভবা বসুন্ধরার সন্দর্শনে বিশ্ব জননীর অপূর্ব্ব ভাবের প্রকাশ দেখিয়া শরীর ও মন প্রফুল্ল হয় সত্য, কিন্তু তুমি আমার দুঃখে ব্যথিত হইয়া আশ্রম ত্যাগ করিলে সুখে বঞ্চিত হইবে।” ইহা কহিয়া সাধক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। বিশুর শোকাবেগ গুরুতর হইয়াছিল। তিনি গদ্ গদ্ কণ্ঠে কালী কালী বলিয়া জগদম্বার পাদপদ্মের দিকে দৃষ্টি করিয়া নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

একমাত্র কালই অনাদি অনন্ত। অনন্ত আকাশের ন্যায় নিশ্চল, শবরূপ মহাকালের (পুরুষের) উপর ত্রিভুবন প্রসবিনী মহাশক্তি (প্রকৃতি) কালী নামে অভিহিতা। কোটী কোটী নশ্বর লোক সাগর-লহরীর ন্যায় তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত ও তাহাতে লীন হইতেছে। মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, ভূধর, বারিধি পর্য্যন্ত প্রকৃতির সেই অনিবার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী। মনীষী মানবই কেবল প্রজ্ঞাবলে স্বকীয় পরিবর্ত্তনের সময় অবধারণ করিতে পারেন। কেহ যোগবলে কেহ বা ব্যাধির বশীভূত হইয়া

দেহ ত্যাগ করেন। মহাত্মা কমলাকান্ত বুঝিয়া ছিলেন তাঁহার দেহ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

কলেবর পরিত্যাগের সময় অবধারণে সক্ষম হইবার জন্য, মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করিয়া হাস্য মুখে সচ্চিদানন্দধামে গমন করিবার জন্য, মহাত্মাগণ আজন্মই প্রস্তুত হইতে থাকেন। প্রথমতঃ প্রবৃত্তি সকলের নিবৃত্তির অভ্যাসের প্রয়োজন। ভোগ লালসা থাকিলে লালসার নিবৃত্তির জন্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক প্রকার ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, নানা প্রকার জনশ্রুতিও বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে রাম রসায়ন প্রণেতা মহাত্মা রঘুনন্দন গোস্বামী যৌবন কাল হইতে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সংযম, সাধনা, প্রভৃতি দ্বারা সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস মাড়োগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলায় মানকরের নিকটবর্ত্তী। তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি শশীশেখরের বংশধর। তিনি সান্নিপাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলে বৈদ্যগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ আহার দিবার অনুমতি দিলেন। তদনুসারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন দ্রব্যে তাঁহার অভিরুচি হয়। তিনি মাগুর মৎস্যের ঝোল খাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "যথাসাধ্য প্রচুর পরিমাণে মাগুর মৎস্য সংগ্রহ করিয়া শতাধিক ব্রাহ্মণ ও গ্রামস্থ অন্যান্য লোক সমূহের নিমন্ত্রণ দ্বারা তাহাদিগের তৃপ্তি সাধন করা

হউক, তাহার পর আমি মাগুর মৎস্যের ঝোল গ্রহণ করিব। আযৌবন হবিষ্যাশী, শুদ্ধাচারী পুরুষের অন্তিম সময়ে আমিষ ভক্ষণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই বিস্মিত হইলেন। যাহা হউক প্রচুর পরিমাণে মাগুর মৎস্য সংগ্রহ করিয়া শতাধিক ব্রাহ্মণ ও গ্রামস্থ অন্যান্য লোককে মধ্যাহ্নে ভোজন করাইয়া কিঞ্চিৎ মাগুর মৎস্যের ঝোল তাঁহার নিকট আনীত হইল। তিনি শয্যা হইতে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই বুঝিলেন, তাঁহার মাগুর মৎস্যের ঝোল খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি এক্ষণে সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিলেন! মানব নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিলে সংসারের আসক্তি তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে। আসক্তি অনুচর মায়ামোহ, সুতরাং মায়ামোহ সেই ত্যাগী পুরুষকে বিপথগামী করিতে পারে না। তিনি সংসারে থাকিয়া সচ্ছন্দে মনের আনন্দে সচ্চিদানন্দের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হন। মৃত্যুকালে তাঁহার চির প্রসন্ন বদনের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। রোগাদির বিভীষিকা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। মানব যেমন ক্রীড়া কৌতুক স্থানে আহ্লাদের সহিত গমন করে তেমনি তিনি ও হাসিতে হাসিতে স্বর্গারোহণ করেন। মহাত্মা কমলাকান্ত শেষ সময়ের জন্য আজীবন প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, ব্যাধির যন্ত্রণা তাহাকে বিষণ্ণ করিতে পারে নাই। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভক্তবৃন্দকে প্রসন্ন বদনে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শয্যাগত

হইয়াও দর্শনার্থীদিগের সহিত সস্মিত বদনে সুখালাপ করিতেন ; আবার চাদরে মুখ ঢাকিয়া অনেককেই ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু সাধক কমলাকান্ত আপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি মাতৃভাবের উপাসনার স্রোত অপ্রতিহত রাখিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অমৃতময়ী পদাবলী উপাসনার অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে।

কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের সাধকের নিকট বিদায় গ্রহণের কিছুদিন পরে সাধক পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ দূরস্থ ও নিকটস্থ ভক্তমণ্ডলীর নিকট প্রচারিত হইল। অনেকেই কোটালহাটে সাধকের শুশ্রূষার নিমিত্ত আগমন করিলেন। কেণারাম পুনর্ব্বার কোটালহাটে আসিয়া সাধকের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ও যুবরাজ প্রতাপচাঁদ দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকটে অবস্থান পূর্ব্বক বিশিষ্ট বৈদ্যগণ দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইতে লাগিলেন। সাধকের পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে বৈদ্যগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজা বাহাদুর সাধককে গঙ্গাতীরস্থ করিবার অভিপ্রায়ে বিনীত ভাবে কহিলেন, "গুরুদেব! অম্বিকা কাল্না আপনার জন্মস্থান। সর্ব্বসন্তাপহারিণী সুরতরঙ্গিণীর তীরে জননীর প্রিয় সন্তানের ন্যায় আপনি অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস আপনি কাল্নায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ

হইতে পারিবেন। আমাদের সকলের ইচ্ছা আমরা আপনাকে কালনায় স্থানান্তরিত করি।" সাধক মহারাজা বাহাদুরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, "এই স্থানই আমার গয়া, গঙ্গা, বারাণসী। সম্মুখবর্ত্তিনী অভয়া বরদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, যেখানে সদানন্দময়ীর আবির্ভাব, গঙ্গাধর যাঁহার চরণে পতিত, সেখানে পতিত পাবনীর অভাব কি? ইহা কহিয়া সাধক হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ নেব।

অতি ক্ষীণ স্বরে এই গান করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত দুই চরণ মাত্র উচ্চারণ করিয়া প্রেম ও আহ্লাদে সাধকের কণ্ঠরোধ হইল, তিনি আর বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে সাধকের পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ করিয়া জনৈক ভক্ত কহিলেন, "সাধক শিরোমণি রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছেন—

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাহিব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণ তলে কত শত গয়া গঙ্গা দেখ্‌তে পাব॥
শ্রীরাম প্রসাদ বলে কালীর পদে শরণ নেব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে বিমাতাকে মা বলিব॥

পদটী শ্রবণ করিতে করিতে সাধকের দুইগণ্ড বাহিয়া প্রেমবারি বিগলিত হইতে লাগিল। ভক্ত পুনশ্চ কহিলেন, "মহাত্মাদিগের

হৃদয়েই সব আছে। তাঁহারা হৃদয় ছাড়িয়া কুত্রাপি যান না।” অপর একজন ভক্ত কহিলেন, “মন চাঙ্গা তো শিয়রে গঙ্গা।” সাধক মহারাজা বাহাদুরকে কহিলেন, “মহারাজ! আমাকে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন নাই। আমার কলেবরকে এই স্থানে জগদম্বার সম্মুখে সমাধিস্থ করিবেন।”

সাধকের পবিত্র আত্মা আজ পূর্ণানন্দ ধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত। তাঁহার কলেবর ক্ষীণ, হস্তপদাদি অবশ, উজ্জ্বল নয়ন ক্ষীণপ্রভ। বিশু সাধকের পদতলে বসিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন। গিরিগাত্র নিঃসৃত নির্ঝরিণীর ন্যায় শোকবারি তাঁহার নয়ন হইতে বিগলিত হইতেছে। সাধক তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ অতি গুরুতর জানিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, “অনিত্য বস্তুর আসক্তি ত্যাগ কর।’ মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর, যুবরাজ প্রতাপচাঁদ ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী কেহ নত বদনে, কেহ বা সাধকের মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। কালীবাড়ীর উদ্যানস্থিত বিটপী শাখায় বিহঙ্গমকুল পূর্ব্বের ন্যায় কলধ্বনিতে সমুদয় আশ্রম মুখরিত করিতেছে না, শাখা হইতে শাখান্তরে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে না, গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া ঊর্দ্ধে ও অধোদৃষ্টিতে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছে না,. বোধ হইতেছে যেন কি এক অপূর্ব্ব দুঃখে আকৃষ্ট হইয়া নয়ন নিম্নদিকে নিক্ষেপ করিয়া স্থির ভাবে উপবিষ্ট আছে, আশ্রম মধুকরনিকরের কুসুমদলে উপবেশন নাই। তাহারাও সাধকের বিয়োগ যন্ত্রণায় জড়ীভূত ও নিশ্চল।

আশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী পথগামী অশ্বাদি চতুষ্পদগণ আশ্রমের নিকট আসিয়া ধীরভাব ধারণ করিতেছে, শোকসূচক শব্দে অন্তরের দুঃখ জানাইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্যদেব প্রসন্ন, সমুদয় দ্যুলোক সাধকের পবিত্র আত্মার স্বর্গারোহণের জন্য আহ্বান করিতেছেন। বর্দ্ধমানের প্রত্যেক স্থানে সাধকের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার উল্লেখ ও দুঃখস্রোত বহিতেছে। সাধকের হস্ত হৃদয়ে স্থাপিত, তিনি করাল বদনা মূর্ত্তির সম্মুখে শায়িত। সাধক অতি ক্ষীণস্বরে সলিল পানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কমণ্ডলু হইতে বারি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সলিল পান করাইবার পূর্ব্বেই পতিত পাবনী ভোগবতী মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে সুন্দর ধারায় সাধকের মুখ মধ্যে পতিত হইল। তদ্দর্শনে মহারাজা প্রভৃতি ভক্তমণ্ডলী নিতান্ত বিস্মায়িত হইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের সকলের নয়নে প্রেমবারি। সলিল পান করিয়া সাধক উর্দ্ধদিকে নয়ন নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিস্পন্দ হইলেন। সকলে দেখিলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। বিশু ও অন্যান্য ভক্ত মণ্ডলীর হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর, যুবরাজ প্রতাপচাঁদ প্রভৃতি সকলেই অবনত বদনে নয়ন বারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাধকের কলেবর গেরুয়া বসনে আবৃত হইল। দেবীর সম্মুখে তাঁহার দেহকে সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

সামধকের মৃত্যু সংবাদ দুঃখস্রোতে সমুদয় বর্দ্ধমান সহর

প্লাবিত হইয়া গেল। সকলেই দুঃখিত। চিরকালের জন্য সাধকের দর্শন লালসায় কোটালহাটে বহু লোকের সমাগম হইল। মহারাজা বাহাদুর, যুবরাজ প্রতাপচাঁদ ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী নয়ন জলে সাধকের কলেবরকে সমাধিস্থ করিলেন। কথিত আছে, সাধকের সমাধি সময়ে কালী কীর্ত্তন কি হরিনাম সংকীর্ত্তনাদি হয় নাই। কারণ তিনি প্রাপ্ত বয়সে দেহত্যাগ করেন নাই। প্রায় ৫২।৫৩ বৎসর বয়সে তিনি বঙ্গভূমির অঙ্ক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালা ১১৭০ সালে সাধকের জন্ম হয়, প্রায় সন ১২২৩ সালে সাধক কলেবর ত্যাগ করেন। তাঁহার তিরোভাবের সময় নির্ণয় করা তত কষ্টসাধ্য নহে। কথিত আছে, সাধকের মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পরে যুবরাজ প্রতাপচাঁদের কঠিন পীড়া হয় ও তাঁহাকে কাল্‌নায় অন্তর্জ্জলী করা হয়। সন ১২২৫ সালে যুবরাজকে কাল্‌নায় অন্তর্জ্জলী করা হইয়াছিল। যে ব্যাধিতে সাধকের দেহ ত্যাগ ঘটে, তদ্বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, গ্রহণী রোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কেহ কেহ বলেন উরু দেশে দুষ্ট ব্রণ হইয়াছিল।

মহাত্মা কমলাকান্ত কলেবর ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আত্মার পবিত্র জ্যোতিঃ চিরকালই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল রাখিবে। যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে, যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, যতদিন গুণগ্রাহী লোক থাকিবে, যতদিন আর্য্য ঋষি প্রণীত ধর্ম্মের প্রাধান্য থাকিবে, যতদিন ধার্ম্মিক লোক থাকিবে, যতদিন ভক্তি ও প্রেমে

মানুষের হৃদয় দ্রবীভূত হইবে, ততদিন তিনি জীবিত থাকিবেন। তাঁহার রচিত গীতাবলী-সরোবর হইতে ভক্তি ও প্রেমবারি অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া প্রেম পিপাসু মানব তৃপ্তিলাভ করিবেন। তাঁহার রচিত পদাবলী আতুর হৃদয়ের শান্তনা বারি, দরিদ্রের ধন, সাধুজনের সঙ্গী, সংসারীর সাংসার জ্বালা নিবারণের একমাত্র উপায়।

সাধকের পিপাসা শান্তি হেতু কোটালহাটের কালী বাড়ীতে দ্রবময়ী গঙ্গার আবির্ভাব সন্দর্শন করিয়া যুবরাজ প্রতাপচাঁদের নিতান্ত ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যোগবলকে পার্থিব সমুদয় পদার্থ হইতে বলবান বিবেচনা করিয়া স্বীয় রাজ্যাস্পদকে নিতান্ত তুচ্ছ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে নিজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে বর্দ্ধমানে আনিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদনের জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মানসিক উদ্বেগের শান্তি করিতে পারিলেন না। তাঁহার কঠিন পীড়া হইল, জীবন সংশয় জানিয়া তাঁহাকে কালনায় অন্তর্জলী করা হইল। কেহ কেহ বলেন, যুবরাজের পীড়া সাঙ্ঘাতিক হয় নাই। তিনি হঠযোগ বলে মৃতকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ সৈকত শয্যায় শায়িত হইলে ঘোরতর বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হয়, অনুগামীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হন। তিনি সেই সুযোগে দেহ সঙ্কোচ করিয়া গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করেন। যাহা হউক, যুবরাজের

মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে যুবরাজ প্রতাপচাঁদের অনুরূপ এক ব্যক্তি বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে অনেকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু বর্দ্ধমান রাজবংশে কেহই তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া স্বীকার না করায় হুগলীর বিচারালয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। কলিকাতার অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আগন্তুকের পক্ষ অবলম্বন করেন, কিন্তু বিচারে তিনি জাল বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এই ব্যক্তি শ্রীরামপুরের কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের কর্ত্তা রূপে গৃহীত হইয়া কিছু দিন পরে মারা যান। [illegible] সাধকের [illegible]র পর গুরুর উপদেশ অনুসারে কিছু দিন কোটাল হাটে বাস করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে সাধকের সমাধির চরণ তলে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। [illegible] সাধকের দেহ ত্যাগের পর অল্প দিন পরেই দেহ ত্যাগ করেন।

সম্পূর্ণ।
